

তৈমুরলঙ! বিশ্ববিজয়ী তৈমুরলঙ আর তার দুর্ধর্ষ বাহিনীর অন্যতম প্রধান নায়ক আবদুল্লার অত্যাচারের এ এক নারকীয় কাহিনী। এক দিকে শক্তিমদমত্ত তৈমুর, আর তার দুধভাই জহ্লাদ আবদুল্লার বিবেকহীন অত্যাচার,—তৈমুর-পত্নী প্রেমময়ী আইজল বেগম, আর আমিনা বেগম, অন্যদিকে তৈমুর-পুত্র জাহাঙ্গীর পত্নী শাঁজাদি সোফিয়ার কামাতুর কাহিনী। আবার বারবণিতা রহমা—আবদুল্লার প্রতি তার উচ্ছ্বসিত ভালবাসা,—সব মিলিয়ে এক বিচিত্র ঐতিহাসিক কাহিনী রচনা করেছেন বিমান মিত্র।



বিমল মিত্র | জগদীশ্বরেবা







নতুন প্রকাশক
১৩।১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলকাতা-১২

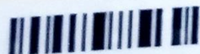
প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন ১৩৭২ সাল

প্রকাশিকা
এ, দত্ত
২৪সি রাম কমল সেন লেন, কলকাতা ৭

ছেপেছেন
কালিপদ দত্ত
করুণা প্রিন্টার্স
২৯।২ অরবিন্দ সরণি, কলকাতা-৭

প্রচ্ছদপট এঁকেছেন
প্রণব শূর

ছয় টাকা



শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়কে—

তৈমুরের দুর্ধর্ষ বাহিনী এতদিনে নিশ্চয়ই হিন্দুকুশ পার হয়ে গিয়েছে। দিল্লীর বুক থেকে তাদের পৈশাচিক অত্যাচারের ক্ষতও বোধকরি শুকিয়ে এসেছে। চক্ থেকে হাটে, হাট থেকে বাজারে,—সেখান থেকে রাজপথে আগের মতই কেনা-বেচার সোরগোল। জনস্রোতে আর জনরবে দিল্লী আজ মুখরিত। অথচ এদেরি মাঝখানে ভিক্ষাপাত্র হাতে বসে আমি শুনছি তৈমুরের সেই দানবীয় অট্টহাসি।

এইত সেদিন! হাজার হাজার ক্রোশ একটা উদ্দাম ঝঞ্ঝার মত আমারই অনুসরণে সে ছুটে এসেছিল, এবং আমাকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও ছেড়ে দিয়েছিল।

কিন্তু কেন ছেড়ে দিয়েছিল? এর উত্তর আজও আমি বুঝে উঠতে পারিনি। আমায় কি তবে সে চিনতে পারেনি? কিংবা চিনতে পেরেও না চেনার ভান করল? হয়ত তাই-ই হবে। কিন্তু তাহলে তার সেই হাসির ত কোন অর্থ ই হয় না। অবশ্য আমাকে না চিনতে পারার একটা কারণও ছিল। এ কথা ত সত্যি, পথের কষ্টে আমার চেহারার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। দৃষ্টিহীন কোটরাগত চোখ দুটো আমার রূপটাকে সম্পূর্ণ বিকৃত করে দিয়েছে। কিন্তু তবু···তবুও তৈমুরের ভুল হবার ত কথা নয়।

K.P. 5/7/82

আমি অন্ধ হলেও বিরাট দরবারের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে শাহানশা তৈমুরের অবস্থান বুঝতে আমার এতটুকুও কষ্ট হয়নি। বিনা সাহায্যেই সিংহাসনের সামনে এসে কুর্নিশ করি বারলা কুলতিলক আমার এককালের আত্মার আত্মীয়কে।

মুহূর্তে সেই অতি পরিচিত গলার স্বর কানে ভেসে আসে, 'কি নাম তোমার?'

হঠাৎ কি যেন হয়ে যায়। অতি প্রচলিত এক রসিকতার সুর টেনে বলে ফেলি, 'দৌলত।'

থমকে যায় তৈমুর। একটু ব্যঙ্গ করে হেসে ওঠে সে। বলে, 'দৌলত কখনও অন্ধ হয়?'

'হয়। তৈমুর যদি ল্যাঙড়া হয়, দৌলতও অন্ধ হয় বৈকি।'

সমস্ত দরবারের কলগুঞ্জন সেই মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে যায়। বোধ হয় রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সবাই অপেক্ষা করতে থাকে পরবর্তী স্বাভাবিক ঘটনার জন্য। কিন্তু কিছুই ঘটল না। শুধু একটা বিকট দানবীয় হাসি সবাইকে চমকিত করল। ভ্রুকুটি করে বলে ওঠে তৈমুর, ুব সুরত। আচ্ছা বাত বলেছ দোস্ত।'

পরমুহূর্তেই সে আমার পাশে নেমে এসে দাঁড়ায়। কানে নে মৃদু কণ্ঠে বলে, 'তোমার জীবন-মৃত্যু আমার হাতেই বাধা। আমি ইচ্ছে করলেই তোমার জীবন নিতে পারতাম। ন্তু তা না করে তোমায় ছেড়েই দিলাম।'

শান্ত্রীরা আমায় পথে ছেড়ে দিয়ে গেল। দৃষ্টিহীন হলেও পথ চলতে আমার এতটুকু কষ্ট হয়নি। এ পথ ত আমার চেনা।

নিজের ডেরায় যখন পৌছলাম রাত তখন অনেক হয়েছে। আমার বিপদাশঙ্কায় রহমা বোধ করি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। দূর থেকে তার চাপা কান্নার ফোঁস-ফোঁসানিটা বেশ ভালভাবেই অনুভব করি। আরও অনুভব করি আমার আগমনে সে যেন হাতে স্বর্গ পেয়েছে। আমায় দেখতে পেয়ে সে নিজেকে আর সামলে রাখতে পারে না। দৌড়ে এসে আমায় জড়িয়ে ধরে বলে, 'আমায় না বলে একা কোথায় গিয়েছিলে? আর কোনদিন তোমায় একা ছেড়ে দেব না।'

ছেড়ে দেয়ওনি আর কোনদিন। তৈমুর আর তার রণোন্মত্ত সৈন্যরা যতদিন দিল্লীর পথে পথে গেণ্ডুয়া খেলেছে, ততদিন সে আমায় চোখের বাহিরে যেতে দেয়নি।

সে যে এতদিন কি ভাবে আমার আহার জুগিয়েছে, তা একমাত্র খোদাই জানে। আমি যে একটুও আন্দাজ করতে পারি না তা নয়। আন্দাজ করেও কিছু বলিনি। এই নিয়ে অকারণ মাথা ঘামিয়ে কি লাভ? এই তামাম দুনিয়ায় নারীদেহ আর মানুষের প্রাণ যে সব চেয়ে সহজ লভ্য এটাত আমার অজানা নয়।

শুনেছি দিল্লী শহরকে তৈমুর দলে মথে শেষ করে দিয়েছে। আমাদের মহল্লায় কিন্তু তার চিহ্নমাত্রও দেখিনি। অবশ্য দেখার কথাও নয়। এখানকার বাসিন্দারা যে বিশ্বভ্রাতৃত্বের এক বড় অংশীদার, এ কথা ত সবাই জানে। চুরি, ডাকাতি, গুম, খুন, বলাৎকার—এ সবই এখানকার বাসিন্দাদের কাছে নিত্ত নৈমিত্তিক ঘটনা। যুদ্ধ ত তারই বৃহৎ সংস্করণ।

বাদশা যখন অন্যের জিনিষ চুরি করেন, অন্যের রাজ্যে

রাহাজানি করেন, জোর করে ছিনিয়ে নেন পরের স্ত্রী আ
সম্পদ,—দিগ্বীজয়ী সৈন্যরা বিচার না করে যখন বিপক্ষ সৈন্যে
ছেড়ে দিয়ে অন্য দলের সাধারণ মানুষদের গুম করে, খুন করে
দল বেধে তাদের মেয়েদের ওপর করে বলাৎকার, তখন তা
নাম হয় যুদ্ধ। আর যদি তারও বড় কিছু একটা ঘটে, তা
ইতিহাসের পাতায় তার স্থান হয় জ্বলন্ত অক্ষরে।

এই বিশ্বভ্রাতৃত্বের অংশীদারেরা পরস্পর পরস্পরকে কিছুটা সমী
করে চলে। একে অন্যের কাজে বড় একটা হস্তক্ষেপ করে না,
অত্যাচার ত নয়ই। এ কথা আমি আগে থেকেই জানি। তা
নিশ্চিন্ত মনে দিল্লীর এই বিশেষ মহল্লায় ঠাঁইও করে নিয়েছি,
অবশ্য এখানে ঠাঁই করার মূলে রহমার জেদী মনটাও খানিক
দায়ী। সে নিজে থেকেই স্থানটা বেছে নিয়েছে।

শুনেছি দিল্লীর একটা বড় অংশকে তৈমুর ধুলিসাৎ করে
দিয়েছে। তার বর্বর অত্যাচারে সমগ্র দিল্লী আজ স্তম্ভিত, ব্যথিত।
সে যে কেন আমাদের দিকে ছুটে আসেনি, সেটা বুঝতে আমার
এতটুকু কষ্ট হয় না। অতীত বন্ধুত্বের স্মৃতিতে তৈমুর আমায় ক্ষমা
করতে পারে, কিন্তু আদেশ অমান্যকারীকে তৈমুর ত কোনদিন
ক্ষমা করেনি।

অনেক অনেকবার তৈমুরের সৃজনী প্রতিভার সৃষ্ট এই ভয়াব
মৃত্যু সামান্য আদেশ অমান্যকারীর দেহকে তিল তিল করে গ্রাস
করেছে, এ আমি দেখেছি। তার এই সব অপকর্মের পৈশাচিক
আনন্দের ভাগীদার ছিলাম আমি নিজেই। কখনও কখনও আবার
এই আনন্দকে আনন্দতর করার জন্য আমিই তাকে নতুন রাস্তা

বাতলে দিয়েছি। মাঝে মাঝে এই অসহায় মানুষগুলোর চোখের
আকুতি আমার মনের কঠিন বর্মে আহত হয়ে ব্যর্থতায়, বেদনায়
মূক হয়ে গিয়েছে। সেদিন সবাই বলত আমায়, 'আবদুল্লা
তৈমুরের উপযুক্ত দোস্তই বটে।'

মিথ্যে তারা বলত না ঠিকই। সত্যিই আমি ছিলাম তৈমুরের
উপযুক্ত দোসর। আর তা হব নাই বা কেন? আমরা দুজনাই
ত একই বংশের সন্তান। বারলাদের প্রধান খাঁর সন্তান ছিল
তৈমুর নিজে। আর আমি এক অতি সাধারণ বারলার পুত্র।

অতি শৈশবে তৈমুরের মা যখন পুত্রের মুখ দেখেই চোখ বুজল,
তখন এই সদ্যজাত শিশুকে বুকে তুলে নিয়ে নিজের সন্তানের
সঙ্গে মানুষ করেছিল আমারই মা।

মনে পড়ে, ছোটবেলায় মায়ের দুধ আমরা এক সঙ্গে ভাগ
করে খেয়েছি। কৈশোরে মা আমাদের যা-ই হাতে তুলে দিতেন,
সেটাও আমরা দুজনে ভাগ করে নিয়েছি। তৈমুরের বাবা ছেলের
সম্বন্ধে ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন। ছেলে কি করছে না করছে, তা
নিয়ে মাথা ঘামাবার অবকাশ ছিল না তাঁর।

তিনি নিজের খেয়ালে, রঙীন নেশায়, নর্তকীর বিলোল কটাক্ষ-
মোহে মশগুল। অবাঞ্ছিত সন্তানকে দেখার মত অবকাশ তাঁর
কোথায়?

তৈমুরও বাঁধন ছেঁড়া পাখীর মত ঘুরে ঘুরে বেড়াত এদিকে
সেদিকে, দিক থেকে দিগন্তে। আর তার নিত্য সঙ্গী ছিলাম
আমি স্বয়ং।

একমাত্র মসজিদের ইমাম আলহজ রহমতউদ্দীন ছিলেন বালক

তৈমুরের বিশ্বাসভাজন। তিনিই ওকে প্রথম বলেন, 'তুমি একদিন মহান হবে। এখন থেকেই এর জন্য প্রস্তুত হও।'

এই রহমতউদ্দীনের কাছেই আমাদের অক্ষর পরিচয়। যতটুকু লিখতে বা পড়তে আমরা শিখেছিলাম, ততটুকু শুধু তারই কৃপায়। নিয়মিতভাবে আমাদের ধরে বসাতেন তিনি। পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে দেশের পুরানো ইতিহাস আর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধে আলাপও করতেন।

আমাদের কিন্তু সে সব ভাল লাগত না। ফাঁক পেলেই পালিয়ে যেতাম ঐ আস্তাবলটার দিকে। সেখানে হাতকাটা আকিল শোনাত এক ধরণের গল্প। কবে কোন খণ্ডজাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে বারলারা জয়ী হয়েছিল। কবে খাঁখানানের সৈন্যদল ক্যাম্বেরবার থেকে মুঠো মুঠো সোনা, মোহর আর মুক্তো নিয়ে এসেছিল, তারই গল্প বেশী করে শোনাত সে।

মাঝে মাঝে চোখের ভঙ্গীতে জানিয়ে দিত এবারের কাহিনীটার রস যেন একটু বেশী গাঢ়। হয়ত গেঁজলা উঠতে শুরু করেছে। এবার কি সে বলবে তা বুঝতে পেরে আরও কাছে সরে বসতাম আমরা।

ফিস্‌ফিস্ করে বলত সে, কবে, কোথায়, কোন আমীর ওমরাহের অন্দরমহলে কোন হুরীর সাহচর্য্য পেয়েছিল।

তার চাপা গলার অনুকরণে আমরাও যেন দেখতাম, বীর-পুরুষের অভিসার যাত্রা। দেওয়াল ডিঙ্গিয়ে, পাঁচিল বেয়ে, দাঁতে তলোয়ার চেপে ধরে তারই সঙ্গে যেন আমরা পৌঁছতাম তার প্রেয়সীর কাছে। সেখানের আনন্দ উৎসবের অংশীদার হতাম আমরা উভয়েই।

ক্রুদ্ধ বিপক্ষ যখন তেড়ে আসত ঘরভাঙ্গা শত্রুকে নিকেশ করতে, আমরা তখন খোলা তলোয়ার হাতে তার পাশে রুখে দাঁড়াতাম।

সাঁই সাঁই করে ঘুরত তলোয়ার। সামনের রাস্তা দেখতে দেখতে সাফ হয়ে যেত। সুন্দরীকে শেষ বিদায় জানিয়ে আমরা এগিয়ে আসতাম।

গল্প শেষ হবার অনেকক্ষণ পর পর্য্যন্ত রেশ থাকত তার। আর তারই নেশায় বুঁদ হ'য়ে চুপ করে বসে থাকতাম আমরা দুজনে। ফলে প্রায়ই ছুটতে হত আমাদেরকে বাজারের পেছন দিকের কানা-গলিটার মধ্যে, মনিরাবিবির আস্তানায়।

সেখানে সামান্য মূল্যে স্বপ্নকে সত্য করার বাধা ছিল না এতটুকুও। আর সে মূল্য যদি তৈমুরের জোব্বার ভেতর থেকে না বার করা যেত, তবে আবদুল্লার তৈরী হাত উপযুক্ত পাত্র থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করত অতি সহজেই।

আমাদের এই ছোট্ট শহরে আর সব কিছুর মত চোর বা ছেনতাই করার লোকের অভাব ছিল না কোনদিনই। ছোট বয়েস থেকে কিছুটা সখে, কিছুটা প্রয়োজনের তাগিদে তাদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলাম আমি। উপযুক্ত শিক্ষায় এই সব বিদ্যায় পারদর্শীও হয়ে উঠেছিলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীব্যাপী চোর সাম্রাজ্যের খবর, তাদের রীতিনীতি, চাল চলন, নিজস্ব ভাষা, সবই রপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

আমার নিত্যসঙ্গী হিসেবে আমীর তৈমুরও ওদের সঙ্গে মিশত। হাত সাফাইএর কাজটা ভাল রপ্ত করতে পারেনি সে। কিন্তু

তৈমুরের বিশ্বাসভাজন। তিনিই ওকে প্রথম বলেন, 'তুমি একদি মহান হবে। এখন থেকেই এর জন্য প্রস্তুত হও।'..

এই রহমতউদ্দীনের কাছেই আমাদের অক্ষর পরিচয় যতটুকু লিখতে বা পড়তে আমরা শিখেছিলাম, ততটুকু শুধু তার কৃপায়। নিয়মিতভাবে আমাদের ধরে বসাতেন তিনি। পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে দেশের পুরানো ইতিহাস আর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধে আলাপও করতেন।

আমাদের কিন্তু সে সব ভাল লাগত না। ফাঁক পেলে পালিয়ে যেতাম ঐ আস্তাবলটার দিকে। সেখানে হাতকাটা আকিল শোনাত এক ধরণের গল্প। কবে কোন খণ্ডজাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে বারলারা জয়ী হয়েছিল। কবে খাঁখানানের সৈন্যদল ক্যাথেরবার থেকে মুঠো মুঠো সোনা, মোহর আর মুক্তো নিয়ে এসেছিল, তারই গল্প বেশী করে শোনাত সে।

মাঝে মাঝে চোখের ভঙ্গীতে জানিয়ে দিত এবারের কাহিনীটার রস যেন একটু বেশী গাঢ়। হয়ত গেঁজলা উঠতে শুরু করেছে। এবার কি সে বলবে তা বুঝতে পেরে আরও কাছে সরে বসতাম আমরা।

ফিস্‌ফিস্ করে বলত সে, কবে, কোথায়, কোন আমীর ওমরাহের অন্দরমহলে কোন হুরীর সাহচর্য্য পেয়েছিল।

তার চাপা গলার অনুকরণে আমরাও যেন দেখতাম, বীর পুরুষের অভিসার যাত্রা। দেওয়াল ডিঙ্গিয়ে, পাঁচিল বেয়ে, দাঁতে তলোয়ার চেপে ধরে তারই সঙ্গে যেন আমরা পৌঁছতাম তার প্রেয়সীর কাছে। সেখানের আনন্দ উৎসবের অংশীদার হতাম আমরা উভয়েই।

1335
1-6-

ক্রুদ্ধ বিপক্ষ যখন তেড়ে আসত ঘরভাঙ্গা শত্রুকে নিকেশ করতে, আমরা তখন খোলা তলোয়ার হাতে তার পাশে রুখে দাঁড়াতাম।

সাঁই সাঁই করে ঘুরত তলোয়ার। সামনের রাস্তা দেখতে দেখতে সাফ হয়ে যেত। সুন্দরীকে শেষ বিদায় জানিয়ে আমরা এগিয়ে আসতাম।

গল্প শেষ হবার অনেকক্ষণ পর পর্য্যন্ত রেশ থাকত তার। আর তারই নেশায় বুঁদ হ'য়ে চুপ করে বসে থাকতাম আমরা দুজনে। ফলে প্রায়ই ছুটতে হত আমাদেরকে বাজারের পেছন দিকের কানা-গলিটার মধ্যে, মনিরাবিবির আস্তানায়।

সেখানে সামান্য মূল্যে স্বপ্নকে সত্য করার বাধা ছিল না এতটুকুও। আর সে মূল্য যদি তৈমুরের জোব্বার ভেতর থেকে না বার করা যেত, তবে আবদুল্লার তৈরী হাত উপযুক্ত পাত্র থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করত অতি সহজেই।

আমাদের এই ছোট্ট শহরে আর সব কিছুর মত চোর বা ছেনতাই করার লোকের অভাব ছিল না কোনদিনই। ছোট বয়েস থেকে কিছুটা সখে, কিছুটা প্রয়োজনের তাগিদে তাদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলাম আমি। উপযুক্ত শিক্ষায় এই সব বিদ্যায় পারদর্শীও হয়ে উঠেছিলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীব্যাপী চোর সাম্রাজ্যের খবর, তাদের রীতিনীতি, চাল চলন, নিজস্ব ভাষা, সবই রপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

আমার নিত্যসঙ্গী হিসেবে আমীর তৈমুরও ওদের সঙ্গে মিশত। হাত সাফাইএর কাজটা ভাল রপ্ত করতে পারেনি সে। কিন্তু

অন্যান্য বিষয়ে সে আমার চেয়ে অনেক, অনেক বেশী পারদর্শী হয়ে উঠেছিল। ভবিষ্যৎ জীবনে এই জ্ঞান যে তার কি কাজে লেগেছিল, তা বলার কথা নয়। অবশ্য ভবিষ্যতের কথা ভেবে আমরা কিছু করিনি।

পরে বুঝেছিলাম আকিলের কাহিনীগুলো অধিকাংশই ছিল তার মনগড়া। সামান্য যা কিছু সত্য ছিল, সেটা হচ্ছে অন্য কোন সেনানী বা সেনাপতির ক্ষেত্রে।

যে সব ঘটনা পূর্বে ঘটেছিল, সেগুলোকেই আকিল নিজেকে নায়ক সাজিয়ে আমাদের বলত। সেদিন কিন্তু এ সব বোঝবার মত বয়েস আমাদের হয়নি। আর হাতকাটা আকিলের তলোয়ার খেলার কৌশল তার কাহিনীর সমস্ত অসঙ্গতিকে চাপা দিয়ে গিয়েছিল। ওর কাছেই যে আমাদের তলোয়ার খেলার হাতেখড়ি।

তৈমুরের একটা সুন্দর স্বভাব ছিল। যে কোন কাজই শিখুক না সে, খুব ভাল করে শিখত। তলোয়ার খেলার যত কিছু কৌশল আকিলের জানা ছিল, সব কিছুই সে রপ্ত করেছিল। এমন কি বাড়তি দু'চারটে কৌশল নিজে তৈরীও করেছিল।

আকিলকে শেষ পর্যন্ত সেলাম করে বলতে হয়েছিল, 'আমীর, তুমি আমার চেয়ে অনেক বড় হয়ে গেছো। দুনিয়ায় এমন মানুষ খুব কমই আছে, যে সৎপথে লড়তে গিয়ে তোমায় হারাতে পারবে। কিন্তু অসৎপথের সম্বন্ধে সাবধান থেকো।'

অসৎপথে কেমন করে লড়াই করা যায় তারও দু' চারটে কলা কৌশল শিখিয়ে দিয়েছিল আকিল। তলোয়ারের মুখে সেগুলো তুলে নিয়েছিলাম আমি। তৈমুর তাদের ঠেকাবার কায়দা

শিখলেও নিজে সে রাস্তায় কোনদিনও এগোয়নি। তবে প্রতিরোধ করতে শিখেছিল বলেই খাঁখানানের ফৌজের সেরা তলোয়ার চালক সামবাহাদুরকে হারাতে পেরেছিল। আর সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে বাঁচাতেও পেরেছিল।

সেদিনকার কথা আমার আজও মনে আছে। রহমার সঙ্গে এই দিনটিতেই আমার প্রথম দেখা। বছরের সেই সময়টায় খাঁখানানের সেনাবাহিনী রাজধানী থেকে প্রত্যন্ত প্রদেশে প্রায়ই যাতায়াত করত। আর আমাদের শহরটা ছিল ঠিক এদেরই যাতায়াতের পথে।

শহরের ঠিক বাইরের ময়দানে পড়ত সারি সারি তাঁবু। বসরা, খোরাসান, ইস্পাহান, সিরাজ, হিরাত, কাবুল, কান্দাহার—এই সব নানান দেশের লোকজনেরা এসে সেখানে ভিড় জমাত। কত বসরাই গুল, খোরাসানি ঘোড়া, দামাস্কাসের তলোয়ার, সিরাজী, কাবুলী মেওয়া—সেই মাঠের এপাশ ওপাশ ছড়িয়ে থাকত তার ইয়ত্তা নেই।

শহরের লোকেদের ঐ সময় আর কোন কাজই থাকত না। তারা ফৌজী ময়দানে ঘুরে বেড়াত। আমাদের বন্ধুরা সেই সময়টা বেশ দু'পয়সা কামিয়ে নিত। তাদের দলে ভিড়ে আমিও দু'পয়সা করে নিতাম। ফলে ঐ সময়টা আমরা বেশ স্বচ্ছল অবস্থা ঘুরে বেড়াতে পারতাম।

মনিরাবিবিও সদলে এসে ঐ ফৌজী ময়দানে আড্ডা গাড়ত। তার সারা বছরের বেশীর ভাগ লভ্যাংশই যে আসত ঐ কদি

সে সময়টা মনিরাবিবি শহরের লোকদের প্রায় চিনতেই পারত না অবশ্য আমরা দুজনে ছিলাম তার ব্যতিক্রম।

হয়ত তৈমুরের আমীরি ভাবটাই তার অন্যতম কারন। কি আমার মনে হয়, আমাদের প্রতি ব্যক্তিগত আকর্ষনই মনিরাবিবির আমাদের ব্যতিক্রমের পর্যায়ে ফেলতে সাহায্য করেছিল। অব আমাদের কথাটা খানিকটা গৌরবে বহুবচন বলতে পারি।

তৈমুর মনিরাবিবির বাঁদীদের কোন একজনকে পছন্দ করে তা ঘরে চলে যেত। আর তাকে খুশী করার দায়িত্ব পড়ত আমা ওপর। এতে আমার যে খুব আপত্তি ছিল এমন নয়। ত মাঝে মাঝে না পাওয়ার দুঃখ অনুভব করতামই।

সেদিন ফৌজী ময়দানে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিলা দুজনে। হঠাৎ নতুন একটা দোকান আমাদের নজরে পড়ল। সুন্দ সুন্দর ছোরা, তলোয়ার, বাঘনখ, রণকুঠার ইত্যাদি সাজানো রয়েছে থরথরে। দেখেই লোভ লাগল তৈমুরের। তার কোমরের বাঁধা তলোয়ারটা ঠিক আমীরের উপযুক্ত নয়। ভাল একটা দামাস্কাস তলোয়ার চাই-ই তার। গেঁজে হাতড়ে দেখলাম, এক দিনারের মত দাম হলে একটা তলোয়ার কেনা যেতে পারে। সেই কথাই বললাম তাকে।

আমরা দোকানের সামনে এসে দাঁড়াতেই দোকানী দাঁড়িয়ে উঠে তৈমুরকে সেলাম দিল। এটা আমি সব সময়ই লক্ষ করেছি, যদিও তখন আমার আর তৈমুরের পোষাকের মধ্যে কোন ফারাক ছিল না, তবু লোকে তাকেই খাতির করত বেশী করে। ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার অঙ্কুর কি তখনই তার মধ্যে ফুটে উঠেছিল?

আমাদের প্রয়োজনের কথা বলতেই এক গোছা তলোয়ার বার করে দিল সে। তারই মধ্য থেকে বাছাই করতে করতে শেষ পর্যন্ত এক জোড়া পছন্দ করলে তৈমুর। সত্যি পছন্দ করবার মত জিনিষ ছিল সে দুটো। তাদের উজ্জ্বল নীলাভ দেহে শত বিদ্যুতের আভা। আর সোনার পাত বসানো বাঁটে হীরকের ঝিলিক। দুটোকে বার বার করে ঘুরিয়ে মন স্থির করতে না পেরে আমায় দেখতে বললে তৈমুর।

আমি ত ও বিষয়ে মহাপণ্ডিত। তবু তার কথা রাখতে বার দুই দুটোকেই নেড়েচেড়ে দেখলাম, কিন্তু কিছুই বুঝলাম না। তৈমুর একটা তুলে নিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে আমার কানে কানে বললে, 'তোর বাঁ হাতেরটায় একটু ঝোঁক রয়েছে না?'

মনে হল সত্যিই রয়েছে যেন। সুতরাং ঘাড় নেড়ে বললাম, 'হ্যাঁ।'

এবার দাম। দোকানীকে বলতেই, সে ভালটা দেখিয়ে বললে, 'ওটার দাম একশ' দিনার।'

চমকে উঠলাম, 'একশ' দিনার?' শূন্যের কোন মূল্য নেই। ছেঁড়া মাথার মতই সে গড়াগড়ি যায়। কিন্তু দোকানদারকে সে তত্ত্ব বোঝাতে গেলেও সে ক্ষেপে উঠবে। কোন রকমে ঢোক গিলে বলি, 'আর অন্যটার?'

মিষ্টি হাসি হেসে সে বলে, 'পঁচিশ দিনার।'

চীৎকার করে উঠি, 'দুটো ত একই জিনিষ। তাহলে একটার পঁচিশ দিনার হলে অন্যটারও তাই হওয়া উচিৎ।'

'হওয়া উচিৎ তা আমিও জানি। কিন্তু কেন হয়নি তা তুমি না বুঝলেও আমীর বুঝেছেন। হয় নয় আমীরকেই জিগ্যেস করো।'

জিগ্যেস আর করতে হল না। তৈমুরের মুখের ভাব দেখেই তার মনের কথা বুঝতে পারি। ঠিকই বলছে দোকানী। কিন্তু ও তলোয়ার যে আমাদের পক্ষে কেনা সম্ভব নয়, সেটাও বুঝেছে সে। ও যদি আমীর তৈমুর না হ'ত, আর বয়েস যদি তার আর একটু কম হত, কেঁদেই ফেলত বোধ হয়। তাকে খুশী করবার জন্য দোকানীকে বলতে যাচ্ছি—ওটা রেখে দাও, আমরা ঘুরে এসে নেবো। কিন্তু তার আগেই সামবাহাদুর ঘোৎ ঘোৎ করে এসে ঢুকল।

সামবাহাদুরকে চেনে না এমন লোক আমাদের শহরে ছিল না। খাঁখানানের সেনাবাহিনীতে তার মত দুঃসাহসী আর শক্তিমান সেনাপতি ছিল না বললেই হয়। হিন্দুস্থানের কাছাকাছি কোন এক অঞ্চলে তার বাড়ী। কিন্তু খুব ছোট বয়েস থেকে খাঁখানানের সেনাবাহিনীতে ঢুকেছিল সে। আর অল্পদিনেই সেখানে সে নাম ও করে ফেলল!

যুদ্ধের সময় যেখানে ভাড় জমত বেশী, সেখানেই দেখা যেত তাকে, বাঁ-হাতে লোহার কাঁটা বসানো চাবুক আর ডান হাতে খোলা তলোয়ার নিয়ে। কাজেই খুব তাড়াতাড়ি পদোন্নতি হ'ল তার, কিন্তু কিছুদূর উঠেই থেমে গেল সে। যুদ্ধের সময় যে দুঃসাহস, যে দুর্বলতা, বর্বরতা তার গুণ বলে ধরা হ'ত, অন্য সময়, বিশেষতঃ স্বপক্ষীয় লোকেদের কাছে, সে একটা বিভীষিকা হ'য়ে দাঁড়াল। বীরত্বমুগ্ধ খাঁখানানও বারবার তার উদ্দাম বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রজাদের অভিযোগকে সম্পূর্ণ অবহেলা করতে পারল না। তাই সামবাহাদুর মাঝ রাস্তাতেই থমকে দাঁড়াল।

যখনকার কথা বলছি, তখন তার বয়স চল্লিশ এর কাছাকাছি

হবে। চেহারাটা তখনও আঁটসাঁট, শক্ত সামর্থ। মুখে অবশ্য বয়সের বলিরেখা পড়তে সুরু করেছে। ছোট ছোট চোখ দুটোতে হিংস্র বর্বরতার পূর্ণ প্রকাশ। কোমরে নিত্যসাথী চাবুক আর তলোয়ার। দীর্ঘদিন ঘোড়সওয়ার থাকলে যেমন হয়, পা-গুলো তেমনি বাঁকা। মানুষটার দিকে একবার তাকালেই মনে হয় বর্বর। অবশ্য আজ হিন্দুস্থানের মাটিতে বসে বুঝতে পারছি, বর্বর আমরা সবাই। কাজেই আমাদের মধ্যেও যাকে বর্বর বলে মনে হ'ত, তার বর্বরতার পরিমাণ সহজেই অনুমেয়।

দোকানে ঢুকেই হাঁক ছাড়লে সামবাহাদুর, 'ভাল তলোয়ার আছে?'

পলকা দোকানটা তার গলার আওয়াজে থর থর করে কেঁপে উঠল। গলার স্বর আর বলার ভঙ্গী দেখে পরিস্কার বুঝলাম, পুরো নেশার ঝোঁকে রয়েছে সে। দোকানী লাভের গন্ধ পেয়ে চঞ্চল হয়ে উঠল। যা কিছু ভাল জিনিষ বার করে দেখাতে সুরু করলে। সামবাহাদুরের অভ্যস্ত চোখ সহজেই দোকানের সেরা জিনিষ তৈমুরের পছন্দ-করা-তলোয়ারটা বেছে নিল। দুবার সেটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে হাঁকলে, 'দাম কত?'

দাঁও বুঝে দোকানী হাঁকলে, 'দুশ' দিনার।'

কোমর থেকে ছোট একটা চামড়ার থলি বার করে ছুঁড়ে দিল সামবাহাদুর। তৈমুর হঠাৎ বলে উঠল, 'ও তলোয়ার আমি পছন্দ করেছি।'

তার দিকে ফিরে একবার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে অট্টহাসি হাসতে সুরু করল সামবাহাদুর। বহুক্ষণ ধরে একটানা হাসি হেসে চলল সে।

তৈমুরের মুখটা রাগে ক্ষোভে লাল হয়ে উঠল।

এক সময়ে হাসি থামিয়ে বললে সামবাহাদুর, 'বাচ্চা ছেলে। এখন পুতুল নিয়ে খেলা কর গে। তলোয়ার হল পুরুষের জন্য, বাচ্চাদের নয়।' বলেই তৈমুরের চিবুক ধরে নেড়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল সে।

চটে গিয়ে তার অনুসরণ করতে যাচ্ছিল তৈমুর। হাত চেপে ধরে থামালাম। তারপর দোকানীকে বললাম, 'তালটা ত বেশ চড়া লাভে বেচলে। এবার খারাপটা কিছু সস্তায় দাও।'

দোকানী বললে, 'আচ্ছা, তোমাদের জন্যেই বউনি হয়েছে যখন, তখন দাও কুড়ি দিনার।'

কোমর থেকে বাহাদুরের অনুরূপ একটা চামড়ার থলি বার করে কুড়ি দিনার গুনে দিয়ে তলোয়ারটা নিয়ে বেরিয়ে এলাম আমরা।

তৈমুর বেরিয়ে এসে বললে, 'কোথায় পেলি অত দিনার?'

বললাম, 'খোদা মেহেরবান, দয়া করে দিয়েছেন।'

পিঠে এক চাপড় মেরে হেসে উঠল তৈমুর, 'তোর ত খুব সাহস আছে আবদুল্লা। সামবাহাদুরের জেব্বা কাটিস তুই!'

বললাম, 'ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়। আর গর্দভের ভার কমানোই রীতি।'

আবার হেসে উঠল তৈমুর। হাসি থামলে বললাম, 'তলোয়ার কেমন একবার দেখে নিলে না?'

কিছুক্ষণের জন্য তৈমুরের মুখটা অন্ধকার হয়ে গেল, বললে, 'ও আর দেখবো কি?'

জোর করে বললাম, 'তা হোক্, একবার দেখই না।'

খাপ থেকে তলোয়ারটা বের করে একবার নেড়েচেড়ে দেখে হঠাৎ যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল সে। কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর ফেটে পড়ল, 'সাবাস আবদুল্লা! সাবাস তোর হাত সাফাই! চল, আজ তোকে মনিরাবিবির সেরা বাঁদীর কাছে নিয়ে যাই।'

বললাম, 'নিয়ে তো যাবে, কিন্তু পয়সা কোথায়? সঙ্গে কিছু আছে তো?'

একটুও অপ্রতিভ না হয়ে তৈমুর বলে উঠল, 'তোর কাছে যা আছে তাতেই হবে।'

'যদি আমি না দিই।'

'আমায় না দিয়ে কি তুই পারিস?'

পারতাম না ঠিকই। তাই কথা না বাড়িয়ে মনিরাবিবির নয়া ডেরার দিকে এগোলাম।

মনিরাবিবির তাঁবুটা ফৌজী ময়দানের তাঁবুগুলোর মধ্যে আকারে দ্বিতীয়। সবচেয়ে বড় তাঁবু ছিল, যেখানে সৈন্যবাহিনীর নায়ক মাসে মাসে কাছাকাছি উপজাতির খাঁয়েদের জন্য দরবার দিতেন। সেখানে যারা হাজির হতেন, তাদের প্রায় সকলেই পরে এসে মনিরাবিবির তাঁবুতে জমায়েত হতেন বলে সেটা আয়তনে আর জাঁকজমকে ছিল দ্বিতীয়। তবে কোন কোন লোকের কাছে সেটাই ছিল সব দিক দিয়ে প্রথম। তাদের দিন রাতের বেশীর ভাগ সময়ই কাটত ঐ তাঁবুর স্নেহচ্ছায়ায়।

তাঁবুটা মোটামুটি দুভাগে ভাগ করা ছিল। সামনের অংশটা ছিল সবাইকার বসার জন্য। সুন্দর সুন্দর কার্পেট আর মসৃণ কাপড় দিয়ে সাজানো ছিল সমস্ত তাঁবুটা, আর দিনরাতের

তৈমুরের মুখটা রাগে ক্ষোভে লাল হয়ে উঠল।

এক সময়ে হাসি থামিয়ে বললে সামবাহাদুর, 'বাচ্চা ছেলে এখন পুতুল নিয়ে খেলা কর গে। তলোয়ার হল পুরুষের জন্য, বাচ্চাদের নয়।' বলেই তৈমুরের চিবুক ধরে নেড়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল সে।

চটে গিয়ে তার অনুসরণ করতে যাচ্ছিল তৈমুর। হাত চেপে ধরে থামালাম। তারপর দোকানীকে বললাম, 'ভালটা ত বেশ চড়া দামে বেচলে। এবার খারাপটা কিছু সস্তায় দাও।'

দোকানী বললে, 'আচ্ছা, তোমাদের জন্যেই বউনি হয়েছে যখন, তখন দাও কুড়ি দিনার।'

মির থেকে বাহাদুরের অনুরূপ একটা চামড়ার থলি বার করে কুড়ি দিনার গুণে দিয়ে তলোয়ারটা নিয়ে বেরিয়ে এলাম আমরা।

তৈমুর বেরিয়ে এসে বললে, 'কোথায় পেলি অত দিনার?'

বললাম, 'খোদা মেহেরবান, দয়া করে দিয়েছেন।'

পিঠে এক চাপড় মেরে হেসে উঠল তৈমুর, 'তোর ত খুব সাহস আছে আবদুল্লা। সামবাহাদুরের জেব্বা কাটিস তুই!'

বললাম, 'ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়। আর গর্দভের ভার কমানোই রীতি।'

আবার হেসে উঠল তৈমুর। হাসি থামলে বললাম, 'তলোয়ার কেমন একবার দেখে নিলে না?'

কিছুক্ষণের জন্য তৈমুরের মুখটা অন্ধকার হয়ে গেল, বললে, 'ও আর দেখবো কি?'

জোর করে বললাম, 'তা হোক, একবার দেখই না।'

খাপ থেকে তলোয়ারটা বের করে একবার নেড়েচেড়ে দেখে হঠাৎ যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল সে। কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর ফেটে পড়ল, 'সাবাস আবদুল্লা! সাবাস তোর হাত সাফাই! চল, আজ তোকে মনিরাবিবির সেরা বাঁদীর কাছে নিয়ে যাই।'

বললাম, 'নিয়ে তো যাবে, কিন্তু পয়সা কোথায়? সঙ্গে কিছু আছে তো?'

একটুও অপ্রতিভ না হয়ে তৈমুর বলে উঠল, 'তোর কাছে যা আছে তাতেই হবে।'

'যদি আমি না দিই।'

'আমায় না দিয়ে কি তুই পারিস?'

পারতাম না ঠিকই। তাই কথা না বাড়িয়ে মনিরাবিবি[illegible]নয়া ডেরার দিকে এগোলাম।

মনিরাবিবির তাঁবুটা ফৌজী ময়দানের তাঁবুগুলোর মধ্যে আকারে দ্বিতীয়। সবচেয়ে বড় তাঁবু ছিল, যেখানে সৈন্যবাহিনীর নায়ক মাসে মাসে কাছাকাছি উপজাতির খাঁয়েদের জন্য দরবার দিতেন। সেখানে যারা হাজির হতেন, তাদের প্রায় সকলেই পরে এসে মনিরাবিবির তাঁবুতে জমায়েত হতেন বলে সেটা আয়তনে আর জাঁকজমকে ছিল দ্বিতীয়। তবে কোন কোন লোকের কাছে সেটাই ছিল সব দিক দিয়ে প্রথম। তাদের দিন রাতের বেশীর ভাগ সময়ই কাটত ঐ তাঁবুর স্নেহচ্ছায়ায়।

তাঁবুটা মোটামুটি দুভাগে ভাগ করা ছিল। সামনের অংশটা ছিল সবাইকার বসার জন্য। সুন্দর সুন্দর কার্পেট আর মসৃণ কাপড় দিয়ে সাজানো ছিল সমস্ত তাঁবুটা, আর দিনরাতের

অষ্টপ্রহর সবসময়ই সেখানে নানা জনের ভিড় লেগেই থাক[illegible] [illegible]বিবির বাঁদিরা কাজের অবকাশে ঘুরে বেড়াত সেখানে, [illegible] কেউ বেশিক্ষণ থাকতে পারত না।

এই সময়ের মধ্যে তাকে ক্ষণ-আনন্দের সঙ্গিনী হিসেবে [illegible] কোন একজন। দুজনে তখন চলে যেত সামনের [illegible] থেকে পেছনে। সেখানে সারি সারি ছোট চৌখুপী ঘরের [illegible] স্বল্পক্ষণের অনন্ত মাধুর্যের ঘন আস্বাদ পেতে চেষ্টা করত উভয়েই।

এক সময় সে পালা শেষ হয়ে যেত। পুরুষ তার পৌরুষে[illegible] স্বাক্ষর রেখে ক্লান্ত অবসন্ন দেহে ফিরে আসত সবার মাঝে। [illegible] অনেক পরে বাঁদী ফিরে আসত নতুন সঙ্গীকে প্রলুব্ধ করতে। সারারাতের পরিশ্রমের ফল তার জমা হত মনিরাবিবির সিন্দুকে [illegible] আর ভাগ্যে জুটত শুধু দু'বেলা খাওয়া আর পরনের বস্ত্র। [illegible] মূল্য একমাত্র অর্থোপার্জনের যন্ত্র হিসেবে। যেদিন সে মূল্য ফুরি[illegible] যেত, সাংসারিক কাজের বাঁদী হিসেবে তাকে বিক্রী ক[illegible] দেওয়া হত।

তবু মনিরাবিবির কাছে নিত্য নতুন বাঁদী আসার কামাই ছি[illegible] না। সেদিনও আমরা যখন মনিরাবিবির প্রায় ফাঁকা ঘরে গি[illegible] পৌঁছলাম, সে তখন নতুন আসা এক বাঁদীকে পরীক্ষা করছিল [illegible] ঘরটা প্রায় ফাঁকা বললাম, তার কারণ, মাত্র দু'চারজন লোক ছি[illegible] সেখানে। কিন্তু তাদের তখন তুরীয় অবস্থা। কুমিসের ঘোরে বেহেস্তের হুরীদের নিয়ে তারা এমনই মগ্ন ছিল যে, সত্যিকার হুরীদের স্পর্শ তাদের মনে কোনরকম উত্তাপই সৃষ্টি করতে পারেনি।

আমাদের দেখে মনিরাবিবি যেন হাতে স্বর্গ পেল। বহুদিন

অদর্শনের পর প্রিয়জনকে দেখলে মনের ভাব যেমন হয়, মনে হল, তার তেমনই হয়েছে। অথচ মজার কথা হল, মাত্র আগের দিন সন্ধ্যায় আমরা তার সঙ্গে কথা বলে গিয়েছি।

সেদিন আমি কিছু বলার আগেই তৈমুর বললে, 'মনিরাবিবি, আজ আবদুল যা করেছে, তার জন্য তার বিশেষ পুরস্কার পাওয়া উচিত। তা তোমার সেরা বাঁদীটার সঙ্গ-সুখই আমার মনে হয় সব চেয়ে ভাল, আর উপযুক্ত পুরস্কারই হবে। তুমি কি বল?'

একটু সময়ের জন্যে মনিরাবিবির মুখটা যেন অন্ধকার হয়ে গেল। তারপরই সে নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, 'তোমার সঙ্গে আমি এক মত। এই তো তোমাদের সামনেই রয়েছে আমার সেরা বাঁদী রহমা। তবে ওকে পোষ মানাতে হবে, একেবারে জঙলী বাঘিনী।'

ভয় পেয়েছি এমনি ভাব দেখিয়ে বললাম, 'মাপ কর বিবি। বাঘিনী টাঘিনী আমার ঘাড়ে দিও না। তার জন্যে তৈমুর আছে।'

পিছন থেকে কে একজন বলে উঠল, 'দূর! ওই বাচ্ছা ওকে সামলাতে পারবে নাকি? বাঘিনী সামলাতে হলে আমিই সামলাব।'

পিছন ফিরে চেয়ে দেখি সামবাহাদুর কখন এসে পিছনে দাঁড়িয়েছে। তৈমুর রাগ করে তলোয়ারের বাঁটে হাত দিয়েছিল। আমিই হাত ধরে থামালাম তাকে। কোমরের গেঁজ থেকে এক মুঠো দিনার বার করে মনিরাবিবির পায়ের কাছে রেখে সে বললে, 'এই নাও বিবিসাহেবা, তোমার বাঘিনীকে শায়েস্তা করবার দায়িত্ব আমিই নিচ্ছি।'

সে এগিয়ে এসে রহমার একটা কব্জী চেপে ধরে টানতে সুরু

অধিকাংশ সময়ই সেখানে নানা জনের ভিড় লেগেই থাকত। মনিরাবিবির বাঁদিরা কাজের অবকাশে ঘুরে বেড়াত সেখানে, কি কেউ বেশীক্ষণ থাকতে পারত না।

অল্প সময়ের মধ্যে তাকে ক্ষণ-আনন্দের সঙ্গিনী হিসেবে বে নিত কোন একজন। দুজনে তখন চলে যেত সামনের আ থেকে পেছনে। সেখানে সারি সারি ছোট চৌখুপী ঘরের কোন একটায় অনন্ত মাধুর্য্যের ঘন আস্বাদ পেতে চেষ্টা করত উভয়েই।

এক সময় সে পালা শেষ হয়ে যেত। পুরুষ তার পৌরুষের স্বাক্ষর রেখে ক্লান্ত অবসন্ন দেহে ফিরে আসত সবার মাঝে। আর তারও পরে বাঁদী ফিরে আসত নতুন সঙ্গীকে প্রলুব্ধ করতে। সারারাতের পরিশ্রমের ফল তার জমা হত মনিরাবিবির সিন্ধুকে। তার ভাগ্যে জুটত শুধু দু'বেলা খাওয়া আর পরনের বস্ত্র। তার মূল্য একমাত্র অর্থোপার্জনের যন্ত্র হিসেবে। যেদিন সে মূল্য ফুরিয়ে যেত, সাংসারিক কাজের বাঁদী হিসেবে তাকে বিক্রী করে দেওয়া হত।

তবু মনিরাবিবির কাছে নিত্য নতুন বাঁদী আসার কামাই ছিল না। সেদিনও আমরা যখন মনিরাবিবির প্রায় ফাঁকা ঘরে গিয়ে পৌঁছলাম, সে তখন নতুন আসা এক বাঁদীকে পরীক্ষা করছিল। ঘরটা প্রায় ফাঁকা বললাম, তার কারণ, মাত্র দু'চারজন লোক ছিল সেখানে। কিন্তু তাদের তখন তুরীয় অবস্থা। কুমিসের ঘোরে বেহেস্তের হুরীদের নিয়ে তারা এমনই মগ্ন ছিল যে, সত্যিকার হুরীদের স্পর্শ তাদের মনে কোনরকম উত্তাপই সৃষ্টি করতে পারেনি।

আমাদের দেখে মনিরাবিবি যেন হাতে স্বর্গ পেল। বহুদিন

অদর্শনের পর প্রিয়জনকে দেখলে মনের ভাব যেমন হয়, মনে হল, তার তেমনই হয়েছে। অথচ মজার কথা হল, মাত্র আগের দিন সন্ধ্যায় আমরা তার সঙ্গে কথা বলে গিয়েছি।

সেদিন আমি কিছু বলার আগেই তৈমুর বললে, 'মনিরাবিবি, আজ আবদুল যা করেছে, তার জন্য তার বিশেষ পুরস্কার পাওয়া উচিত। তা তোমার সেরা বাঁদীটার সঙ্গ-সুখই আমার মনে হয় সব চেয়ে ভাল, আর উপযুক্ত পুরস্কারই হবে। তুমি কি বল?'

একটু সময়ের জন্যে মনিরাবিবির মুখটা যেন অন্ধকার হয়ে গেল। তারপরই সে নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, 'তোমার সঙ্গে আমি এক মত। এই তো তোমাদের সামনেই রয়েছে আমার সেরা বাঁদী রহমা। তবে ওকে পোষ মানাতে হবে, একেবারে জঙলী বাঘিনী।'

ভয় পেয়েছি এমনি ভাব দেখিয়ে বললাম, 'মাপ কর বিবি। বাঘিনী টাঘিনী আমার ঘাড়ে দিও না। তার জন্যে তৈমুর আছে।'

পিছন থেকে কে একজন বলে উঠল, 'দূর! ওই বাচ্ছা ওকে সামলাতে পারবে নাকি? বাঘিনী সামলাতে হলে আমিই সামলাব।'

পিছন ফিরে চেয়ে দেখি সামবাহাদুর কখন এসে পিছনে দাঁড়িয়েছে। তৈমুর রাগ করে তলোয়ারের বাঁটে হাত দিয়েছিল। আমিই হাত ধরে থামালাম তাকে। কোমরের গেঁজ থেকে এক মুঠো দিনার বার করে মনিরাবিবির পায়ের কাছে রেখে সে বললে, 'এই নাও বিবিসাহেবা, তোমার বাঘিনীকে শায়েস্তা করবার দায়িত্ব আমিই নিচ্ছি।'

সে এগিয়ে এসে রহমার একটা কব্জী চেপে ধরে টানতে সুরু

করলে। রহমা আমাদের সবার দিকে একবার করুণ দৃষ্টি তাকাল। কিন্তু আমাদের কারোর কিছু করবার ছিল না। কাজে সামবাহাদুরের পেছু পেছু যেতে হল তাকে। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও গেল সে, এ কথা বুঝতে কষ্ট হ'ল না আমার।

রহমা চলে যাবার পর মনিরাবিবির পাশে এসে বসলাম আমরা। বিবি নতুন আনা সিরাজী পাত্র ভরে দিল আমাদের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে তার সঙ্গে রসালাপে মেতে উঠলাম।

হঠাৎ একটা আর্ত চীৎকারে চমকে উঠলাম আমরা সবাই। তারপরেই শোনা গেল সামবাহাদুরের পৈশাচিক উল্লাসধ্বনি। সে হাসির রেশ মেলাবার আগেই আবার আর্তনাদ শোনা গেল। কিছু একটু পরেই একটা গুরুভার দ্রব্য পতনের আওয়াজ আমাদের কানে ভেসে এল। ঘটনাটা কি ঘটেছে বুঝতে পারলেও করার কিছু ছিল না আমাদের। তাই পরস্পরের মুখের দিকে আমরা তাকিয়ে রইলাম।

ভাবছি সামবাহাদুরের হিংস্রতাকে কি শান্ত করা যায় না। এমন সময় প্রায় নগ্ন অবস্থায় রহমা ছুটতে ছুটতে এসে ঢুকল সামনের অংশটায়। দেখলাম, তার অনাবৃত শুভ্র অঙ্গে ফুটে উঠেছে নির্মম চাবুকের আঘাত। রক্তের ধারা ঝুঁঝিয়ে নামছে সেখান থেকে অবিরত। তাকে অমন ভাবে ঢুকতে দেখেই আমরা দাঁড়িয়ে উঠেছিলাম। সে ছুটে এসে দাঁড়াল ঠিক আমারই পিছনে।

একটু পরে তাকে অনুসরণ করে আমাদের কাছে এসে দাঁড়াল সামবাহাদুর। বাঁ চোখের ওপরটা বিশ্রীভাবে ফুলে উঠে চোখটাকে ঢেকে দিয়েছে। সেখান থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরছে। ফলে

তার সমস্ত মুখটা হয়ে উঠেছে বীভৎস। ডান হাতের চাবুকটা উঁচিয়ে সে গর্জন করে উঠল, 'সরে যা, ও শয়তানীকে আমি একবার দেখে নেব।'

ভয় পেয়ে রহমা আমাকে জোর করে আঁকড়ে ধরল। তার হৃদস্পন্দন আমার পিঠের ওপর ধক্ ধক্ করে বাজতে লাগল। আমি বোকার মত দাঁড়িয়ে রইলাম।

আবার চীৎকার করে উঠল সামবাহাদুর, 'সরে যা, সরে যা বলছি। সরবি না, তবে মর।'

চাবুক হাঁক্ড়াল সে। কাঁধের ওপর এক সঙ্গে যেন একশ' বিছে কামড় দিল। যন্ত্রণায় চোখ বুঁঝলাম আমি। মনে মনে হিসেব করে নিলাম, আমার কাছে অস্ত্র বলতে আছে কোমরে গোঁজা ছোরাটা। কিন্তু সেটা দিয়ে ত আত্মরক্ষা করা যাবে না। প্রতি-আক্রমণের ত কথাই ওঠে না। কাজেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাওয়া ছাড়া উপায় নেই। পরের আঘাতের জন্য নিজেকে তৈরী করে নিলাম।

চাবুক কিন্তু আর পড়ল না। তাকিয়ে দেখলাম, তৈমুরের হাতে উদ্যত তলোয়ার। আর সামবাহাদুরের হাতের কাছ থেকে কাটা চাবুকটা মাটিতে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে রয়েছে। সামবাহাদুর তৈমুরের দিকে রুখে দাঁড়িয়েছে। ডান হাত তার তলোয়ারের বাঁটে। তৈমুরকে বলল সে, 'ছেলেমানুষ বলে অনেকবার তোকে ক্ষমা করেছি, কিন্তু আর নয়। মরবার জন্যেই তোর পাখা গজিয়েছে। বেশ, মর তাহলে।'

তলোয়ারটা বিদ্যুতের মত ঝলসে উঠল। হাসিমুখে তৈমুর সামবাহাদুরের প্রথম আঘাত অবহেলাভরে প্রতিরোধ করল।

প্রথম বার কয়েক দুম দাম তলোয়ার চালালে সামবাহাদুর। কি
যখন বুঝল, যত কাঁচা ভেবেছিল তৈমুরকে,তত কাঁচা সে নয়, ত
কিছুটা সাবধান হয়ে তলোয়ার চালাতে লাগল। এত
হাতকাটা আকিলের কাছে যে শিক্ষা পেয়েছিল তৈমুর, সেটা
যে কোন লোকের মহড়া নেবার মত, তার প্রমাণ পেলাম সেদিন

খাঁখানানের সেনাবাহিনীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ তলোয়ার চা
সামবাহাদুর বাচ্ছা তৈমুরের কাছে নাস্তানাবুদ। একটা জি
দেখে কিন্তু ভারী অবাক লাগছিল আমার, তৈমুর থেকে থে
কেমন নিজের শরীরের এক একটা অংশ ছাড়া রাখছি
ভাবছিলাম চেঁচিয়ে বলি, তৈমুর হুঁসিয়ার! কিন্তু সে কথা আ
বলা হল না। ওতে তৈমুরের বিপদই বাড়ত।

কোমরের ছোরাটাকে চেপে ধরেছিলাম ডান হাতে। যদি
তাতারদের মধ্যে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে তৃতীয় ব্যক্তির অনুপ্রবেশ সব চো
বড় অন্যায় বলে মনে করা হ'ত, তবু তৈমুরের বিপদ দেখলে সে
অন্যায় কাজই করব বলে মনে মনে ঠিক করেছিলাম।

অবশ্য তার সবটাই যে বন্ধুপ্রীতি থেকে, এমন কথা বললে মিথ্যে
বলা হবে। আমি বুঝেছিলাম যে, তৈমুরকে হারাতে পারলে
রক্তপাগল সামবাহাদুর আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। আর তাকে
সামলাবার ক্ষমতা আমার যে নেই, এ ত আমি নিজেই জানি।
নিজের মৃত্যুর ভয়ে অতটা ভীত আমি হইনি, কিন্তু আমাকে শে
করার পর, সে যে আমার দেহ আঁকড়ে থাকা রহমার ওপ
বিকট প্রতিশোধ নেবে, এই সহজ কথাটা বুঝতে পেরেছিলাম
তাই চরম অন্যায় করতেও তৈরী হয়েছিলাম।

কিন্তু কিছু করারই দরকার হ'ল না। তাঁবুর একেবারে ধা

ঘেঁসে দাঁড়িয়ে ওদের দুজনের দ্বন্দ্ব দেখছিলাম। বুঝতে পারলাম, বয়সের চাপে ক্রমশঃই শ্লথ হয়ে আসছে সামবাহাদুর। এটা সে নিজেও বুঝতে পেরেছিল। তাই খেপা কুকুরের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল তৈমুরের ওপর। তার প্রচণ্ড আক্রমণের চাপ সামলাতে রীতিমত বেগ পেতে হ'ল তৈমুরকে। পেছু হটতে হটতে হঠাৎ পা পেছলালো তার। সামবাহাদুরের তলোয়ার তার পায়ের হাঁটুর ওপর বসে গেল।

হাঁ হাঁ করে চেঁচিয়ে উঠলাম আমরা সবাই। কোমরের ছোরা আমার হাতে, কিন্তু তা ছোঁড়ার আগেই তৈমুরের তলোয়ারখানা বিদ্যুৎ বেগে সামবাহাদুরের পাঁজরার নীচে আমূল বসে গেল।

অবাক হয়ে সে নিজের দিকে তাকিয়ে দেখল একবার। তারপর একটানে নিজের তলোয়ারটা খুলে নিল। হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল সামবাহাদুর। আর সঙ্গে সঙ্গে তার বীভৎস বর্বরতার চিরসমাপ্তি ঘটল।

তৈমুর হেসে কি বলতে গেল আমায়, কিন্তু বলা আর হল না। ঘুরে পড়েই যাচ্ছিল, তাড়াতাড়ি ধরে ফেললাম।

মনিরাবিবি এতক্ষণ কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়েছিল। এবার যেন প্রাণ ফিরে পেল সে। আমায় বললে, 'তৈমুরকে নিয়ে এখান থেকে এখনই পালাও। পারত কোথাও গিয়ে লুকিয়ে থাক। সামবাহাদুরের মৃত্যুর খবর আমায় যথাস্থানে দিতেই হবে। আর তারা যে তোমার বন্ধুকে খুব একটা সুনজরে দেখবে না, এটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। সামবাহাদুর দুর্দান্ত, নৃশংস হলেও ফৌজী আদমী। তার ওপর আক্রমণ সমস্ত ফৌজের ওপরই আক্রমণ। সুতরাং তারা তোমাদের হন্যে কুকুরের মত খুঁজবে। যদি

বাঁচতে চাও ত কোন নিরাপদ জায়গায় গিয়ে লুকিয়ে থা
রহমা, পেছনের দরজা দিয়ে ওদের বার ক'রে দিয়ে এস।
ওখানে একটা ঘোড়া বাঁধা আছে, সেটায় স্বচ্ছন্দে চড়তে পার তু
তোমাদের নিরাপত্তার জন্যে কিছুক্ষণ সময় দিচ্ছি, তারপরেই
চীৎকার সুরু করব আমি।'

প্রায়-অজ্ঞান তৈমুরকে কাঁধে ফেলে রহমার পিছন পি
বেড়িয়ে পড়লাম? পিছনের দরজা দিয়ে বেড়িয়েই সামনের এক
গাছে সাজ পরানো একটা ঘোড়া নজরে পড়ল। রহমার সাহা
তার ওপরে টেনে তুললাম তৈমুরকে। তারপর নিজে উঠে বসলা
তারই পিছনে। ফিরে যাবার আগে রহমা আমার একখা
হাত দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বললে, 'আবার দেখা হবে
আবদুল্লা।'

বললাম, 'নিশ্চয়ই হবে।'

ঘোড়া ছুটিয়ে সোজা শহরের সবচেয়ে নোঙরা পল্লীতে গি
হাজির হলাম। বাইরে থেকে দেখে মনে হ'ল, সে মহল্লায় যারা
থাকে, তাদের মত দীনদরিদ্র বুঝি দেশে আর নেই। কিন্তু
সেটা ত বাইরের রূপ। কেউ যদি কোনদিন ওখানকার ঘরগুলোর
ভেতরে ঢুকত, সে অবাক হয়ে যেত। ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ
টাকার স্বপ্ন সেখানে দেখবার দরকার হ'ত না। লাখ টাকা সেখানে
কাঁথা তুললেই পাবার সম্ভাবনা ছিল।

ও পাড়ায় আমাদের যাতায়াত অনেক দিনের। কাজেই নির্ভয়ে
নিশ্চিন্ত মনে চলে গেলাম সেখানে। জানতাম ফৌজীদের হাত
থেকে বাঁচবার পক্ষে সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয় ছিল ওটাই।

হলও তাই। সর্দার আমাদের খবর শুনে থাকবার জায়গা করে দিল সেই মুহূর্তেই। এমন এক পড়োবাড়ী, যেখানে দিনের বেলাতেও আলো ছাড়া যাওয়া যায় না। ঘোড়াটারও একটা ব্যবস্থা হ'ল। এক ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রী করে টাকাটা মনিরাবিবিকে দিয়ে আসা হ'ল।

দামটা পেয়ে মনিরাবিবি রীতিমত অবাক হয়েছে, এ খবরও পেলাম। অবশ্য অবাক হবার কারণও ছিল। চোরেরা ঘোড়া চুরি করে বেচে দিয়ে অর্থ যে আবার পৌঁছে দেয়, এটাই কল্পনা করতে পারেনি সে।

কিন্তু চোরেরা যে বিশ্বাসঘাতক হয় না, এই সহজ কথাটা ভুলে গিয়েছিল বলেই এ বিস্ময়। যারা অন্যের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে খায়, তারা নিজেদের মাথায় পরস্পরে কাঁঠাল ভাঙ্গবে, এটা ত প্রায় স্বতঃসিদ্ধ বলাই চলে। সমাজে কি সংসারে যারাই বড় হয়েছেন, তারাই হাতের কাছের লোকদের বধ করে তবে ওপরে উঠেছেন। চোরেদের রাজ্যে এটা কিন্তু ব্যতিক্রম। চুরি সে করে। না বলে সে পরের দ্রব্য নেয় ঠিকই। কিন্তু সেই পরটা সম্পূর্ণ নিস্পর। সমব্যবসায়ীদের ত কেউ নয়ই। সবাই আমাদের স্বদলীয় বলেই ধরে নিয়েছিল। তাই আমাদের বাঁচার জন্যে ঘোড়াটাকে লোপাট করা দরকার থাকলেও, তার দামটা লোপাট করার কথা তাদের কল্পনায় আসেনি।

বাইরে বেরোনো তৈমুরের পক্ষে ছিল অসম্ভব, আর আমার পক্ষে অনুচিত। কাজেই দিনরাত ঘরের মধ্যেই থাকতাম আমরা। অবশ্য একলা কোনও সময়েই থাকতে হ'ত না। দলের কেউ না

কেউ খবরা-খবর নিয়ে বা খাবার নিয়ে আসা যাওয়া করত।
আবার অবকাশ সময়ে শুধু বেড়াতেও আসত। তৈব প্রয়োজ-
মাঝে মাঝে ক্ষণিক সঙ্গিনীও সে জুটে যেত না এমন নয়।

এমনি করে দিনগুলো কাটছিল ভালই। তবে তৈমুরের ঘা শুকোতে চাইছিল না বলে বেশ চিন্তিতও হয়ে উঠেছিলাম আমি। ওরা নিজেদের জড়িবুটি প্রয়োগ করে যখন সারাতে পারল না তখন ওদের দলের হাকিমকে ডেকে আনা হ'ল। সেও অনেক রকম প্রক্রিয়া করল, কিন্তু বিশেষ কোন ফল হল না তাতে। অবশেষে আপনাআপনিই ঘা শুকোতে আরম্ভ করল। সারতে কিন্তু সময় নিল বেশ কিছুদিন।

ফৌজীরা সামবাহাদুরের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে অনেকদিন খুঁজেছিল আমাদের। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত খুঁজে না পেয়ে হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেয়। এরপর একদিন তাদেরও যাবার সময় হল। মনিরাবিবিও তাদের অনুসরণ করেছিল। তাদের চলে যাবার খবর পেয়ে মনটা আমার খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু রহমার শেষ কথাটা মনের ক্ষতে সান্ত্বনার প্রলেপ দিত। সে বলেছিল, 'আবার দেখা হবে ত।'

শুয়ে থাকার সময়টা বাজে নষ্ট করেনি তৈমুর। শুয়ে শুয়েই সে চোরের দলের কার্য্য পরিচালনার সহজ পন্থা বার করল। সর্দার তার সে প্রচেষ্টাকে স্বাগত অভিনন্দন জানাল। চোরেদের নিজস্ব পরিভাষারও কিছু কিছু সংস্কার করেছিল সে। সর্দার খুশী হয়ে তাকে তার সহকারী করে নিয়েছিল। ও সব সর্দারদের আসল নামটা লোপাট হয়ে গিয়ে নতুন করে নামকরণের রেওয়াজ আছে।

তৈমুরেরও নতুন নাম হল—লেঙড়া বুড়া। ভবিষ্যতে সর্দার লেঙড়া বুড়া তৈমুরলঙের জয়যাত্রার পথে কতটা সহায়ক হবে তা না বুঝেই নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করেছিলাম আমরা।

বেশ কিছুদিন পরে সুস্থ হয়ে উঠল তৈমুর। তবে পায়ের আঘাতের জন্যে তখনও একটু খোঁড়াচ্ছে সে। অবশ্য ঘোড়ায় চড়লে কোন অসুবিধে ভোগ করতে হত না এই যা রক্ষা। নয়ত জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠত তার। এই তাতার ছেলের মায়ের কোলের চেয়েও ঘোড়ার পিঠের সঙ্গে সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর। হাঁটতে শেখার আগেই অনেক সময় তারা ঘোড়ায় চড়তে শেখে। দম্পতি হতে গেলে অন্য গুণের সঙ্গে সেরা ঘোড়সওয়ার হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। তৈমুরের আর সব গুণ থাকলেও, ঘোড়ায় চড়তে না পারলে কেউ তাকে পুঁছত না। এমন কি তখন পর্য্যন্ত তার উচ্চাভিলাষ বারলাসের খাঁ হওয়াও তার ভাগ্যে ঘটত না।

অবশ্য এমনিতেও সে কাজটি যে খুব সহজ হ'ল, তা নয়। বাপের সঙ্গে তৈমুরের প্রায় কোন সম্বন্ধ ছিল না বললেই চলে। বোধ হয় ছেলেকেই স্ত্রীর মৃত্যুর অন্যতম কারন কল্পনা করে নিয়ে আমীর অমন খাপ্পা ছিলেন তার ওপর। আমরা অন্ততঃ সেটাই ভাবতাম।

আমীরের মৃত্যুর পর তার ছেলেই যে তার পদ অধিকার করবে, এ সম্বন্ধে সবাই নিশ্চিন্ত ছিলাম। তাই তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে দুঃখ পাই আর না পাই, তৈমুরের সম্বন্ধে যে কাহিনী তিনি প্রচার করে গিয়েছিলেন, তা শুনে আমরা একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

তৈমুরের নেতৃত্বে আমরা কয়েকজন ছেলে-ছোকরার দল দু'তিনের জন্যে শহর থেকে বেরিয়ে ছিলাম শিকারের নামে করতে। সেখানেই প্রথম খবর এল, তৈমুরের বাবা আর নেই। যথা নিয়মে প্রচুর মদ্যপান করে একদিন সন্ধ্যায় তিনি নবতমা প্রেয়সীর খোঁজে বেরিয়েছিলেন। তারপর কি যে হয়েছি জানা যায়নি।

তবে দেহের বর্তমান রূপ থেকে কল্পনা করতে পারি, কোন কোন নিষিদ্ধ ফলের দিকে উদ্বাস্তু বামনের মত হাত বাড়িয়েছিলে তিনি। আর সেই ফলকে বেষ্টন করেছিল যে কালসর্প, তার প্রচণ্ড দংশনে নীল হয়ে গড়িয়ে পড়েছিলেন। পরের দিন সকালে পথের ধারে তাঁর মৃতদেহটা পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল।

এরপর স্বাভাবিক ভাবে তৈমুরের কাছে খবরটা আসা উচি ছিল। খবরটা পেলে নিশ্চয়ই সে নত মস্তকে ফিরে যে পিতৃগৃহে। সেখানে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর জাঁকজমকের সঙ্গে মৃতদেহকে গোর দেওয়া হত। আর নতুন খাঁয়ের নাম আনুষ্ঠানি ভাবে প্রচার করা হ'ত। এবার কিন্তু সে নিয়মের ব্যতিক্রম হ'ল।

তৈমুরের এক দূর সম্পর্কের জ্ঞাতিভ্রাতা বারলা পুরুষদের (যারা সহরে উপস্থিত ছিল প্রধানতঃ তাদের) ডেকে এক মজলিশ বসালেন। সেখানেই প্রথম প্রকাশ পেল যে, তৈমুরের বাবা ছেলেকে ছেলে বলে স্বীকার করেননি। তাঁর কৈফিয়ৎ হল, তিনি যখন খাঁখানানের দরবারে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর স্ত্রী যে সন্তান সম্ভাবিতা, এই খবর তিনি শোনেননি। অথচ একবছর পরে ফিরে এসে দেখলেন যে স্ত্রী তাঁর গত হয়েছেন।

তাঁর নিজস্ব দাসীর কোলে দুইটি ছেলে,—তার একটি নাকি মাধব পত্নীর সন্তান—সে মাতৃস্নেহে পালন করেছে। এ কথার কোন প্রমাণ তিনি পানান। তাই কোনদিনই সে ছেলেকে নিজের ছেলে বলে গ্রহণ করেননি। তবে অনেকে এই তৈমুরকে তাঁর সন্তান বলে জানেন। তাই তিনি জানিয়ে যাচ্ছেন, তৈমুর তাঁর সন্তান নয়, এবং তার পক্ষে স্বীকার করাও সম্ভব নয়।

বন্ধুর মুখে নিজের সমস্ত আশা আকাঙ্খার এই অতল সলিল সমাধির খবর পেয়ে তৈমুরের মুখটা কঠিন হয়ে উঠল! লক্ষ্য করলাম, তার ডান হাতটা তলোয়ারের হীরক খচিত বাঁটটাকে সজোরে চেপে ধরেছে।

সঙ্গে সঙ্গে এও লক্ষ্য করলাম, আমাদের অন্যান্য সঙ্গীরাও চঞ্চল হয়ে উঠেছে। জাহাজ ডোববার আগে যেমন তার অভ্যন্তর-বাসী মূষিকের দল তাদের ডুবন্ত আশ্রয় ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ভেসে পড়ে, এদের মনোভাবটাও অনেকটা সেইরকমই দেখলাম। অবশ্য এ নিয়ে তাদের দোষ দেওয়া নিষ্ফল। স্বাভাবিক রীতিতেই কাজ করেছে তারা।

তৈমুরের সাহচর্য্য যে তাদের পক্ষে নিরাপদ নয়, এ কথা বোঝার পর তারা যে থাকবে না, এটাই তো নিয়ম। আমি অবশ্য নিয়মের ব্যতিক্রম। তাছাড়া তৈমুর আর আমার মধ্যে পার্থক্য যে কিছু নেই। জীবনে বন্ধুর পরে আমরা যে নিত্যসঙ্গী। মৃত্যুভয় আমাদের হেলাতে পারবে না, বিচ্ছেদও ঘটাবে না।

তখন কিন্তু ঠিক এই কথাটাই ভেবেছিলাম, আজকে তা ভেবে হাসি পায়। হায়রে, মানুষ যদি নিজের ভবিষ্যৎ জানতে পারত, তাহলে অনেক লজ্জা, অনেক দুঃখের হাত থেকে রেহাই পেত সে।

বন্ধুর কথা কিন্তু তখনও শেষ হয়নি। সে তখনও বলে চলেছে, কি করে অধিকাংশ যুবকই রহমানের কথায় সায় দিল। কি করে তাকেই বা দলে স্বীকার করে নিল তারা। ভবিষ্যতে তৈমুর যাতে গোলোযোগ সৃষ্টি করতে না পারে, তাই তাকে বন্দী করে হত্যা করার জন্য সদলে সবাই বেরিয়ে পড়তে চাইল। কিন্তু পুরোনো খাঁর দেহটা মাটির নীচে দিতে দেরী হয়েগিয়েছে তাদের। সেই ফাঁকে সে বেরিয়ে পড়েছে তৈমুরকে সাবধান করতে।

তৈমুর এতক্ষন ভ্রূকুটি করছিল। এবার সে পরিস্কার জানতে চাইল যে, তার পক্ষে কেউ আছে কিনা?

প্রশ্নের উত্তর দেবার আগেই আমাদের আশেপাশে হঠাৎ যেন একটা বড় রকমের ঝড় বয়ে গেল। অন্য সঙ্গীরা ছুটে গিয়ে নিজেদের ঘোড়ায় চড়ে বসল। তারপর তারা শহরের দিকে পালাতে সুরু করল।

তৈমুর ছুটে গিয়ে থামাতে গেল তাদের। কিন্তু আমিই ধরে থামালাম তাকে। পালাবার ঝোঁকে ওরা খেয়াল করেনি তাই, নইলে আমাদের ঘোড়াগুলোকে তাড়িয়ে দিয়ে তারা আমাদের বিপদে ফেলতে পারত।

ওরা যে কোন সময়েই আমাদের পক্ষে দাঁড়াবে না, এ কথাটা প্রায় স্বতঃসিদ্ধের মত ধরে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু ভাল না করতে পারুক, খারাপ ত করতে পারে। সে সুযোগটাই বা আমি তাদের দিই কেন?

যুক্তিগুলো অবশ্য বলতে হয়নি। বুদ্ধিমান তৈমুর আমার হাতের টান থেকেই ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছিল।

কয়েক মুহূর্ত বিস্তীর্ণ তৃণভূমির মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা

তিনজন। বললাম, 'কালাম, তুমি আর দাঁড়িয়ে কেন? যাও, ওদের পদাঙ্ক অনুসরণ কর।'

একটু হাসল সে। তারপর বললে, 'পালাবার ইচ্ছে থাকলে এতদূরে ছুটে আসতাম না। কিন্তু এখন তর্ক করবার সময় নেই। তোমার বিপক্ষরা এতক্ষণে সদলে এগিয়ে আসছে। তাড়াতাড়ি ঘোড়ায় চাপো। হ্যাঁ, একটা কথা মনে রেখো। বৃদ্ধরা প্রায় সবাই তোমার দলে, কিন্তু রহমানকে শায়েস্তা করতে না পারলে, জোয়ানদের তুমি স্বপক্ষে পাবে না কোনদিন, এটুকুই জেনে রাখ।'

ঘোড়ায় চড়তে চড়তে প্রশ্ন করে তৈমুর, 'কেন? আমি কি করেছি? রহমানকে ওরা আমার চেয়ে বেশী পছন্দ করলে কেন?'

কালাম কিছু বলার আগেই আমি বলি, 'কারণটা অত্যন্ত সহজ। তোমার মত একটা বাচ্চা ছেলের তাঁবেদারী করতে যে বারলারা চাইবে না, এটা তো স্বাভাবিক। তাছাড়া আজ পর্যন্ত যোদ্ধা হিসেবে নিজেকে তুমি প্রতিষ্ঠিত করতে পারনি। সে তুলনায় রহমানকে অনেক বেশী অভিজ্ঞ বলে মনে হয়েছে তাদের। তাই ব্যক্তিগত ভাবে রহমানকে তোমার চেয়ে হীন বলে জানলেও, বারলার নওজোয়ানরা তোমার জায়গায় তাকেই বেছে নিয়েছে।'

আর কথা হল না আমাদের। নিরাপদ আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে তিনটি ঘোড়াই ছুটতে সুরু করল।

এরপর থেকে আমাদের লুকোচুরি খেলা সুরু হল। এক একজন বারলার আস্তানায় যখন গিয়ে পৌঁছতাম আমরা, দূর থেকেই বুঝতে পারতাম, এখানে সাহায্য পাওয়া যাবে কি না। মিলবে কি না নিরাপদ আশ্রয়?

যেখানে সাহায্য পাওয়া যাবে, সেখানকার স্ত্রী-পুরুষ স আগ্রহে এগিয়ে আসে আমাদের দিকে। আর বিরুদ্ধ পক্ষীয় আস্তানায় দেখি, শুধু নারী আর শিশু। বুঝতে পারি, পুরুষ আশেপাশেই কোথাও শ্যেনদৃষ্টি মেলে আমাদের লক্ষ্য করছে।

এরই কয়েকদিন পর।...

কখনও বা আমরা দলে বেশ ভারী হয়ে উঠতাম, যা লাভের লোভে এসে আমাদের দল ভারী করত, তারা জীবনে কঠোরতা দেখে সরে যেত নিজেদের আস্তানায়। আবার তাদে জায়গায় স্থান পেত অন্য লোকেরা।

কখনও আমরা চার পাঁচজন, কখনও আবার পঞ্চাশ যা জন। কখনও বা আমরা জয়ের আনন্দে মাতোয়ারা, কখন পরাজিতের মত দ্রুত পলায়মান। কখনও ক্ষুৎ-পিপাসায় ক্লান্ত কখনও বা মাঠের মাঝে ভেড়ার পাল থেকে সদ্যধরা হৃষ্টপুষ্ট একটা ভেড়াকে মেরে ছাল ছাড়িয়ে ঝলসে নিয়ে আকণ্ঠ ভোজন করে পরিশ্রান্ত।

বিরুদ্ধ পক্ষীয়দের কাউকে ধরতে পারলে ত কথাই নেই। পৈশাচিক আনন্দে তাদের ওপর অত্যাচার চালাতাম আমরা। অপর পক্ষের গোপন কথা জানবার জন্যই যে এই অত্যাচার করছি, বোঝাতে চাইতাম।

একটু একটু করে গরম লোহা গায়ে বসাতাম, কখনও আবার ধারালো তলোয়ারের ডগায় দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে তিল তিল করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে দিতাম। অনেক সময় তার জানা সব কথা বলা হয়ে যাবার পরেও আমাদের অত্যাচার শেষ হ'ত না।

বাদীর সঙ্গে কথা বলা আমাদের পক্ষে অসম্ভব বলে সকলকে আমরা হত্যাও করতাম।

এত গেল বিরুদ্ধ পক্ষীয় সৈনিকদের বিরুদ্ধে অত্যাচারের কাহিনী। তাদের ওপর যত অত্যাচারই করা হোক না কেন, তবু তার পিছনে একটা ক্ষীণ যুক্তি ছিল। আমরা ওদের হাতে পড়লে আমাদের ভাগ্যেও ঠিক ঐ একই ব্যবহার জুটত। আর তাছাড়া আত্মরক্ষার জন্য কঠোর হওয়া ছাড়া আমাদের গত্যন্তরও ছিল না।

কিন্তু নির্বিরোধে নারী-পুরুষের ওপর যে অত্যাচার চলত, তার পক্ষে ক্ষীণতম যুক্তি খাড়া করাও আমার পক্ষে কষ্টকর ছিল। অথচ সুযোগ ও সুবিধামত পুরুষদের হাত-পা বেঁধে ঝলসানো, ফাঁসি দেওয়া ইত্যাদি কাজে আমরাইত ছিলাম অগ্রণী।

নারীদের আমরা ব্যবহার করতাম লালসার ইন্ধন হিসেবে। স্বামী পুত্রের সামনেই সম্ভোগ সুখ মেটাতে হ'ত তাদের। হতভাগিনীদের যন্ত্রণাকাতর নির্যাতনক্লিষ্ট দেহগুলো আমাদের পৈশাচিক আনন্দের খোরাক জোগাত।

বারবার তাদের দেহ নিঙড়ে যতরকম সম্ভব অসম্ভব, ন্যায় অন্যায়, বাস্তব অবাস্তব, আনন্দ উপভোগ করে দলিত, মথিত, পিষ্ট দেহটাকে ধূলার মধ্যে ফেলে দিয়ে আমরা ছুটে যেতাম নতুনের দিকে।

এ কাজ যে শুধু আমরাই করতাম তা নয়। রহমানের দলও নৃশংসতায় কিছু কম যেত না। অবশ্য তারা অন্যায় অত্যাচার করত বলেই আমাদের দোষ স্খালন হয় না। যেখানে জীবন দেবার ক্ষমতা আমাদের নেই, সেখানে জীবন নেবার কি অধিকার আছে? সেদিনের মত আজও এ প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে

পারব না। কিন্তু আজ কথাটার নেতিবাচক উত্তরই আগে
হয়, সেদিন হ'ত এতিবাচক। সেদিন ভাবতাম, অধিকার আমা
আছে। তবে সে অধিকার মানবিক বিচার বিবেচনার ফল
সে অধিকার হাতের খোলা তলোয়ারের।

এমনি মাৎসন্যায় দীর্ঘদিন চললে সাধারণ মানুষও ক্ষেপে ও
এ ক্ষেত্রেও তাই হ'ল। বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীরা আমা
বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। যেখানেই যাই, সেখানেই খোলা তলোয়া
সেখানেই ক্রুদ্ধ জনতার গর্জন আমাদের নিশাচর করে তুল
লুকিয়ে লুকিয়ে বাজপাখীর মত কোন এক বস্তীতে হানা দে
আর প্রয়োজনীয় দ্বিপদ চতুষ্পদ প্রাণীকে তুলে নিয়ে আসা আমা
নিত্যকর্ম হয়ে উঠল। নিরাপদ ব্যবধানে এসে আমরা আমা
ক্ষুন্নিবৃত্তি করতাম,—অন্নের ক্ষুধা, জৈবিক ক্ষুধা, সব ক্ষুধাই। তারপ
হিংস্র নেকড়ের মত নতুন পথে ছুটে যেতাম। আর পিছনে প
থাকত চুরি করে আনা দেহগুলোর ভগ্নাবশেষ।

ক্রমশঃ অবস্থা কিন্তু শোচনীয় হয়ে উঠল। শীত যত জমাট হ
লাগল, আমাদের শিকারও তত কমে আসতে থাকে। ফলে, দ
আমাদের ভাঙন ধরতে লাগল। শেষ পর্যন্ত এমন একদিন এল,
যেদিন তৈমুর, আমি আর কালাম ছাড়া চতুর্থ কোন ব্যক্তি আর
আমাদের সঙ্গী রইল না। অথচ পিছনে তখন ছুটে আসছে
রহমান, সঙ্গে তার বিশজন অনুচর।

সারাদিন ঘোড়া ছুটিয়েছি। কোথাও মুহূর্তের জন্য বিশ্রাম
করিনি। চলতে চলতেই সামান্য কিছু খাদ্য আর পানীয় কোনরকমে
গলাধঃকরণকরা হয়েছে, সেইজন্যই সারাদিন কোনরকমে চলেছে,

কিন্তু সন্ধ্যের মুখে আমাদের ঘোড়া একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়ল।
...পরের মত পাঁজরাগুলো তাদের ওঠানামা করছে, হয়ত এখনই
...মেড়ি খেয়ে পড়বে।

ঘোড়াবিহীন হলে আমাদের মৃত্যু অবধারিত। তা সে বিরূপ
প্রকৃতির হাতেই হোক, আর হিংস্র শত্রুর হাতেই হোক। তিন
জনেই বুঝেছিলাম, এখনই বিশ্রাম নিতে না পারলে আমাদের সমূহ
বিপদ। কিন্তু বিশ্রাম নেব কোথায়?

বিপদের ওপর বিপদ ঘনিয়ে এল। (সূর্যের শেষ রশ্মিটুকু
আকাশ থেকে মুছে যাবার ঠিক আগেই নীচু একটা পাহাড়ের
ধারে এসে পৌঁছলাম আমরা। আলো থাকলে হয়ত পাহাড়
ডিঙোবার পথ খুঁজে পাওয়া যেত। কিন্তু অন্ধকারে সে চেষ্টা
করা শুধু বোকামিই নয়, বিপজ্জনকও বটে। পাহাড়ের পায়ের
তলাতে তিনজনেই নেমে পড়লাম। তারপর ওপরে ওঠার সিঁড়ি
পথ বেয়ে ঘোড়ার লাগাম ধরে আস্তে আস্তে উঠতে লাগলাম।

ক্লান্ত ঘোড়াগুলো বিশ্রামের সম্ভাবনায় কিছুটা চঞ্চল হলেও
আমাদের অনুসরণ করল। আধাআধি ওঠার পর একটা খোলা
জায়গায় এসে পৌঁছলাম আমরা। তারই একপ্রান্তে ছোট
একটি গর্তে জলের চিহ্ন। জমে সেটা তখনও বরফ হয়নি।

জল দেখে ঘোড়াগুলো ব্যস্ত হয়ে উঠল। নিজেদের জলপাত্র
ভরে নিয়ে, জিন-সাজ খুলে ঘোড়াগুলোকে ছেড়ে দিলাম আমরা।
মনের আনন্দে তারা একটু এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়াল। একবার
জলে মুখ ডোবাল, তারপর চরে বেড়াতে লাগল। আমরাও
গাছতলায় বসে ঝলসানো মাংসের শেষটুকু খেয়ে নিলাম। তারপর
ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করতে বসলাম।

এখন খোলা জায়গায় থাকা বিপদ, এ বিষয়ে আমরা একমত। কাজেই বিকল্প আশ্রয় খোঁজার প্রয়োজন হ'ল। অন্য বেশী খুঁজতে হ'ল না। কাছেই একটি গুহা পাওয়া গেল এবং সেখানেই তিনজনে আশ্রয় নেব স্থির হল।

কালাম আর তৈমুর চাইল, ঘোড়াগুলোকে সঙ্গে নিয়ে যেতে। আমি তাতে বাধা দিলাম। এমনিতে গুহাটা ভাল হলেও সেখানে ঘোড়া নিয়ে যাওয়ার অনেক বিপদ ছিল। প্রথমতঃ, রহমানের কাছাকাছি এসে পড়লেই আমাদের ঘোড়াগুলো স্বজাতীদের উপস্থিতি বুঝতে পেরে সানন্দে চীৎকার করে উঠবে। আর তাতে আমাদের আত্মগোপনের জায়গাটা অতি সহজেই ধরা পড়ে যাবে। দ্বিতীয়তঃ, ওরা যদি আমাদের আক্রমণ করে, গুহার মধ্যে আমরা তা অতি সহজেই প্রতিহত করতে পারব। কিন্তু ঘোড়া সঙ্গে থাকলে তা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠবে।

শেষ পর্যন্ত সঙ্গীরা আমার কথা মেনে নিত কিনা সন্দেহ ছিল। কিন্তু সেই সময়ে আমাদের ঘোড়াগুলো কান খাড়া করে কি যেন শুনল, আর সঙ্গে সঙ্গে 'চিঁহি' করে চেঁচিয়ে উঠল। দূর থেকে তাদের আনন্দ আহ্বানের উত্তর ভেসে এল। আর সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীরা আমার কথা মেনে নিল।

ঘোড়াগুলোকে ধরে এনে গুহার সামনাসামনি এক একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা হ'ল। সাজগুলোকে গুহার মুখের কাছাকাছি একটা খোঁদলের মধ্যে লুকিয়ে রাখা হ'ল। তারপর সেই অন্ধকার গুহার মধ্যে ঢুকে পড়লাম আমরা তিনজনে। বাইরে থেকে যত বড় মনে হচ্ছিল, ভেতরে ঢুকে দেখলাম, সেটা আসলে তার চেয়ে অনেক বড়। একটু ভেতরে এগিয়ে যেতেই, গুহাটায়

কয়েকটা শাখা গুহা এসে পড়েছে বুঝলাম। আমার কথায় তারই একটার মধ্যে ঢুকে পড়া স্থির হ'ল।

যে গুহাতে ঢুকলাম আমরা, সেটা ক্রমশঃই সরু হয়ে আসছিল। আর তার ভেতর থেকে একটা উৎকট গন্ধ নাকে ভেসে এল। কিছুদূর এগোবার পর আমাদের থমকে দাঁড়াতে হল। সামনে থেকে একটা চাপা ক্রুদ্ধ গর্জ্জন শুনতে পেলাম। তৈমুর খানিকটা হতাশা, খানিকটা ক্ষোভ, আর খানিকটা রাগ মেশানো গলায় বললে, 'আবদুল্লা, তোর জন্যেই মলাম।'

যদিও গুহাটা আমি বাছিনি, তবু তার কথার অর্থ বুঝলাম। কিন্তু উত্তর দিয়ে কোন লাভ হবে না বলে চুপ করেই থাকতে হ'ল। ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা কিন্তু ঠিক করে ফেলেছি তখন। গায়ের আঙরাখাটা খুলে নিয়ে, ওদের দুজনের পাশ কাটিয়ে ভেতরের দিকেই এগিয়ে গেলাম আমি একা। ক্রুদ্ধ গর্জ্জনটা ততক্ষণে আরও জোর হয়েছে। অন্ধকারে চোখ অভ্যস্থ হয়ে যাওয়ায় জ্বলন্ত দুটো আগুনের ভাঁটা সহজেই নজরে পড়ল। বুঝলাম লাফাবার জন্য প্রাণীটা তৈরী হচ্ছে। কিন্তু সে সুযোগ তাকে না দিয়ে ভেড়ার চামড়ার পুরু আঙরাখাটা তার মাথার দিকে ছুঁড়ে দিলাম। আকস্মিক ঘটনায় প্রাণীটি ক্ষণিকের জন্য থমকে গেল। সেই সুযোগে ছুটে গিয়ে আঙরাখার দুটি মুড়ো চেপে ধরে বললাম, 'তোমরা নিশ্চিন্তে এসে বস, এর ব্যবস্থা আমি করছি।'

আমার বাহুবন্ধনের মধ্যে প্রাণীটা মুক্তি পাবার জন্য ছট্‌ফট্‌ করছে। তার নখের ঘায়ে আঙরাখাটা ফালী ফালী হয়ে যাচ্ছে। ক্বচিৎ তার ঘা আমার হাতে লাগছে।

গুহার মুখের কাছে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছি। বুঝতে পার মূল গুহার মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে শত্রুপক্ষ আমাদের খুঁজ তাদের টুকরো টুকরো কথা আমার কানে ভেসে আসছে, 'যা আর কোথায়? বেশী দূর নিশ্চয়ই যায়নি।' ঘোড়া লুকিয়েছে। আচ্ছা বোকা তো।' কি একটা রসিকতায় ন হো হো করে হেসে উঠল।

আলোটা আসতে আসতে আমাদের গুহার দিকে এগি আসছে মনে হ'ল। গুহার সামনা-সামনি মশাল হাতে রহম হাজির হতেই, আঙরাখার খুঁট খুলে প্রাণপণে বন্দী প্রাণীটা তার দিকে ছুঁড়ে দিলাম। গুরুভার দ্রব্যের আঘাত সামলা না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল রহমান। তার হাত থে খসে পড়া মশালটাও একবার দপ করে পরমুহূর্তে নিভে গেল।

রহমানের সঙ্গীরা যখন ভ্যাবাচাকা খেয়ে কি করবে ঠি করতে পারছে না, তখনই গুহার অন্ধকারে সরে এলাম আমি কিছুক্ষণ প্রচণ্ড হৈ-চৈ, আর্তনাদ, ক্রুদ্ধ শ্বাপদের গর্জন। তারপ ক্রমে ক্রমে সব যেন থেমে এল। রহমানের সহযোগীদে গলার স্বর কানে ভেসে এল, 'ইস্, একেবারে শেষ করে দিয়েছে তৈমুরকেও শেষ করতে হবে। নয়ত সে আর আমাদের আ রাখবে না।'

কিছুক্ষণ চাপা গলায় কি যেন আলোচনা করলে তারা। শে পর্যন্ত সামনে এগিয়ে যাবার সিদ্ধান্তটাই কর্ণগোচর হ'ল। আম যে গুহায় ছিলাম, সেটায় অনুসন্ধান করার বিরুদ্ধে মত দি সবাই। কারণ নেকড়ে যেখানে থাকে, সেখানে ত মানুষ থাক

পারে না। একজন রসিকতা করে বললে, 'থাকলেও এতক্ষণে তারা কাবাব বনে গেছে।'

সবাই তারা সামনের দিকে এগিয়ে গেল। সংখ্যায় ওরা কতজন হবে? ঐ আলো-আঁধারিতে ওরা কত জন এগিয়ে গেল, আর কত জনকে যে পিছনে রেখে গেল, তা ঠিক আন্দাজ করতে পারলাম না। তবে এক বা দুজনের বেশী যে নয়, এটা আন্দাজ করতে পেরেছিলাম।

তৈমুর কিছুক্ষণ আগেই আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল, তা অনুভব করেছিলাম। সে হয়ত পুরোপুরি আমায় বিশ্বাস করতে পারেনি। হয়ত ভেবেছিল, রহমানকে ডেকে এনে ওকে তার হাতে তুলে দিতে পারি। তাই খোলা কৃপাণ হাতে আমার ঠিক পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল সে। আমি কোন রকম সংকেত করার সঙ্গে সঙ্গেই সে বিশ্বাসঘাতকের শাস্তিবিধান করতই।

আশ্চর্য মানুষের মন। বিশেষ করে ক্ষমতা যে চায়, তার। ঠিক সেই সময়ে তৈমুরের তৃপ্তির জন্য অনায়াসে আমি নিজের জীবন দিতে পারতাম। যত হীন কাজই সে আমায় করতে বলুক না কেন, আমি দ্বিরুক্তি না ক'রে সে কাজ সম্পন্ন করতাম এবং আরও বেশ কিছুকাল করেও ছি। অথচ সেদিন সে আমাকেই অবিশ্বাস করল!

ওরা এগিয়ে যাবার পর, তৈমুরকে আমায় অনুসরণ করতে বলে আমি এগিয়ে গেলাম। পেছন ফিরে না তাকালেও সে যে আসছে, এ সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধা ছিল না। যেখানে

শত্রুপক্ষের লোক থাকার সম্ভাবনা, তার কাছাকাছি এসে, মাটি
বসে পড়ে ভাল করে একবার এদিক ওদিক তাকাতে লাগলাম
গুহার মাঝামাঝি আগুন জ্বালিয়ে একজন মাত্র
বসেছিল। একাকীত্বের নিঃসঙ্গতা কাটাতে খোলা সুরি
বোতলে নিয়মিত চুমুক দিচ্ছিল সে। তার পাশেই পড়েছিল
বিক্ষত রহমান আর এক নেকড়ের মৃতদেহ। ঐ জন্তুটাকে
আঁকড়ে ধরেছিলাম ভাবতেই, গাটা কেমন শির শির করে
আমার। কিন্তু তখন বেশী ভাববার অবকাশ ছিল না। সামনে
বসে আমাদের মুক্তিপথের বাধা শেষ প্রহরী।

হামাগুড়ি দিয়ে তার কাছাকাছি পৌঁছে হেঁড়া আঙরাখা
ভেতরে তলোয়ারখানা ভরে এগিয়ে দিলাম। প্রথমটা সে
লক্ষ্যই করেনি। কিন্তু তারপরেই নেশাগ্রস্থ চোখে সেটাকে
একটা নেকড়ে মনে করে টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়ে হাতে
কাছে রাখা বর্শাটা ছুঁড়ে দিলে সে। নেশাখোরেরও
ফসকাল না। অল্পের জন্য হাতটা বেঁচে গেল। তারই পাশ
বর্শাটা আঙরাখাটা ভেদ করে পাথুরে মাটিতে গেঁথে গেল।

হঠাৎ প্রচণ্ড হাসিতে ভেঙ্গে পড়ল সে। নেশাজড়িত
বললে, 'আমায় কি রহমান পেয়েছ? যাচ্ছিল খাঁ হতে, এখন
একেবারে খতম। সুন্দরী, এ হাত যতক্ষণ বর্শা কি তলোয়া
ধরতে পারবে, ততক্ষণ তোমার কোনরকম জারিজুরি চলবে না।'

তারপর ছুটে এসে সে আঙরাখাটাকে জড়িয়ে ধরে বললে
'এবার, এবার কি হ'ল তোমার।'

এই সুযোগেরই অপেক্ষায় ছিলাম আমি। এক চাপে আঙরাখা
ফুঁড়ে, তার পরণের পোষাক ভেদ করে, পাঁজরার নীচে আমূল

বসে গেল আমার তলোয়ারখানা। ঘোড়ার মত মুখ করে মাটিতে
লুটিয়ে পড়ল সে। আর সাথে সাথে মুক্তির পথ খুলে গেল
আমাদের।

এক টানে তলোয়ারখানা খুলে নিয়ে, এক ঘায়ে রহমানের
মাথাটা কেটে আঙরাখায় মুড়ে তৈমুরের পায়ের কাছে নামিয়ে
দিয়ে বললাম, 'আমীর সাহেব, বান্দার নজরানা।'

আমার পিঠ চাপড়ে তৈমুর বললে, 'সাবাস আবদুল্লা,
সাবাস।' মনে হল, সেই অন্ধকার গুহাতেই যেন হাজারটা ফুলঝুরি
জ্বলে উঠল।... আমি লক্ষ্যই করিনি যে, রহমানের মাথাটা কালাম
কাটিয়ে। আমি লক্ষ্যই করিনি যে, রহমানের মাথাটা কালাম
তুলে নিয়েছে নিজের হাতে। ছুটে গিয়ে ঘোড়ার সাজগুলো তুলে
বেরিয়ে এলাম গুহা থেকে।

বাইরে বিরুদ্ধপক্ষের ঘোড়াগুলো বাঁধা ছিল। সেরা তিনটে
ঘোড়া তাড়াতাড়ি বেছে নিই। সেখানে হতটা খাবার পাওয়া
গেল, সবটা জড় করে, ঘোড়াগুলোর পিঠের ওপর চাপালাম।
চাবকে বাকী ঘোড়াগুলোকে তাড়িয়ে দিয়ে নিজেদের ঘোড়ার
সাজ পরিয়ে আমরা ফিরতি পথ ধরলাম।

একটু পথ আসতে না আসতেই আমরা আমাদের অনুসরণ-
কারীদের চীৎকার শুনতে পেলাম। বন্দীর মৃত্যু, রহমানের
মুণ্ডহীনতা—তার চেয়ে বড় কথা, খাদ্য বিনা নিজেদের সাক্ষাৎ
মৃত্যুর কথা বুঝতে পেরে, সে-চীৎকার অল্প পরেই আর্তনাদে
রূপান্তরিত হল।

কিন্তু এতে আমাদের আনন্দই হল। খুশীর খেয়ালে গুনগুন
করে গান গাইতে গাইতে ঘোড়া ছোটালাম আমরা। পায়ের

আস্তরাখাটা না থাকায় ঠাণ্ডা হাওয়া ছুঁচের মত পাতলা বে ভেদ করছিল।

আমার মনে হচ্ছিল, কে যেন এক চাঙরা বরফ আমার বসিয়ে দিয়েছে। চারিদিকে নিস্তব্ধ গাঢ় অন্ধকার। কোন দি দেখা যায় না। তবু বারবার নেমে পথ খুঁজতে হচ্ছিল আমাকে।

প্রত্যেকবারই পথ খুঁজে পেয়ে মনে মনে হাতকাটা আকি ধন্যবাদ দিয়েছি। দিনের পর দিন তার কাছে ঘোড়া সামলা শেখার সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে জানোয়ারের পায়ের ছাপ দে কোনদিকে সে যাচ্ছে, কোথা থেকে আসছে, আশেপাশে আছে না আছে, তা চিনতে পারার যে বিদ্যাটা আয়ত্ত করেছি আমি, সেটা খুবই কাজ দিল এই বিপদের ক্ষণে।

প্রায় অপরিচিত পথ হলেও, ঘোড়ার খুরের চিহ্ন দে জনপদের নিশানা আবিস্কার করতে অসুবিধা হয়নি। তা এবার একটা নয়, একাধিক। কিন্তু কোন দিকে কত দূরে যাব আর যেখানে যাব, সেখানে আমাদের জন্য কি অভ্যর্থনার ব্যব হবে, তা কে জানে? অবশ্য রাহী মেহমান বলে কুমিসের পাত্র কেউ এগিয়ে দেবে না এত সুনিশ্চিত।

একবার ভাবলাম সেই সীমাহীন তৃণভূমির মাঝখানেই রাতের মত আশ্রয় নিই। সঙ্গে যখন ঘোড়া আছে তখন মোটামুটি আরামে রাত কাটানো যাবে। তাতারীর কাছে প্রিয়তমার প্রেমালিংগনের মতই ঘোড়ার দেহ সংলগ্ন থাকাটা স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু আমার মত পাতলা কোর্তা গায়ে দিয়ে সে প্রেমালাপ মারাত্মক হবার সমূহ সম্ভাবনা।

তাছাড়া ঐ ঠাণ্ডায় টিঁকে থাকবার অন্যতম প্রধান হাতিয়ার

কুমিসও খুব বেশী নেই আমাদের কাছে। এ অবস্থায় এগোতেই হবে। মনে মনে তাই ঠিক করলাম, ছোটখাট মেষপালকের ডেরার দিকে এগোব। সেখানে যদি বিরূপ অভ্যর্থনাও জোটে, তবু তার মোকাবিলা করা খুব কঠিন হবে না।

তৈমুর একলা থাকলে ব্যাপারটা তাকে বোঝাবার চেষ্টা করতাম। মানসিক উত্তেজনার মুহূর্তে সে হয়ত প্রথমটায় আমার কথা বিশ্বাস করতে চাইত না। হয়ত সন্দেহ করত বিশ্বাসঘাতকতার। তবুও তাকে বোঝানো আমার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব ছিল না। কিন্তু কালাম থাকায় সে প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ অবান্তর হয়ে পড়েছিল। আমার প্রস্তাব শোনামাত্র সে আপত্তি করত।

তৈমুরের মনে প্রথম স্থান পাবার জন্য কালামের আকুলতা বুঝতে আমার কোনদিনই অসুবিধা হয়নি।. আমাকে যে সে তার সর্বপ্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করত, একথাও আমি জানতাম। তৈমুরের সঙ্গে আমার সম্বন্ধটার বিষয়ে আমি এতই সুনিশ্চিত ছিলাম যে, কালামের সে প্রচেষ্টাকে কৃপার চোখেই দেখতাম। কারণ তখন আমি ছিলাম সংসার অনভিজ্ঞ আদর্শবাদী তরুণ। জন্মলগ্নেই তৈমুরের সঙ্গে এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে গিয়েছিলাম সেইজন্যই তাকে সবচেয়ে বড় মন করতে আমার কোন দ্বিধা ছিল না।

অনেক পরে বুঝেছি, পাথরের ওপরও বারবার ঘাস দিয়ে ঘসলে এক সময় না এক সময় সেখানে একটা পাকাপোক্ত দাগ পড়ে যায়। অন্যদিকে পাথরের ফাটলও মাটি পাতা দিয়ে সমান করা যায়। তবে হয়ত স্নেহের ফল্গুধারা কোথাও না কোথাও লুকিয়ে থাকে, আর তারই গোপন প্রলেপ মানুষকে মানুষের

সর্বপ্রধান গুণ প্রেম-ভালবাসায় ভূষিত করেছে। এই প্রাণদা... গোপন স্রোত যদি না থাকত, মানুষের মন তাহলে প্রাণহীন... মরুভূমিতে পরিণত হ'ত।

ওদের তাই কোন কথা না বলে নিজের বিশ্রাম... খুঁজছিলাম। মাঝে মাঝে তৈমুর অধৈর্য হয়ে বলে উঠে... আবদুল্লা, 'আর কতদূর?'

তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলি, 'এই যে, এসে পড়েছি।'

অন্ধকারে বেশ কিছুক্ষণ চলার পর একটা আস্তানা মিলল... মেষপালকের ডেরা সেটা। আমাদের ঘোড়ার পায়ের শব্দ পে... তাদের পোষা কুকুরগুলো প্রচণ্ড রকম হৈ চৈ সুরু করে দিল... আমায় থামতে দেখে তৈমুর বললে, 'এখানে থেমে কি হবে... চল এগিয়ে যাই।'

বললাম, 'অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আজকের রাতটা এখানে... বিশ্রাম করা যাক, আবার কাল সকালে বেরিয়ে পড়লে চলবে।'

কালাম আপত্তি করে উঠল, 'না, এখানে বিশ্রাম করার... কোনও দরকার নেই। চল, আমরা সহরের দিকে এগোই... কাল দিনের বেলায় যাতে শহরে পৌঁছতে পারি তার চেষ্টা করতে... হবে।'

বললাম, 'কাল সকালে রহমানের মাথা তোমাদের কত... সাহায্য করবে তা তোমরা কল্পনাও করতে পারছো না। ... আমরা তিনজনে গিয়ে হাজির হলে বিরুদ্ধ পক্ষীয়রা আমাদের মা... কেটে ফেলতে পারে। কিন্তু কাল রহমানের মাথা নিয়ে এগোলে... দলে দলে লোক তৈমুরের অনুগামী হবে। ফলে সহরে তৈমুরের... স্বত্ব স্বীকৃত হবার সম্ভাবনা বাড়বে।'

কালাম আমার যুক্তির বিরুদ্ধে আপত্তি জানাতে যাচ্ছিল, কিন্তু তৈমুর তাকে থামিয়ে একটা রফা করে বললে, 'আপাততঃ কিছুক্ষণ বিশ্রাম করাই যাক। আবদুল্লা পাতলা কোর্তায় কষ্ট পাচ্ছে। আগে ওর একটা আস্তানার ব্যবস্থা করতে হবে। কিছুক্ষণ পরে বেরুলেই চলবে।'

প্রস্তাবটা আমার খুব মনোঃপুত হল না। কিন্তু আপত্তি করবার অবকাশও পেলাম না। তিন চারজন মেষপালক লাঠি-সোঁটা নিয়ে আমাদের তেড়ে এল। কিন্তু কয়েক মুহূর্তেই আমাদের শিক্ষিত পটুত্বের কাছে হার মানতে হল তাদের।

তলোয়ারের ঘায়ে তাদের বেয়াদবীর অবসান ঘটাতে যাচ্ছি, এমন সময় বাধা পড়ল। ওদের জেনানারা আমাদের পায়ের ওপর আছড়ে পড়ল। অন্য একটা আনন্দদায়ক সম্ভাবনার কথা মনে পড়ায় ওদের ক্ষমা করলাম। তবে হাত-পাগুলো পিছমোড়া করে চটপট বেঁধে ফেলতে ভুল হল না।

তাদের টেনে নিয়ে গিয়ে তাঁবুর এক কোণে ফেলে রেখে নিশ্চিন্ত মনে বসা গেল। মেয়েরা আমাদের জন্য রুটি গোস্ত নিয়ে এল। অনুভব করলাম, ক্ষুধার্ত হয়েছি বটে। কিছুক্ষণ পরে ক্ষুধা মিটলে, অন্য জৈবিক প্রয়োজনটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল।

কথাবার্তা না বলে পরিবেশনকারিনীদের ধরে আমাদের প্রয়োজন মিটিয়ে নিলাম। তারা বাধা দেবার ক্ষীণ প্রচেষ্টা করেছিল, কিন্তু আমাদের প্রবল আবেগের সামনে তাদের সে বাধা স্রোতের মুখে খড়কুটোর মত ভেসে গেল। বড় বড় চোখ করে তাদের মালিকরা আমাদের লুণ্ঠনবৃত্তি লক্ষ্য করতে লাগল।

প্রথমেই ক্লান্ত হয়ে থামল কালাম। কিন্তু আমার আর

তৈমুরের মধ্যে পাল্লা চলতে লাগল বেশ কিছুক্ষণ। শেষে তৈমুর ঘুমিয়ে পড়ল।

তবু ঘুম এল না আমার। তিনজনে এক সঙ্গে ঘুমলে মেয়ে পুরুষদের মুক্ত করে দেবে, আর তারপরে আমাদের অবস্থা হ উঠবে সঙ্গীন। জীবন্ত অবস্থায় তাহলে আমাদের বেরোনো স হবে কিনা সন্দেহ। সুতরাং জেগে থাকবার জন্য পাত্র থেকে পাত্রান্তরে মনোনিবেশ করতে লাগলাম।

ভোরের আলো ফুটবার পর বেরোলাম আমরা। কিছুদূ যেতে না যেতেই দেখা গেল, আগের দিন আমি যা বলেছিলা সেটাই সত্য। রহমানের কাটা মাথা দেখে দলে দলে লো আমাদের পক্ষ হয়ে দাঁড়াল এবং ক্রমশঃ আমাদের দল ভারী হ লাগল। যখন শহরে এসে পৌঁছলাম আমরা, দেখলাম, আমি তৈমুরকে খাঁ বলবে না এমন একজন লোকও আর নেই।

সগৌরবে পিতৃক্ষমতায় সুপ্রতিষ্ঠিত হ'ল তৈমুর। অধিকা পাবার পর প্রথম কাজ হল আমাদের, রহমান ও তার অনুগামী দের পরিবারের ওপর প্রতিশোধ নেওয়া। তার দায়িত্ব অর্প আমার ওপর। অতি বিশ্বস্ততার সঙ্গে তার হুকুম তামিল করলাম

সর্ব প্রথমে রহমানের পরিবারকে শায়েস্তা করলাম। পদ্ধতি কিন্তু অতি সনাতন। প্রথমে তাদের ওপর চড়াও হ সোনা মণি মুক্তা প্রভৃতি মূল্যবান জিনিষ কেড়ে নিলাম। তার নানা আসুরিক প্রক্রিয়ায় শিশু থেকে সুরু করে পুরুষ পর্য যে কজন ছিল, তাদের ভবযন্ত্রণার অবসান ঘটালাম আমরা।

এরপর মেয়েদের পালা। তাদের প্রথমে আমাদের লা

চরিতার্থের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করলাম। আর বীভৎস অত্যাচারে কচি দেহগুলো যখন যন্ত্রণায় কুঁকড়ে উঠছিল, তখন যে পৈশাচিক আনন্দ আমি উপভোগ করেছি তা অবর্ণনীয়। সকলের লালসা তৃপ্ত হবার পর, ছিন্নবিচ্ছিন্ন দেহগুলি মৃত্যুর শান্তিবারি সেচনে শান্ত করলাম।

রহমানের পর তার প্রধান সহযোগীদের পরিবারবর্গকেও সেই একই দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হতে হ'ল। শেষ ফল এক হলেও আমাদের অত্যাচারের রীতিনীতি রীতিমত সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হতে লাগল।

আগে যেখানে একটা মানুষকে হত্যা করতে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগত, আজ সেখানে বহুক্ষণ ধরে একটু একটু করে মারবার নানা ধরণের কৌশল আবিস্কারের চেষ্টা চলতে থাকে। ধর্ষিতা নারীকে বহু ভোগ্যা করার সহজতম উপায় আবিস্কারের চেষ্টা—অর্থাৎ সবদিক থেকে পৈশাচিকতার প্রয়াসই যেন আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হ'য়ে দাঁড়াল।

দেখতে দেখতে বিরুদ্ধ পক্ষীয়দের শাস্তি দেওয়া শেষ হ'ল। সাধারণ্যে আমার নতুন নামকরণ হ'ল জহ্লাদ আবদুল্লা। সকলেই বলতে লাগল, 'আবদুল্লা [redacted] ওপরও বোধ হয় অত্যাচার করতে পারে।'

কথাটা হয়ত খুব ভুল বলত না তারা। সে সময়ে তৈমুরের হুকুমে হয়ত [redacted] বহুজনের ভোগ্য করে দিতে বাধত না আমার।

খাঁ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে না করতেই খাঁখানানের

নজরানা নিয়ে হাজির হবার ডাক পড়ল তৈমুরের। এতদিন খাঁ খাঁখানানের নামই শুনেছি। শুনেছি তার অতুল ঐশ্বর্য্যের কথা হীরা, জহরত, মণি মুক্তার নাকি অন্ত নেই। খাবার পাত্র, পান পাত্রের সীমা সংখ্যা নেই। খাঁখানান একপাত্রে একবারের বে দুবার খান না, পানও করেন না। দেশ বিদেশ থেকে কত রকমের উপঢৌকন আসে তাঁর কাছে। কি ঐশ্বর্য্য, কি জাঁকজমক তাঁর এমন কি লোকবলেও খাঁখানানের তুলনা নেই।

বহুদিন ধরে মোঙ্গল-তাতার উপজাতিদের নেতৃত্ব ক আসছেন খাঁখানান। তার শক্তির উৎস হচ্ছে তাতার অশ্বারো বাহিনী। তার জয়যাত্রার পথকে মসৃণ করার কাজে এই অশ্বারো বাহিনী অজেয়। এদের নেতৃস্থানীয় বাহাদুরদের প্রভাব প্রতিপ অতুলনীয়।

তাতারের বিভিন্ন উপজাতি থেকে দলে দলে লোক প্র বৎসরে রাজকীয় অশ্বারোহীবাহিনীতে যোগ দিতে আসে। কি তাদের সকলের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হ'ত যে এমন নয়। যারা সফ হ'ত, তাদের গর্বের আর শেষ থাকত না। যারা বিফল হ বিরসমুখে তারা ঘরে ফিরত। আর পরবর্তী সুযোগের অপেক্ষা থাকত।

খাঁখানানের দরবারে সারি সারি তাঁবুর বাহার। ছোট ব মাঝারি, কত রকমের, কত ধরণের তাঁবু। দরবার তাঁবু বিরাটকায়। ভিতরে বেশ কয়েকশ' লোক স্বচ্ছন্দে বসতে পারে জোড়া কানাতের তাঁবু। ছাদে নানা ধরণের কারুকার্য্য। দেওয়া দেওয়ালে কত দেশের কত অপূর্ব জিনিষ। মাটিতে ভারী কার্পে

পাতা। একটু উঁচু জায়গায় খাঁখানানের সিংহাসন। তৈমুরের সময় এ সিংহাসনের যে বৈশিষ্ট্য হয়েছিল, তখন তার কিছুই ছিল না। শুধু একটু উঁচু আসন। খাঁখানানের চেহারায়ও এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল না, যা থেকে আরও পাঁচজন সর্দার থেকে তাঁকে পৃথক করা যায়।

প্রথম দিন দরবারে গিয়ে কেমন হতাশ হ'তে হয়েছিল আমাদের। তৈমুরও স্বীকার করেছিল যে, খাঁখানানের নাম অনুযায়ী যতটা সে আশা করেছিল, তার অংশমাত্র দেখেছে খাঁখানানের মধ্যে।

তিনিও আমাদের সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করেছিলেন, আমরা তা পূরণ করতে পারিনি। এ কথাটা অবশ্য তখন জানতে পারিনি। তবু নজরাণাটা দেবার সময় খাঁখানানের মুখের বিবৃতিতে লক্ষ্য করেছিলাম।

তার কারণও অবশ্য ছিল। বাপের মৃত্যুর পর দীর্ঘদিন বিরুদ্ধ পক্ষের সঙ্গে লড়াই করে তৈমুর শেষ পর্যন্ত যখন পিতৃ অধিকার লাভ করল, তখনই আবিষ্কার করা গেল যে, পূর্ববর্তী খাঁ দীর্ঘদিন বারলাদের সঞ্চিত ধনভাণ্ডার সম্পূর্ণ নিঃশেষ করে ফেলেছেন। খাঁখানান সন্দর্শনের আদেশ যখন এল, তখন তাঁকে উপঢৌকন দেবার মত কিছু পাওয়া গেল না। অনেক কষ্টে সামান্য কিছু অর্থ সংগ্রহ করে কয়েকটি দামাস্কাস তলোয়ার কিনে নিয়ে গিয়েছিলাম আমরা।

খাঁখানান হয়ত ভেবেছিলেন, বারলাদের নতুন খাঁর কাছ থেকে দর্শনীয় উপঢৌকন পাওয়া যাবে। ভেবেছিলেন, সুপরিচিত যোদ্ধা রহমানকে যে হারাল, সে নিশ্চয়ই শক্তিমান পুরুষ হবে।

কিন্তু দু'ক্ষেত্রেই তাকে হতাশ হতে হয়েছিল। উপঢৌকন সামান্ত যে, তা দেখে খাঁখানান নিজেই লজ্জিত হয়েছিলেন। তরুণ তৈমুরের শৌর্য-বীর্য সম্বন্ধে তিনি সন্দিহান হয়ে পড়েছিলেন।

কিন্তু পরে তার ভুল তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছিলে স্বীকার করেছিলেন, শেরকে তাঁর 'কুত্তা' বলাটা ভুল হয়েছি তখন অবশ্য তৈমুরের পড়তা ঘুরে গেছে। তার সৌভাগ্য তখন উর্দ্ধগামী। তবু খাঁখানানের প্রশংসা তাকে সত্যিকারে আনন্দ দিয়েছিল। কিন্তু তার চেয়েও বড় আনন্দের কারণ পেয়েছিল তখন। সেটা অবশ্য অনেক পরের কথা।

*

খাঁখানান হতাশ হলেও হিসেবে তিনি ভুল করেননি। তি বুঝেছিলেন, তৈমুরের মধ্যে একটা শক্তি আছে। তবে সেটা পক্ষে শুভ কি অশুভ, তা ধরতে পারেন নি। তাই দোটানা মধ্যে থাকতে না চেয়ে তিনি তৈমুরকে নিজ পক্ষে আনবার ব্য করে ফেলেছিলেন।

হীরাতের সুলতানের সঙ্গে খাঁখানানের তখন একটু মনোমালি চলছিল। তাঁকে শায়েস্তা করবার উপায় উদ্ভাবনের জন্যেই দরবা ডেকেছিলেন খাঁখানান। তাতে মোটামুটি হীরাত রাজ্যের বিরু সৈন্য পাঠানো ঠিকও হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কে কে যাবে, সে ক তখনও ঠিক হয়নি। কেবল সৈন্যদলের নেতৃত্বের দায়িত্ব দেও হয়েছিল হুমজা খাঁকে।

বহু যুদ্ধজয়ী হুমজা খাঁর আসল নাম যে কি ছিল, সেই স সেটা আর কারও জানা ছিল না। নিজের উপজাতীয় নামটা

হুমজা খাঁর ব্যক্তিগত নাম হয়ে গিয়েছিল। তখন তাঁর বয়েস প্রায় ষাট-এর কাছাকাছি। কিন্তু দেহটি ছিল একেবারে অটুট। একটুও নুয়ে পড়েননি তিনি। তাই যখন যেখানে গোলযোগ বাধে খাঁখানান সর্বাগ্রে পাঠান হুমজা খাঁকে।

হুমজা খাঁর অধীনে যুদ্ধ শিখতে পারাটা সকলেই অত্যন্ত গর্বের বস্তু বলে মনে করতেন। তাই যেখানেই হুমজা খাঁকে পাঠান হতো, সেখানেই তার সহকারী হয়ে যাবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে যেত অনেকের মধ্যে। সেবারও তার অন্যথা হয়নি।

তৈমুর কিন্তু ওদিকে নজর দেয়নি। সে বোধহয় ধরে নিয়েছিল, বহু অভিজ্ঞ সেনানীকে বাদ দিয়ে খাঁখানান কোনমতেই তাকে বাছবেন না। তাই বৃথা চেষ্টা করার চেয়ে আপন খেয়ালেই মত্ত ছিল সে।

খাঁখানানের দরাজ আতিথ্যের পূর্ণ সদ্ব্যবহারই শুধু করা হয়নি। উপরন্তু সংলগ্ন বাজার থেকে নানা লোভনীয় দ্রব্য সম্ভার সংগ্রহ করার কাজেও মন দিয়েছিলাম আমরা। খাঁখানানের দরবারে উপস্থিত রইস ওমরাহদের জেব সর্বদাই স্বর্ণমুদ্রায় পূর্ণ থাকত। ফলে আবদুল্লার পোয়াবারো। আর আমীর তৈমুরের ব্যক্তিগত কোষ ত খালিই হ'ত না।

নিজের অবস্থানুযায়ী তৈমুরের পক্ষে বাজার থেকে জৈব প্রয়োজন আহরণের চেষ্টা করা সম্ভব ছিল না। তাই তার অবসর বিনোদনের সুবিধার জন্য বাঁদী বাজার থেকে দু'টি খুব সুরত বাঁদী সংগ্রহ করেছিলাম। দরবারের সময় ছাড়া বাকী সময়টা তাদের সাহচর্যেই কাটত তার।

আমি কিন্তু ঐ সময়টাকে কাজে লাগিয়েছিলাম। বাজারে বিভিন্ন

আমীর-ওমরাহের সিপাই-শান্ত্রীরা মালপত্র গস্ত করতে আস তাদের সঙ্গে আমি ভাব জমিয়ে নিয়েছিলাম। আমাকে দে তারা হাঁক ছাড়ত, 'এই যে বেরাদর আবদুল্লা, এস এক হয়ে যাক।'

আমি কোন সময়েই এ কাজে পেছপা নই। অল্প সময়েই যেতাম। নানা কথার ফাঁকে ফাঁকে তৈমুরের ক্ষমতার ফলাও ক করতাম। মনে মনে একথা জানতামই যে, কথাগুলো অতির হয়ে মুখে মুখে প্রচার হয়ে শেষ পর্যন্ত খাঁখানানের কা পৌছবে। আর তাহলে তৈমুরের অগ্রগতির পথ কিছুটা সু যাবে।

অবশ্য আমি স্বপ্নেও ভাবিনি যে খাঁখানান তাকে নিজের না আতিক হোসেনের সঙ্গে একযোগে হুমজা খাঁর সহকারী ক দেবেন। তাই খবরটা শুনে তৈমুরের মত আমিও চম উঠেছিলাম।

বাজারে সেদিনকার আলোচনা থেকে এ তথ্যও পরিষ্কার হ গিয়েছিল যে, আমীর তৈমুরের শত্রু সংখ্যা এ ঘটনার ফলে অসং হয়ে দাঁড়াল।

তৈমুরকে ডেকে খাঁখানান জানিয়ে দিলেন যে, সম্মানের পা পেয়েছে পরীক্ষামূলক ভাবে। যদি সে পরীক্ষায় সম্মানে উত্তী হতে পারে ত খাঁখানানের সব দরজা খুলে যাবে। আর যদি ন পারে, আবার সেই যাযাবর বৃত্তি।

ব্যাপারটা জেনেও আমাদের মনে বিন্দুমাত্র ভয় হ'ল না আমাদের জয়যাত্রা সম্বন্ধে কোন দ্বিধাই ত ছিল না। তারুণ্যে নিয়মই নেই কাঁটার মধ্যে বসরাই গুলের দিকে নজর পড়ে তার।

খাঁখানানের আদেশ প্রকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের জানানো হল যে, সেইদিন রাত্রেই আমাদেরকে বেরিয়ে পড়তে হবে। তাড়াতাড়ি জিনিষ-পত্র গুছিয়ে তৈরী হয়ে নিলাম আমরা। খাঁখানানের দরবারে রাত্রের মজলিশ শেষ হবার আগেই বেরিয়ে পড়লেন হুমজা খাঁ। সকাল যখন হল, আমরা তখন খাঁখানানের শিবির রাজ্য অনেক দূরে ফেলে এসেছি।

তাঁবু গাড়া, তোলা, আর সারাদিন ঘোড়া ছোটানোয় প্রত্যহ শক্তির শেষটুকু পর্যন্ত ব্যয় করতে হত। হুমজা খাঁ হিসেব করে প্রত্যেকের জন্যে বাড়তি একটি করে ঘোড়া নিয়েছিলেন। তাই রোজই আমরা সুস্থ সবল ঘোড়ায় চড়ে যেতে পারতাম। আমাদের পেছনে একদল লোক বাড়তি ঘোড়াগুলো ধীরে সুস্থে চরাতে চরাতে নিয়ে আসত। ঘোড়াগুলো আমাদের অনেক পরে এলেও রীতিমত তাজা থাকত। আর তার পিঠে চেপে প্রাণপণে ছুটতে বাধা থাকত না কিছুই। এমনি করে অতি অল্প দিনের মধ্যেই আমরা সীমান্তে পৌছে গেলাম।

হীরাতী সৈন্যরা তখনও আমাদের আগমন বার্তা পায়নি। কাজেই মনের আনন্দে তারা এধার ওধার হামলা করে বেড়াচ্ছিল। হুমজা খাঁ সদলে বাঘের মত তাদের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ঝড়ের মুখে ঝরে-পড়া পাতার মত উড়ে গেল তারা।

তাদের অনুসরণ করতে করতে আমরাও এক সময়ে সীমান্ত পেরিয়ে ওদের রাজ্যে ঢুকে পড়লাম। হতাবশিষ্ট সৈন্যরা নিকট-বর্তী সীমান্ত দুর্গে আশ্রয় নিলে। হুমজা খাঁও সে দুর্গের সামনে এসে থাবা পেতে বসলেন।

প্রথমে হুমকি দেওয়া হল, 'যে সব সৈন্যরা বে-আইনি ভা
আমাদের দেশে ঢুকে লুঠতরাজ করে, তাদের আমাদের হা
তুলে দাও। শাস্তি দেব তাদের।'

ওপক্ষ থেকে পালটা জবাব এল, 'তোমরাও বে-আইনি ভা
আমাদের দেশে ঢুকেছ। শাস্তি ত তাহলে তোমাদেরও দিতে হ
আমাদের সৈন্য যদি অন্যায় করে থাকে, তার শাস্তি আমরা দে
তোমরা মানে মানে সরে পড়ত।'

আমরা বললাম, 'অন্যায় যারা করেছে তাদের হাতে না পে
আমরা নড়তে রাজী নই।'

ওরা জবাব দিলে, 'তাহলে চিরকাল বসে থাক।'

হুমজা খাঁর সঙ্গে আমরা সবাই সামান্য সীমান্ত দুর্গের সা
দেখে বিস্মিত হলাম। কিসের জোরে তারা এতবড় কথা বল
সাহস করে? এ সাহস তাদের ভেঙ্গে দেওয়া দরকার। কাজে
সুরু হল অবরোধ।

অবশ্য অবরোধ সুরু হতই। মৌখিক যে কথাগুলো বলা হচ্ছিল
সেগুলো নিয়ম মাফিক। আমাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল, দুর্গ
অধিকার করা। আর সে কথা ওরাও জানত। তাই দু'পক্ষে
কথার খেলা খেলছিল।

কিছুদিন ধরে বারবার আক্রমণ করেও যখন সে দুর্ভেদ্য দু
অধিকার করা গেল না, যখন শোনা গেল হীরাতের মূল বাহি
আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে, তখন সীমান্ত দুর্গ-রক্ষকে
দম্ভোক্তির অর্থ পরিষ্কার বোঝা গেল।

আমাদের ছোট্ট সৈন্যদলকে এবার সীমান্ত পেরিয়ে স্বদে
ফিরে যেতে হয়। কিন্তু হুমজা খাঁর প্রতিজ্ঞা, যাবার আগে অন্ত

সীমান্ত দুর্গটিকে ধূলায় মিশিয়ে দিতে হবে। বার বার তাই সম্মুখ যুদ্ধে দুর্গ প্রাচীরের ওপর তাতারীর দল বীর বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এবং প্রতি বারই ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল। শেষ পর্যন্ত হুমজা খাঁ যখন প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছেন, তখনই রণাঙ্গণে অবতীর্ণ হল সর্দার লেঙড়া কুত্তা।

প্রতিদিন সকালে দেখা যেত, আগের দিনে নিহত সৈনিকদের কাছে মূল্যবান পদার্থ যা কিছু আছে, মায় তাদের পরণের পোষাক পর্যন্ত যেন কোন মন্ত্রবলে অদৃশ্য হয়েছে। অন্যেরা এর কারণ অবশ্য বুঝতে না পারলেও আমরা বুঝেছিলাম যে আন্তর্জাতিক চোর ভ্রাতৃত্বের কেউ কেউ যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিল।

আমাদের স্বপক্ষে তাদের থাকাটা অসম্ভব না হলেও বিচিত্র হ'ত। তার কারণ আমার আর তৈমুরের সতর্ক দৃষ্টি এড়ানো তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কাজেই দুর্গাভ্যন্তর থেকে কেউ না কেউ আসছে বলেই মনে হয়েছিল আমাদের।

হুমজা খাঁ আর চব্বিশ ঘণ্টা পর পশ্চাৎ অপসরণ করবেন বলে সন্ধ্যেবেলা মতপ্রকাশ করলেন। সেই রাত্রেই আমি আর তৈমুর ছদ্মবেশে যুদ্ধক্ষেত্রে অনুসন্ধানে বেরোলাম। বেশীক্ষণ খুঁজতেও হ'ল না আমাদের। দুর্গের পাদদেশে লুণ্ঠনরত দুই মূর্তি আমাদের সন্ধানী চোখে ধরা পড়ে গেল। তারা টের পাবার আগেই অতি সন্তর্পণে এগিয়ে গিয়ে ধরে ফেললাম একজনকে। অন্যজন সঙ্গীর দুরবস্থা দেখে যখন তাকে বাঁচাতে এল, তখন তৈমুরের হাতে সেও ধরা পড়ে গেল।

প্রথমে তারা কোন কথাই বলতে চায়নি, কিন্তু তৈমুরের মুখে আন্তর্জাতিক ভাষা শুনে এবং সর্দার লেঙড়া কুত্তার পরিচয় পেয়ে

তার মত বদলাল। তাদের মুখ থেকে তখন জানলাম— ভেতরের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। কিন্তু হীরাত সু বাহিনী প্রায় এসে পড়েছে, এই রকম গুজব শুনিয়ে সৈ মনোবল কোনরকমে টিকিয়ে রাখা হয়েছে।

কোন্ গোপন পথে তারা দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসে, স এ প্রশ্ন আমরা করলাম না। বরং তৈমুর তাদের সতর্ক দিলে যে, পরের দিন ভোরেই হুমজা খাঁ যে নতুন আ চালাবে, দুর্গ তাতে টিকবে না। সুতরাং তারা যদি বাঁচতে চা এখনই যেন পালিয়ে যায়।

চোর দুজন নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করল। তা জানতে চাইল, 'যেখানে বারবার হুমজা খাঁ হেরে গেছে, পরের দিন যে দুর্গ জয় সম্ভব হবে, একথা তারা কি করে বি করবে?'

তৈমুর চোর সম্প্রদায়ের অতি পরিচিত মারাত্মক এক শপথ বললে, 'কোন এক বিশ্বাসঘাতকের সহায়তায় কাল আমরা দুর্গ খোলা পাব। ফলে দুর্গে প্রবেশের কোন বাধা থাকবে না।'

তৈমুরের কথায় চোরদের বিশ্বাস হ'ল। কারণ পরস্পরের বিশ্বাসঘাতকতা না করলেও বিরুদ্ধপক্ষীয়ের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতক তারা খুবই পটু। তাছাড়া সুলতান সেনাপতিদের কারণে অকা বিশ্বাসঘাতকতা সম্বন্ধে রীতিমত ওয়াকিবহাল। তাড়াতাড়ি থেকে আত্মীয়-স্বজনদের বার করে আনতে চলে গেল তা দূর থেকে আমরা তাদের অনুসরণ করতে লাগলাম। কিন্তু তা দ্রুত গতির সঙ্গে তাল রাখা সম্ভব না হওয়ায়, কোথায় যে ত অদৃশ্য হ'ল, টেরও পেলাম না।

তৈমুর আমাকে নিয়ে দুর্গ প্রাকারের কাছাকাছি একটা বড় পাথরের আড়ালে গা ঢাকা দিলে। অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকতে হল আমাদের। তারপর অপেক্ষা করা যখন প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখনই মাটি ফুঁড়ে উঠে এল এক এক করে অনেকগুলো লোক।

বুঝতে কষ্ট হ'ল না যে, চোরেরা দুর্গের পতন বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে আত্মরক্ষার জন্য নিরাপদ স্থান খুঁজতে চলেছে। সকলে চলে যাওয়া পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করলাম। তারপর এগিয়ে গিয়ে দুর্গে ঢোকবার গোপন পথ খুঁজে বার করলাম।

কবে কি অবস্থায় জানি না, দুর্গ প্রাকারের গায়ে একটা গর্ত হয়েছিল। সে ফাঁক ভরাবার জন্যে অন্য পাথর আনা হয়েছিল বটে, কিন্তু বসানোর পরেও জায়গাটা দুর্বলই হয়ে গিয়েছিল। চোরেদের ঐটাই হয়ে উঠেছিল সিংদরজা।

নিজেদের প্রয়োজন মত এদিক ওদিক খুঁড়ে নিজেদের যাওয়া আসার বেশ ভাল রাস্তা করে নিয়েছিল তারা।

এই পথটার খোঁজ পাওয়ারই প্রয়োজন ছিল আমাদের। আমাকে সেখানে দাঁড় করিয়ে রেখে তৈমুর ফিরে গেল হুমজা খাঁর কাছে। কথা রইল যত তাড়াতাড়ি পারে, সে ফিরে আসবে। সেই অন্ধকার রাত্রে এক শত্রুপুরীর হৃৎপিণ্ডের কাছে একা প্রহরী আমি। পাঁচিলের ওধারে লোকজনের যাতায়াত। কখনও কখনও কথাবার্তার রেশও শুনতে পাচ্ছি।

মনে হচ্ছিল কেমন যেন নিশ্চিন্ত তারা। একটু পরে যে ভয়ংকর ঝঞ্ঝা বজ্রনাদে তাদের মাথার ওপর ভেঙে পড়বে, তার কোন আভাসই তারা পায়নি। অথচ আজকের রাত শেষ হবার

আগেই অনেকের হাসিই কান্নায় রূপান্তরিত হবে। মানুষ নিজের ভবিষ্যৎ দেখতে পায় না, এটা তার পরম সৌভাগ্য। যদি দেখতে পেত, তাহলে দৈনন্দিন জীবনের ছোট ছোট হাসিকান্নার মধ্যে এমন ভাবে ডুবে থাকতে পারত না। প্রতি মুহূর্তেই যদি মৃত্যুর বিভীষিকা মানুষকে ঘিরে থাকত, তাহলে দুনিয়ার তাবৎ সৃষ্টিই অচল হয়ে যেত।

অথচ ভবিষ্যৎ জানার জন্য কি আকুলতা মানুষের। লক্ষ কোটি কোশ দূরের তারা-গ্রহের দল মানুষের জীবনকে কি ভাবে পরিচালিত করে তা নিয়ে কত বিচার বিবেচনা। কত জনে মানুষের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নিজের জীবনের পথকে সুগম করে নিচ্ছে।

সেকেন্দারের মত বিশ্বজয়ীও নিজের শক্তির সঙ্গে গ্রহসনের অনুকূল অবস্থান সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে চাইতেন। শুনেছি, কে একজন সেনাপতি নাকি এমন এক জ্যোতিষীকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়েছিলেন। যুদ্ধযাত্রার ফলাফল সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করে সে যখন সৈন্যবাহিনীর মনোবল ভেঙে দিচ্ছিল, তখন সেনাপতি তাকে ডেকে পাঠালেন। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল জ্যোতিষী। এবার তার ক্ষমতার উপযুক্ত সমাদর মিলবে।

সেনাপতি তাকে দেখেই প্রশ্ন করলেন, 'তুমি যে ভবিষ্যৎ বলছ, নিজের ভবিষ্যৎ বলতে পার?

চারদিকের উৎসুক সহকারীদের মুখের দিকে তাকিয়ে জ্যোতিষী সগর্বে বললে, 'হ্যাঁ জানি। অতুল ঐশ্বর্য সম্মান, দীর্ঘ জীবন।

সেনাপতি গর্জে উঠলেন, 'কিছুই জান না! এই তোমার

ভবিষ্যৎ। হাতের তলোয়ার দীপালোকে ঝলসে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে রক্তধারা ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

ভবিষ্যতকে বিচার করে জানা যে একেবারে অসম্ভব নয়, একথা আমি অবিশ্বাস করি না। আজকের দিনে যে কাজের সূত্রপাত করছি, কাল তার থেকে কি ফল পাব তা জানব না কেন? আঙুরের লতা থেকে শুধু আঙুর ফলই পাব না, পাব সর্বদুঃখহরা সুধারস, একথা জানে না কোন বেওকুফ।

অন্ধকারে মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে, ছায়াও বেশ সচল হয়ে উঠেছে। ইতর প্রাণীদের পদাঘাতস্খলিত নুড়ির আওয়াজ যেন আমার বুকে হাতুড়ি পেটাচ্ছে। অথচ করার কিছুই নেই। তৈমুর আমার কাছ থেকে যা আশা করে, তা আমাকে করতেই হবে। তাই সেই কনকনে ঠাণ্ডায় পাথরে ঠেস দিয়ে বসে রইলাম আমি।

তৈমুর যখন ফিরে এল, তখন ভোর হতে খুব বেশী দেরী নেই। সঙ্গে তার একশ' বাছাই করা যোদ্ধা। আমাকে কাছে ডেকে বললে সে, 'আবদুল্লা, তোমার ওপরই ভাই আজকের যুদ্ধের ফল নির্ভর করবে। তোমাকে প্রথম এই পথ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে দুর্গের সিংদরজা খুলে দিতে হবে। সামনে থেকে যখন হুমজা খাঁ আক্রমণ করবেন, তখন দুর্গরক্ষীর নজর থাকবে সেই আক্রমণ ঠেকাবার দিকে। সেই সুযোগে আমরা পেছন থেকে ওদের ঘিরে ফেলব। এ কাজ তুমি ছাড়া অন্য কাউকে দিয়ে সম্ভব নয়। তাই তোমাকে এই বিপদজ্জনক কাজের দায়িত্ব দিতে হচ্ছে।'

তার শেষ কথায় গর্বে আমার বুক দশহাত হয়ে গেল। তখনই তৈরী হয়ে নিলাম। নিঃশব্দে চলা ফেরার সুবিধা হবে বলে

পায়ের জুতো খুলে ফেললাম। খুলে ফেললাম গায়ের আভর
সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র রেখে দিয়ে কোমরে আঁটা ছোরাখানা সম্বল
সর্বাঙ্গ একটা চাদরে ঢেকে অজানা পথের দিকে এগিয়ে গে
আমি।

জানি একটু ভুল হলেই মৃত্যু অনিবার্য। জানি ধরা প
হীরাতীদের অত্যাচারে জর্জরিত হতে হবে আমাকে। তা
হ্যাঙ্কারজনক শিকারও হয়ত হতে হবে আমাকে। খালি পা
তলায় শক্ত পাথরের খোঁচা লাগছে। মনে হচ্ছে যেন গরম
ফোটাচ্ছে কেউ। তবু আমি নিঃশঙ্ক হৃদয়ে এগিয়ে চলেছি।

ভোরের মুখোমুখি যেন অন্ধকার সবচেয়ে গাঢ় হয়।
একদিক দিয়ে আমার যেমন সুবিধা হয়েছিল, অসুবিধাও হয়ে
তার চেয়েও বেশী। অন্ধকারের সুযোগে ধরা পড়ার হাত
বেঁচে গেলাম।

একটা রাস্তার মোড় ঘুরতেই একদল সৈন্যের মুখোমুখি প
গেলাম। নিঃশ্বাস বন্ধ করে একপাশে সরে দাঁড়ালাম। আ
এক হাতের মধ্যে দিয়ে চলে গেল তারা। হয়তো তারা পা
দিয়ে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, তাই কোনদিকে নজর দে
অবকাশ পায়নি। কিন্তু তাদের আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্বই তাদের
অন্যমনস্ক করেছিল।

তারা বলাবলি করছিল, দু' একদিনের মধ্যেই হীরাতে
বাহিনী এসে পড়বে। আর তখন জাঁতিকলে পড়া ইঁদুরের
ছটফট্ করতে থাকব আমরা। আমাদের সে অবস্থা কল্পনা ক
খুশীর আনন্দে তারা এমনই বেসামাল হয়ে পড়েছিলো যে, পা
তাদের স্বপ্নভঙ্গকারী দাঁড়িয়ে রয়েছে, এটা তারা কল্পনাও করে

তারা চলে যেতেই আমিও দুর্গের সামনের দিকে এগোতে লাগলাম।

অন্ধকারে বুঝতে না পেরে ক্লান্ত এক সৈনিককে মাড়িয়েই বসেছিলাম। কিন্তু ঘুমের ঘোরে চীৎকার করে উঠেই থেমে গিয়েছিল সে। নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করেও কিছু যখন ঘটল না, তখন আবার এগিয়ে গিয়েছিলাম আমি।

শেষ পর্যন্ত যখন দুর্গের সিংদরজার কাছে এসে পৌঁছলাম, তখন কাকজ্যোৎস্নায় সমস্ত দিক উদ্ভাসিত। সিংদরজার মাথার ওপর দুজন সৈনিক পাহারা দিচ্ছে, আর পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছিল। পরস্পরকে অতিক্রম করে তারা দরজার একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত যাওয়া আসা করছিল। ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলাম, তারা যখন পথের শেষে এসে আবার ফিরে যাবার জন্যে মুখ ঘোরায়, তখনই একমাত্র তাদের আক্রমণ করা যায়।

কিন্তু একজনকে সরিয়ে দিতে দিতে অন্যজনও জেনে ফেলবে। আর তাহলে সে চীৎকার করে সবাইকে সতর্ক করে দেবে। এবং তাতে আমার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে। তাছাড়া বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে সে। এখনই হয়ত হুমজা খাঁর অশ্বারোহীদের দেখে চেঁচিয়ে উঠে সবাইকে আসন্ন বিপদের খবর জানিয়ে দেবে। তাদের ত অন্যমনস্ক করা দরকার। কিন্তু কি করে করবে?

হঠাৎ সুযোগও মিলে গেল। আমি যেখানে বসে ভবিষ্যৎ কর্তব্য সম্বন্ধে চিন্তা করছিলাম, ঠিক তারই কাছে একটা কুকুর প্রকাণ্ড একটা হাড় জড়িয়ে নিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়েছিল। আস্তে আস্তে কাছে গিয়ে হাতসাফাইয়ে হাড়টা তুলে নিয়ে কুকুরটার লেজে জড়িয়ে একটা গিঁট দিয়ে দিলাম।

চমকে উঠে কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করে ডাকতে ডাকতে ছুটে পালিয়ে গেল সামনের দিকে।

আশেপাশে যেসব সৈনিকরা এদিক ওদিক শুয়ে বসে বিশ্রাম করছিল, তারা প্রথমে চটে গিয়ে কুকুরটার চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার সুরু করল। তাতেও যখন সে থামল না, তখন তারা তেড়ে মারতে এল তাকে। কুকুরটার লেজে বাঁধা হাড় খোলার প্রাণপণ চেষ্টা দেখে হাসি সামলাতে পারল না তারা। তাদের হাসি শুনে আরও দু' চারজন ব্যাপারটা কি দেখতে এল।

দেখতে দেখতে ছোটখাট ভীড় জমে উঠল সেখানে। উপস্থিত লোকেদের কেউ কেউ কুকুরটাকে ত্যক্ত করে মজা দেখতে লাগল। যখনই সে হাড়টা খুলতে চায়, তখনই তার পায়ে তলোয়ারের খোঁচা মেরে তাকে সে চেষ্টা থেকে বিরত করে ওরা। কিংবা হাড়ের গায়ে তলোয়ারের ঘা দিয়ে মজা দেখে।

মানুষ যখন অন্য মানুষের বুকের রক্ত বিনা বাক্যব্যয়ে ঝরাতে এগিয়ে যায়, তখন তার সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো কিছুটা ভোঁতা হয়ে যায়। তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে অকারণ নিষ্ঠুরতায়।

কিংবা মানুষ এমনিতেই নিষ্ঠুর! নিষ্ঠুরতা তার রক্ত মজ্জায় মেশানো। মানুষই ত একমাত্র প্রাণী, যে জৈব প্রয়োজন, নয় ত সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনে স্বজাতীয়কে আক্রমণ করে। অবশ্য সে আক্রমণের এক একটা গালভরা নাম তারা দিয়ে থাকে। কখনো তা আপত্তি নিবারণে, কখনো আত্মশক্তিবর্ধনে, কখনো বা অন্য কিছু বলে। একমাত্র তথাকথিত বর্বরদের আক্রমণের একটা বিচারসহ কারণ থাকে, তারা আহার সন্ধানেই স্বজাতীয়দের ওপর আঘাত হানে।

সব সময়ে যে নিষ্ঠুরতা আত্মপ্রকাশ করে না, তার কারণ সামাজিক শক্তি। সমাজ আত্মরক্ষার জন্যই নিষ্ঠুরতাকে সহজে প্রশ্রয় দেয় না। দিলে যে দু'দিনেই সমাজের বনিয়াদ ধ্বসে পড়ে। তাই সাধারণ নিষ্ঠুর মানুষকে সমাজ সর্বশক্তি দিয়ে দাবিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। কিন্তু যুদ্ধের সময় সেই নিষ্ঠুরতাকেও প্রশ্রয় দেওয়া হয় না বলে সুস্থ মস্তিকে অন্য মানুষকে খুন করা যায় না। হত্যার ওপর যে রক্ত মূল্য বসানো হয়, যুদ্ধক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়।

মৃত্যুর মুখোমুখি যারা দাঁড়িয়ে আছে, তারা সামান্য নিষ্ঠুরতাকে যে আমল দেবে না, এ কথা ত জানাই। তবু যে পাল্টা আঘাত হানতে পারবে না তার ওপর আঘাত হানার মধ্যে যে একটা কাপুরুষতা লুকিয়ে আছে, তাকে অস্বীকার করা যায় না।

মানুষ ত কাপুরুষ। তার পৌরুষ অসংখ্যজনের মধ্যেই প্রকাশ পায়। সম্পূর্ণ একা যে পৌরুষের পরিচয় দিতে পারে, সে ব্যক্তি নমস্য। পাঁচজনের বাহবার প্রত্যাশা না করে যে আত্মত্যাগে প্রস্তুত, সে-ই প্রকৃত মানুষ।

অন্য মানুষের মধ্যে যূথবদ্ধ হিংসা নিষ্ঠুর আক্রোশের রূপ নেয়। এই নিষ্ঠুরতাই মানুষের সহজাত রূপ।

তবে সেদিনের নিষ্ঠুরতা আমার খুব কাজে লেগেছিল। সহ-যোগীরা কি করছে দেখতে সিংদরজার ওপরকার প্রহরী দুজনও সেদিকে তাকিয়ে পাহারা দিচ্ছিল। কাজেই আমার একেবারে কাছে আসাটা তাদের নজরে পড়েনি। আমার কাছাকাছি এসে একজন প্রহরী যখন অন্যদিকে ফিরে যাবার জন্য ঘুরছে, তখন আচমকা এক ধাক্কা দিতেই সিংদরজার মাথা থেকে নীচে আছড়ে পড়ে গেল সে।

তার সহযোগী অন্য প্রান্ত থেকে ঘুরে সহযোগী সৈনিককে দেখতে না পেয়ে একটু অবাক হয়ে তাকাতে লাগল। আমি তখন অন্যদিকে হাত পা ছড়িয়ে পড়ে আছি। সে হয়ত ভাবল, তার সঙ্গী কোন কারণে আহত হয়েছে, তাই তাড়াতাড়ি ছুটে দেখতে এল। কাছে আসতেই হাঁটুর পেছন দিকে প্রাণপণ শক্তিতে হাতের দা দিয়ে এক ঘা বসিয়ে দিলাম। কোন কথা আর বলা হ'ল না। মুখ থুবড়ে পড়ে সঙ্গীর পদাঙ্ক অনুসরণ করলে সে।

ভেতরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, সৈনিকরা তাদের নিষ্ঠুর খেলায় মত্ত। কুকুরটার একটা পা অকেজো হয়ে ঝুলছে। সর্বাঙ্গ থেকে রক্ত ঝরছে। আর তাকে ঘিরে লোকগুলো আনন্দ উপভোগ করছে। বাইরে দিকে তাকিয়ে দেখলাম, হুমজা খাঁর সৈন্যরা দুর্গের দিকে এগিয়ে আসছে।

ছুটে গিয়ে দরজা খোলার কপিকল ঘোরাবার হাতল ধরে ঘোরাতে সুরু করলাম। আস্তে আস্তে একটু একটু করে সিংদরজাটা খুলে যেতে লাগল। দরজা যখন প্রায় পুরো খুলে গেছে, তখনই একজনের সেদিকে নজর পড়ল। চীৎকার করে উঠল সে। আর সঙ্গে সঙ্গে সচকিত হয়ে উঠল সবাই। খেলা বন্ধ হ'য়ে গেল মুহূর্তে। একদল কপিকলটা উল্টো দিকে ঘোরাবার জন্যে সিংদরজার দিকে ছুটে এল। অন্যেরা দরজার সামনে এগিয়ে গেল আক্রমণ প্রতিরোধ করতে।

কপিকলের পাশে একতাড়া বর্শা রাখা ছিল। দরজাটা পুরো খুলে নিয়ে একটা একটা করে বর্শা আমার আক্রমণকারীদের দিকে

ছুঁড়ে দিতে লাগলাম। প্রাণের ভয় বোধহয় আমার লক্ষ্যকে স্থির করে দিয়েছিল। কিংবা এক সঙ্গে অনেকগুলি লোক ছুটে আসছিল বলেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হইনি আমি।

যে কারণেই হ'ক না কেন, একের পর এক লোকগুলো আমার ছোঁড়া বর্শার ঘায়ে লুটিয়ে পড়তে লাগল। যখন আমার হাতের বর্শা ফুরিয়ে গেল, ঠিক তখনই হুমজা খাঁ সদলে দুর্গে প্রবেশ করলেন। সিংদরজার মুখে যারা প্রতিরোধ করবার জন্য দাঁড়িয়েছিল, বন্যার স্রোতে খড়কুটোর মত ভেসে গেল তারা।

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই দুর্গাভ্যন্তর থেকে দলে দলে সৈন্য বাধা দিতে ছুটে আসতে আরম্ভ করেছিল। হুমজা খাঁর অশ্বারোহীদের সঙ্গে তাদের তুমুল যুদ্ধ বেধে গেল। প্রচণ্ড চীৎকার, অশ্বের হ্রেষাধ্বনি, আহতের আর্তনাদ আর অস্ত্রের ঝনঝনা সব মিশিয়ে একটা বীভৎস পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ যুদ্ধরত বিরুদ্ধ পক্ষের পেছন দিক থেকে নতুন করে হৈচৈ সুরু হ'ল। বুঝলাম, তৈমুর এবার আক্রমণ করেছে।

আমার কাজ শেষ হয়েছে বুঝে নীচে নামবার জন্য উঠে দাঁড়ালাম। আগে বুঝতে পারিনি, এই প্রথম লক্ষ্য করলাম শত্রুদের ছোঁড়া একটা বর্শা কখন যেন আমার কাঁধে বিঁধে গিয়েছিল। সেখান থেকে টপটপ করে রক্ত ঝড়ছে। তাড়াতাড়ি চাদরটা ছিঁড়ে কাটা যায়গাটা জোর করে এঁটে বেঁধে ফেললাম। রক্ত পড়াটা বন্ধ হয়েছে মনে হ'ল। উঠতে গেলাম, মাথা ঘুরে গেল। বুঝলাম, শরীর অতি মাত্রায় দুর্বল হয়ে পড়েছে। কোন রকমে ধরে ধরে সিংদরজার মাথা থেকে নেমে পড়লাম। তারপর সোজা আমাদের তাঁবুর দিকে ফিরে চললাম।

পথে যেতে যেতে কতবার যে পড়লাম, তার ঠিকানা নেই কিন্তু তবু যেতে হবে। শেষ অবধি চলার যখন আর সাম রইল না, তখন হামাগুড়ি দিয়ে এগোলাম। আমাদের তাঁ দরজায় পৌঁছেই কখন যে জ্ঞান হারিয়েছি মনে নেই।

পরে শুনেছি, আমাকে পথের মধ্যে অজ্ঞান অবস্থায় প থাকতে দেখে দলের লোকেরা যত্ন করে তুলে নিয়ে গিয়ে যথাবিধি চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। হাকিম সাহেব নাকি দেখে বলেছিলে আর কিছুক্ষণ পরে তাঁর কাছে নিয়ে গেলে আমায় বাঁচাতে পা যেত না। এমনিতেও বাঁচানো খুব সহজ হয়নি। অনেক দু তবে বেঁচে উঠলাম।

যুদ্ধ জয়ের সুনাম প্রায় সম্পূর্ণ টাই তৈমুরের ভাগ্যে জুটল। আ তার প্রধান সহকারী হিসেবে কালামও সে সুনামের ভাগ পেল আমার কথা কিন্তু কারো মনে পড়ল না। এমন কি আমা পরিচিত সৈনিকেরা যদি জোর করে আমায় সঙ্গে না নিত, তাহলে সেই শত্রুদেশে পথের ধারে আহত অবস্থায় ফেলে যেতে তৈমুরে বাধত না।

অবশ্য সাধারণ সৈনিকের মৃত্যুতে সেনাপতির মনে পড়া পৃথিবীতে আর যুদ্ধ বলে জিনিষই থাকত না। শুনেছিলাম কো এক দেশের, বোধ হয় এই হিন্দুস্তানের, এক রাজার মনে যুদ্ধে নৃশংসতায় এমনি ব্যথা লেগেছিল যে, তিনি জীবনে কোনদিন আ তলোয়ার ধরেননি। কিন্তু তাতে লাভ কি হয়েছিল? পরে পুরুষেই ত তলোয়ারের ঘায়ে তাঁর দেশের মাটি তাজা খু লাল হয়ে উঠেছিল।

তাই আমার আঘাতের খবর সেনাপতি তৈমুরের মনে নাড়া না দিলেও বিস্ময়ের কিছু ছিল না। কিন্তু মানুষ তৈমুর, আবদুল্লার দুধ-ভাই তৈমুর কি একবারও আবদুল্লার কথা মনে করতে পারেনি? অসুস্থ অবস্থায় কিন্তু একদিনও তার দেখা পাইনি আমি। অথচ সাধারণ সৈনিকের সঙ্গে আমার কোনদিনই বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল না। রাতদিনের অধিকাংশ সময়ই কাটত তৈমুরের সঙ্গী হিসেবে।

কাজেই তারা আমাকে ভয় করতে পারে, সমীহ করতে পারে, কিন্তু ভালবাসবে কেন? অথচ অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থায় আমাকে পরমাত্মীয়ের মত সস্নেহে সঙ্গে করে নিয়ে চলল সেইসব সাধারণ সৈনিকের দল। ঘোড়ার ওপর বেঁধে, শুইয়ে রেখে, দু'পাশ থেকে দুজন ঘোড়ার লাগাম ধরে ছুটিয়ে নিয়ে যেত স্থান থেকে স্থানান্তরে। এমনি করে সীমান্ত পেরিয়ে নিজেদের এলাকায় ফিরে এসেছিলাম আমি।

সেখানে ক'দিন পরে হীরাতী দূত এসে পৌঁছল। হীরাতী সেনাপতি আশা করেছিল, নিজের সৈন্য আর দুর্গরক্ষীদের জাঁতি-কলে ফেলে খাঁথানানের ছোট্ট সৈন্যবাহিনীকে পিষে ফেলবেন। তাঁর সে আশায় দুর্গের মৃতরক্ষীরা ছাই দিল। এতে তাঁর যেমন অবাক লাগল, তেমনি তিনি যে ভয় পেলেন, তাতে আর বিচিত্র কি? তিনি তাড়াতাড়ি তাই সন্ধির প্রস্তাব করে পাঠালেন।

ঝানু সেনাপতি হুম্‌জা খাঁ সুযোগ বুঝে সন্ধির শর্ত হিসেবে চড়া দর হাঁকলেন। বিপক্ষও এ ব্যাপারে কম যায় না। তাঁরা নামমাত্র

ক্ষতিপূরন দিতে চাইলেন। তারপর বেশ ক'দিন দর কষাকষির পর সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হ'ল।

হুমজা খাঁ প্রত্যাশার বেশী পেলেন। আর হীরাতীরা যা দেবে ভেবেছিল, তার চেয়ে কমেই পার পেয়ে গেল। কাজেই দু'পক্ষই খুশি হ'ল। অবশ্য সন্ধিপত্রের কালি শুকোবার আগেই যে কোন পক্ষ থেকে সর্ত ভঙ্গ করা হবে, তা নিতান্তই একটা সুচিন্তিত দুর্ঘটনা মাত্র। সন্ধিপত্রের স্বাক্ষরকারীরা কেউই সে দুর্ঘটনার দায়িত্ব স্বীকার করবেন না। তবে সুযোগ সুবিধামত এই দুর্ঘটনার সূত্র ধরে নতুন যুদ্ধ সুরু করবার সুযোগ ছাড়বেন না কেউই। আর তাই যদি না হবে ত দেশে-বিদেশে এত সেনাপতি, আমীর, ওমরাহরা করবেই বা কি ?

সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হ'ল। প্রাপ্য ক্ষতিপূরণের একাংশ নিয়ে হুমজা খাঁ খাঁখানানের দরবারের পথে যাত্রা করলেন। ততদিনে আমি অনেকটা সুস্থ হয়েছি। স্বাভাবিকভাবে ঘোড়ায় চড়ছি। তবে তৈমুরের কাছে না গিয়ে নতুন বন্ধুদের সঙ্গেই চলছি, ফিরছি।

আমি যে সুস্থ হয়েছি, তৈমুর কেমন করে খবর পেয়েছিল। তার কাছে আমার ডাক পড়ল। ইচ্ছা না থাকলেও যেতে হ'ল। তৈমুরের সম্বন্ধে দুর্বলতা আমার তখনো সম্পূর্ণ কাটেনি।

তৈমুর আমাকে দেখে প্রথমে খুব দুঃখ প্রকাশ করল। আমি যে বেঁচে আছি, এই কথাটাই সে জানত না। তার ধারণা হয়েছিল, সেদিনের যুদ্ধে আমার মৃত্যু হয়েছে। এখন আমাকে জীবন্ত জেনে তার যে কি আনন্দ হচ্ছে, তা আর বলবার নয়। আমাকে যারা

এতদিন শুশ্রূষা করেছে তাদের দেবার জন্য সামান্য কিছু উপহার সে পাঠাচ্ছে।

তৈমুর একজন সৈনিককে ডেকে এক থলি দিনার তার হাতে দিয়ে বললে, 'আবদুল্লাকে এতদিন যারা দেখাশোনা করেছে তাদের গিয়ে বল, আবদুল্লা যে তৈমুরের কি, তা তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না। তোমাদের চেষ্টায়, তৈমুর তার হারানো এক মহামূল্য রত্ন আবার খুঁজে পেয়েছে। তাই প্রীতি উপহার স্বরূপ এই সামান্য কিছু অর্থ তোমাদের মধ্যে বিতরণ করতে পাঠিয়েছে।'

সৈনিক তখনই হুকুম তামিল করলে। আমার নতুন বন্ধুদের মধ্য থেকে তৈমুরের জয়ধ্বনি উঠল। আমার মনে যে দুঃখ অভিমান জমা হয়েছিল, সেই উল্লাসের হাওয়ায় তা পরিস্কার হয়ে গেল। আগের মত আবার আমি তৈমুরের ছায়া হয়ে দাঁড়ালাম।

তখনকার মনটা যে কোন কিছু মেনে নেবার জন্য প্রস্তুতও ছিল। যৌবনের ধর্মই হ'ল এই, যাকে সে ভালবাসে তার ভাল মন্দর সব কিছু তার কাছে প্রশংসনীয় বলে মনে হয়। বিচার করে, ওজন করে অন্যেরা যদি প্রিয়জনের মধ্যে কোন ত্রুটি আবিষ্কার করে ত তা আবিষ্কর্তার অমার্জনীয় অপরাধ বলে মনে হয়।

যে রঙীন নেশা যৌবনের ভাল লাগার মূল, তা অতি স্বচ্ছ ত্রুটিকেও দেখতে দেয় না। পথের মাঝখানে যে গর্ত থাকে, একমাত্র অন্ধ ছাড়া সকলেরই তা চোখে পড়ে। প্রেমান্ধও তেমনি প্রিয়জনের চারিত্রিক দোষ ত্রুটি মোটেই দেখতে পায় না।

তৈমুর যে অত্যন্ত স্বার্থপর, তথা আত্মপরায়ণ, জ্ঞান অবধি ত বহুবার বহুভাবে আমি টের পেয়েছি। অথচ বারবারই নিজে অনুভূতিকে অস্বীকার করেছি। পোষা কুকুর যেমন চাবুকের ঘা ক্ষণিকের জন্য ম্রিয়মান হলেও পরমুহূর্তেই মনিবের ডাকে সা দিয়ে লেজ নাড়াতে থাকে, আমার অবস্থাও ঠিক তেমনি ছিল আমি নিজের সমস্ত কিছুই অকাতরে তৈমুরকে দিতে পারতাম তৈমুর কিন্তু নিজের পূর্ণ পরিতৃপ্তির পর ভুক্তাবশেষটুকুই আমা দিকে ছুঁড়ে দিতে রাজী থাকত।

তবু তৈমুরকে নিজের প্রাণপ্রিয় ভেবে তার জন্য নিজে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে আপত্তি ছিল না আমার। অথচ বিনিময়ে তার তরফ থেকে বিন্দুমাত্র সহানুভূতি না পাওয়ার জন্য মনে একটা ক্ষোভের মেঘ জমে উঠেছিল। মনে মনে স্থির করেছিলাম, অতীত স্মৃতিকে ভুলে যাবার চেষ্টা করব। নতুন করে জীবন সুরু করব আবার। কিন্তু হায়! নিজের মনকে ত বশ করতে পারিনি। ডাক আসবার মাত্র ছুটে এলাম।

তৈমুরের মনস্তত্ত্ব অবশ্য এখন বুঝতে কষ্ট হয় না। কুকুরের কাছ থেকে কিছু কাজ পাওয়া যায় বলেই মানুষ তাকে কাছে রাখে। সে কাজ যখন আর তাকে দিয়ে করানো যাবে না, তখন তাকে নিতান্ত অবহেলা ভরে ত্যাগ করতে বাধে না তার।

কিন্তু যখন সে কাছে থাকে না, তখনই তার অভাবে মনের মধ্যে যে একটা শূন্যতা আসেই। সেইজন্যই তাকে আবার খুঁজে পেলে নতুন করে আনন্দ হয়। আর সে আনন্দের বহিঃপ্রকাশ ঘটে যার কাছ থেকে পুরানো সংগীকে পাওয়া গেল তাকে পুরস্কৃত করায়।

তৈমুরের কাছে আমার মূল্যও নিশ্চয় পোষা কুকুরের চেয়েও বেশী মূল্যবান। তাই তাকে ফিরে পাবার আনন্দে বহু স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করতে দ্বিধা করেনি সে। অন্যেরা তাকেই মহত্ত্ব তথা দানশীলতা বলে মনে করেছে।

ধনীদের মুষ্টি ভিক্ষাতেই গরীবের পেট ভরে। তাই দুনিয়ার অনেক অনাচার অবিচার সহ্য করা হয়। কিন্তু একদিন এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে, সেদিন সর্বংসহা পৃথিবীর মত জনগণেরা মাথা নাড়া দিয়ে উঠবে। আর বহুযত্নে রচা স্বর্ণসিংহাসন সেদিন ধুলার মধ্যে পড়ে গুঁড়িয়ে যাবে। তবে সেদিন এখনো দূর অস্ত। ততদিন তৈমুররা তাদের সাধের সিংহাসনে বসে যথেচ্ছ ব্যবহার করুক।

হমজা খাঁ ফিরে এসে তৈমুরের সম্বন্ধে খাঁখানানকে কি জানিয়ে ছিলেন জানি না। কিন্তু দরবারে হঠাৎ তৈমুরের খাতির খুব বেড়ে গেল। কিছুদিন পরে শুনলাম, আতিকের বোন আইজলের সঙ্গে তার বিয়ের কথা ঠিক হয়ে গেছে।

অল্পদিন আগে যে মানুষটিকে ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত স্থান থেকে স্থানান্তরে ছুটে বেড়াতে হয়েছিল, তার ভাগ্যে রাজকীয় সম্মান বিস্ময়কর হলেও নিঃসন্দেহে সুখকর। তৈমুরের ভাগ্যাকাশের মেঘ সরে গিয়ে যে একেবারে পূর্ণচন্দ্রোদয় হবে, একথা অতি ক্ষীণ-ভাবেও কখনও তার মনে আসেনি। তবে তা যখন হল, তখন অনাস্বাদিত সৌভাগ্যলাভে তৈমুরের মাথা ঘুরে গেল না। বরঞ্চ তার ব্যবহারে মনে হ'ল, যা ঘটছে তাই যেন অতি স্বাভাবিক।

যথা সময়ে বিয়ে হয়ে গেল তাদের। নব বধূকে নিয়ে স্বদেশে ফিরে এলাম আমরা। তার সমস্ত কাজ,—প্রয়োজনীয় তথা করণীয় কাজ ভুলে গিয়ে নতুন প্রেমের মোহে মুগ্ধ হ'য়ে রইল তৈমুর। বারলারা তাদের বীর এই ব্যবহারে পুলকিত না হলেও, নব যৌবনের জয়যাত্রাকে মেনে নিয়েছিল। পরে তৈমুর স্বীকার করেছিল, আইজল যদি আর কিছুকাল বেশী বাঁচত, তাহলে বিশ্বজয়ী তৈমুরলঙের প্রকাশ বোধহয় কোনদিনই ঘটত না।

তৈমুর যখন আনন্দসায়রে কেলিমগ্ন, বিশ্ব তখন স্থির হ'য়ে নেই। হীরাতের সুলতান আবার তার পুরানো অভ্যাসমত আমাদের সীমান্ত অঞ্চলে লুটপাট সুরু করে ছিল। খাঁখানানের কাছ থেকে হুকুম এল, হীরাত রাজ্যকে উপযুক্ত শিক্ষা দাও।

প্রথমে এই আদেশে কান দেয়নি তৈমুর। কিন্তু বারবার যখন একই আদেশ আসতে লাগল, তা না মেনে পারল না সে। কিছুদিনের মধ্যেই সৈন্য সজ্জা করে হীরাতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করতে হ'ল তাকে।

যুদ্ধ হ'ল কিন্তু নামমাত্র। দুর্বার গতিতে আমরা হীরাত অভিমুখে এগিয়ে চললাম। বার বার বাধা দিতে এসে তৈমুরের যুদ্ধকৌশলে হীরাতী সৈন্য পর্যুদস্ত হয়ে যেতে লাগল। শেষ পর্যন্ত আমরা যখন হীরাতের উপকণ্ঠে পৌঁছলাম, তখন নিরুপায় হীরাত সুলতান সন্ধি প্রার্থনা করলেন। তৈমুর সন্ধির প্রস্তাব যা করল, তাতে কিন্তু সেই অবস্থাতেও হীরাত সুলতান ইতস্ততঃ করতে লাগলেন।

কিন্তু তাঁর সৈন্যদলের সামান্যতম প্রতিরোধ প্রচেষ্টাও যখন আমরা অবলীলাক্রমে ব্যর্থ করেছিলাম, তখন সেই অপমানজনক সর্তই তাঁকে মেনে নিতে হ'ল। হীরাত রাজ্যের বেশ একটা অংশ তৈমুরের তাঁবে এল। অবশ্য সুলতান কন্যা আমিনাকে বিয়ে করার যৌতুক হিসেবে সে এটা পাচ্ছে, এই কথাই প্রচার করা হ'ল। আবার সুলতান কন্যার দূরদেশে একলা থাকতে খারাপ লাগবে বলে অন্যতম সুলতান পুত্র হোসেন বোনের সঙ্গে আসবে বলে সবাই জানল।

আসলে সুলতান যাতে সন্ধির সর্ত পালন করেন, তারই জন্যে তৈমুর সুলতান কন্যাকে বিয়ে করল। আর জামিনস্বরূপ সুলতান পুত্রকে নিজের কাছে রেখে দিল।

সস্ত্রীক ফিরে এল তৈমুর। নতুন করে সুখের স্বপ্ন গড়ে উঠতে লাগল তার। আমিনার মধ্যে কামনা তার মূর্ত হয়ে উঠল। তবু তৈমুর স্বীকার করলে, কামনার শান্তি আমিনা করলেও আইজলের মত নেশা ধরাত না। একদিকে আইজল, আর অন্যদিকে আমিনা—তৈমুরের আশা আকাঙ্ক্ষা সব কিছু এই যুগল চূড়ার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে গেল।

অল্পদিনের মধ্যেই আইজলের কোলে এল তৈমুরের প্রথম সন্তান জাহাঙ্গীর। স্বামীর প্রথম সন্তানের জননী হতে না পারায় আমিনা একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। কিন্তু সে সামান্য ক্ষণের জন্যে। আসন্ন মাতৃত্বের গর্বে তার ক্ষোভও মিলিয়ে গেল।

যমজ সন্তানের জননী হ'ল আমিনা। জ্ঞান-অজ্ঞানের ছায়া-পথেও কিন্তু প্রথম সন্তানকে চিনতে ভুল হয়নি তার। রাফাত

হ'ল তার নয়নের মনি। জননীর মধ্যে দয়িতা-আমিনা, প্রিয়া আমিনা নিঃশেষে হারিয়ে গেল চিরতরে।

তৈমুরের সুখের সংসার কিন্তু স্থায়ী হ'ল না। খবর এল বৃদ্ধ খাঁখানান মর্মান্তিক অসুস্থ। পিতামহকে দেখতে চলে গেল আইজল। অল্পদিন পরেই খবর এল, হীরাতের সুলতান অসুস্থ, মেয়েকে দেখতে চান। পিতৃগৃহ অভিমুখে রওনা হ'ল আমিনাও।

একা ঘরে তৈমুর যেন হাঁফিয়ে উঠল। একাকীত্বের নিঃসঙ্গতা কাটাবার জন্যে কৈশোরের মত আমাকে সঙ্গে নিয়ে সহজলভ্যা নারীদের সন্ধানে বেরোতে লাগল সে। এইভাবেই রহমাকে আবার আবিষ্কার করলাম আমরা।

প্রথম যখন সেখানে গিয়েছিলাম তখন কল্পনাও করতে পারিনি যে, আমরা মনিরা বিবির সেই পুরাণো ডেরায় ফিরে গিয়েছি। ডেরার মালিকান রহমা বিবিকেও তাই চিনতে পারিনি। সে কিন্তু আমাকে দেখেই চিনেছিল। ছুটে এসে সেলাম জানিয়েছিল আমীর তৈমুরকে।

তৈমুর যখন বিস্ময় প্রকাশ করল, তাকে সে চিনলে কি করে? দুষ্টুমিভরা হাসি হেসে জবাব দিয়েছিল সে, সামবাহাদুরের চাবুকের দাগ যে এখনও গা থেকে মিলোয়নি।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকে উঠেছিলাম আমরা। তৈমুর তাকে কাছে টেনে অতীত বর্তমান ভবিষ্যতের কথা বলতে সুরু করেছিল। দূরে দাঁড়িয়ে আমি শুধু তাদের বিশ্রম্ভালাপ শুনেছিলাম।

এরপর থেকে তৈমুরের সময় কাটাবার নিয়মিত জায়গা হয়েছিল রহমার ডেরা। বিকাল হলেই সে ছুটে যেত, তারপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে আসত সেখানে।

রহমার উপস্থিতি তার চঞ্চল মনকে কিছুটা শান্ত করে রেখেছিল। তার ভাগ্যাকাশে তখন প্রাবৃটের ঘনঘটা। বুড়ো খাঁখানানের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে একাধিক উত্তরাধিকারী খাড়া হয়েছিল তাঁর। তাদের পরস্পরের দ্বন্দ্বের সুযোগে সুলতান মাথা চাড়া দিয়ে উঠলেন।

খাঁখানান যে সুলতান ছিলেন না, এই কথাটাই ভুলে গিয়েছিলাম সবাই। ভুলে গিয়েছিলাম তাতারীর সুলতানের কথা। কারণ সুলতান ছিলেন খাঁখানানের হাতের খেলার পুতুল। অবশ্য সে পরিচয়ে তিনি যে খুশী ছিলেন না তা বলাই বাহুল্য। এবার সুযোগ পেয়ে ক্ষমতা অধিকারের চেষ্টা করলেন। তাঁর সৈন্যদল চতুর্দিকে লুটপাট করতে করতে আমাদের সহরের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। এই সুযোগে তৈমুরের অধিকারভুক্ত হীরাতের অংশটুকুও বিদ্রোহী হ'ল। দুদিকে শত্রুর চাপে পড়ে চুপচাপ বসে থাকতে হ'ল তৈমুরকে।

সুলতানের সৈন্যবাহিনী এসে সহর দখল করে নিল। সেনাপতি সদলবলে এসে তৈমুরের বাড়ীতে আস্তানা নিল। শত্রু সৈন্য এসে পড়ার ভয়ে লোকজন যখন চঞ্চল হ'য়ে সহর ছেড়ে পালাতে সুরু করেছিল, রহমা তার সঙ্গিনীদের নিয়ে তখনই প্রাসাদে চলে এসেছিল। প্রথম দিন রাত্রে খাবার সময় তৈমুরের বেগম আর তার সঙ্গিনীর ভূমিকা তারাই গ্রহণ করলে।

সুলতানের সেনাপতিকে দেখলেই অতি হীন চরিত্রের মানুষ বলে মনে হ'ল। খেতে বসে তৈমুরের বেগম সম্বন্ধে সে নানারকম অশ্লীল ধরনের মন্তব্য করতে লাগল। আমরা যেন শুনেও শুনিনি এমনই ভাব দেখালাম।

খাওয়া শেষ হতেই সে আবদার ধরে বসল, এবার তাদের নাচ গান শোনাতে হবে। বেগম সাহেবার সঙ্গিনীরা দু'একজন হুকুম তামিল করলে, কিন্তু তার তা ভাল লাগল না। ফরমাস করলে, 'এবার বেগম সাহেবাকে নাচ দেখাতে হবে।'

তৈমুর আপত্তি জানালে, 'বেগম সাহেবা এমন সর্বজন সমক্ষে নাচবে কি করে?'

ধমক দিল সেনাপতি, 'নাচবে! নিশ্চয় নাচবে। তোমার যদি দেখতে ইচ্ছে না করে চলে যেতে পার। নয়ত চুপ করে বসে থাক। বেশী কথা বললে তোমার মুখ বন্ধ করে দেব।'

রহমা কাতর ভাবে তৈমুরের দিকে একবার তাকাল, তারপর যেন অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্বে উঠে দাঁড়িয়ে নাচতে সুরু করল। কিন্তু তার সে নাচ সেনাপতির ভাল লাগল না। হুকুম দিলে, 'ওকে নাচ বলে নাকি? ও নাচ দেখে রক্তইত চঞ্চল হয় না। কাপড় চোপড় খুলে ফেলে নাচ!'

তৈমুর লাফিয়ে উঠল, 'সেকি? এতজন অপরিচিত পুরুষের সামনে আমার বেগম পোষাক আষাক খুলে নাচবে কি?'

সেনাপতি বললে, 'হ্যাঁ নাচবে, আমার হুকুমে নাচবে। কই নাচ, দেরী করলে আমার লোকেরা জোর করে কাপড় খুলে নেবে।'

যেন নিতান্ত বাধ্য হয়ে সলজ্জ বধূর মত অঙ্গবাস খসাতে

লাগল রহমা। তার দেহ যতই নিরাবরণ হতে লাগল, সেনাপতির চোখে মুখে লালসা ততই যেন উগ্র হ'য়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত প্রায় নগ্নাবস্থায় সে যখন রক্তে জ্বালা ধরানো নাচ শুরু করলে, তখন আর আত্মসম্বরণ করতে পারল না সেনাপতি। ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেল নিজের বাসনা চরিতার্থ করতে। তার সঙ্গীরা যেন এরই অপেক্ষা করছিল। সঙ্গে সঙ্গেই উঠে দাঁড়িয়ে পছন্দসই এক একজন সঙ্গিনীকে ধরে নিয়ে চলে গেল। শূন্য ভোজন কক্ষে বসে রইলাম আমি আর তৈমুর।

তৈমুর আমার মুখের দিকে চেয়ে সূক্ষ্ম হাসি হাসলে। ভাবটা মনে হ'ল—দেখ কেমন ঠকালাম বোকাগুলোকে।

আমি কিন্তু হাসতে পারলাম না। যদিও রহমা বা তার সঙ্গিনীদের অপরিচিত পুরুষের কাছে দেহদান নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার, তবু এই রকম সর্বজন সমক্ষে তাদের অপমান আমার পক্ষে বরদাস্ত করা কঠিন হ'ল।

আমার মনে হ'তে লাগল যেন নিজের মেয়ে বৌকে পরের হাতে তুলে দিয়েছি। নিজের ইজ্জত বিক্রী করেছি। নিজের উঁচু মাথা হেঁট করেছি। যে অত্যাচার শত্রুপক্ষের মেয়েদের ওপর সর্বদাই করেছি, সেই অত্যাচারই যেন আমার মর্মমূলে পীড়া দিতে লাগল। এ পীড়ার কোনও অর্থই আমার কাছে বোধগম্য হ'ল না কিন্তু।

পরের দিন যাবার সময় সেনাপতি তৈমুরের আতিথেয়তার প্রশংসা করে আশা প্রকাশ করলে যে, ফেরার পথে আবার সে তৈমুরের আতিথ্য গ্রহণ করবে।

কিন্তু ফিরে আসতে হ'ল না তাকে। খাঁথানান পরের

উত্তরাধিকার নিয়ে তাদের অন্যতম প্রধান হুমজা খাঁর কাছে শুধু যে শোচনীয় ভাবে পরাজিত হ'ল তাই নয়, সসৈন্যে নিহত হ'ল। এই পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে সুলতানের সুলতানীর রঙীন স্বপ্নও বিলীন হয়ে গেল।

মানুষ তার ভবিষ্যত দেখতে পায় না বলে তার জীবনকে একরকম ভাবে নিয়ে যায়। দেখতে পেলে হয়ত তার সমস্ত জীবনের গতি অন্যমুখী হয়ে দাঁড়াত।

ইতিহাসে এমন ঘটনা প্রায় দেখা যায়, যেখানে বিচারের সামান্য ভুলের প্রচণ্ড মাশুল গুণে দিতে হয় নিজের জীবনের বিনিময়ে। অথচ সামান্য একটু বুঝে চললে হয়ত গৌরবের উত্তুঙ্গ চূড়ায় আরোহণ করা সম্ভবপর হ'ত।

সুলতানের সেনাপতি যদি তৈমুরকে খেপিয়ে না দিয়ে তাকে দলে টানবার চেষ্টা করত, তাহলে হয়ত তার ভাগ্যফল অন্যরকম হ'তে পারত। কিন্তু তাহলে তৈমুরের ভবিষ্যত ফল ত সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে যেত।

পরবর্তী যে ঘটনা প্রবাহ তৈমুরকে একটু একটু করে বিশ্বজয়ী করে দিয়েছিল, সেদিন সুলতানের পক্ষে যোগ দিলে তাকি সম্ভব হ'ত? হয়ত সুলতানের সেনাপতি হয়েই জীবন কাটত তার।

হিন্দুস্থানের মানুষ বলে নসীব সবচেয়ে বড় কথা। কথাটা হয়ত সত্যি নয়। হয়ত সুলতানের সেনাপতি থেকেও তৈমুর আজকের অবস্থায় পৌছতে পারত। কিন্তু আমার কাছে শুধু নসীবকে মানা কঠিন। আমিত দেখেছি, নসীবের ফেরে পড়েও তৈমুর আবার কেমন তাকে নিজের অনুকূল করে আনল।

হয়ত বলা হবে নসীব ঘুরে গেছে। কিন্তু তা ঘুরল কি করে? তৈমুরের হাতের খোলা তলোয়ারই তার ভাগ্য-রথের চাকাকে বন্ধুর উপত্যকার পথে চূড়ার দিকে উঠিয়ে নিয়ে গেছে। প্রতিকূল ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করবার ক্ষমতা যদি তার না থাকত, হারাবার আগেই যদি হার সে মানত, তাহলে কি শাহানসা তৈমুরকে দেখা যেত?

কাজেই নসীবের ওপরও কিছুটা প্রভাব ফেলতে পারে মানুষের পুরুষকার। পুরুষকার না থাকলে সৌভাগ্য সূর্য অস্তমিত হতে বেশী দেরী লাগে না। ইতিহাসের পাতায় পাতায় তার অসংখ্য প্রমাণ উজ্জল অক্ষরে লেখা আছে।

এবার খাঁখানান পদাধিকারীদের মধ্যে তীব্র লড়াই সুরু হ'ল। সারা দেশটাই একটা প্রকাণ্ড যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হ'ল। আজ এখানে কাল ওখানে ছোট-বড়-মাঝারি নানা দাবীদারের নানারকম সৈন্যদলের অত্যাচার লেগেই রইল। যে কোন কারণেই হ'ক, বারলারা এ ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্ত রইল। তৈমুর অবশ্য চুপ করে বসে রইল না। নিজের শক্তি বৃদ্ধি করে চলল। সে কোন দিকেই যোগ দিল না। দূর থেকে শুধু ফলাফল লক্ষ্য করে চলল।

ক্রমশঃ অন্যান্য দাবীদারকে নিশ্চিহ্ন করে পূর্বতন খাঁখানানের আদরের নাতি আতিক আর তাঁর প্রধান সেনাপতি হুমজা খাঁ সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হলেন। নিজের দলে টানবার জন্য আতিক ভগ্নাপতির কাছে দরবার করতে এল। পরিণত বিচারবুদ্ধি অনুসারে তৈমুর তার অনুরোধ অগ্রাহ্যই করত হয়ত, কিন্তু তখনও সে আইজলময়।

ভায়ের পক্ষে আইজলের ওকালতি আর অশ্রু সে এড়াতে পারল না। আতিকের দলে ভিড়তে হ'ল তাকে।

আতিক আর তৈমুরের মিলিত সৈন্য বাহিনী হুমজা খাঁকে আক্রমণ করতে এগিয়ে গেল। যুদ্ধের প্রাথমিক সুবিধাটা ছিল হুমজা খাঁর। ছোট একটা পাহাড়ের পাশে অর্ধচন্দ্রাকৃতি তাঁর সৈন্য সমাবেশ তৈমুরদের বিপদে ফেলতে পারত। কারণ পাহাড়ের দ্বারা দু'পাশ রক্ষিত হওয়ায়, হুমজা খাঁ মাঝখানে সৈন্য সমাবেশ বেশী রাখতে পেরেছিলেন; অর্থাৎ যেখানে আক্রমণের সম্ভাবনা সর্বাধিক, সেখানেই হুমজা খাঁর শক্তি ছিল সবচেয়ে বেশী। এক্ষেত্রে জয়লাভের সম্ভাবনা নেই বললে ভুল করা হবে না।

হুমজা খাঁ সেইজন্যই বোধহয় তরুণ দুই সেনাপতির আক্রমণ প্রচেষ্টাকে কিছুটা অবজ্ঞার চোখেই দেখেছিলেন। তৈমুরকে তিনি ভাল করেই চিনতেন। অসম্ভবকে সম্ভব করার ক্ষমতা যে সে রাখে, এ ধারণাও তাঁর ছিল। তবু শতযুদ্ধ বিজয়ী হুমজা খাঁ শত্রুকে তুচ্ছ করার প্রাথমিক ভুল করে বসলেন।

সে ভুলের মাশুলও প্রায় হাতে হাতেই দিতে হচ্ছিল তাঁকে। আতিকের অবিমৃষ্যকারিতা যেমন তাঁকে বাঁচিয়ে দিল, তেমনি নিজেদের বিপর্যয়ও ডেকে আনল।

ত্রিশির বর্শার আকারে সৈন্য সমাবেশ করলে তৈমুর। দু'পাশে রইল সে আর কালাম। আতিকের ওপর রইল মধ্য ভাগের ভার। ভোরের আবছা আলোয় যুগপৎ আক্রমণ সুরু হ'ল। অবিশ্বাস্য দক্ষতার সঙ্গে দু'পাশ থেকে আমাদের সৈন্যবাহিনী মাঝখানের দিকে এগিয়ে চলল। আতিক অবশ্য মাঝখানে হুমজা খাঁর সামনা

সামনি পড়ে মোটেই সুবিধা করতে পারছিল না। তাহলেও তৈমুর আর কালাম এত কাছাকাছি হয়ে এসেছিল যে, আর একদণ্ড পরেই হুমজা খাঁর যুদ্ধজয়ের সমস্ত সম্ভাবনা নির্মূল হয়ে যেত।

ঠিক এই সময়ে প্রচণ্ড একটা ভুল করে বসল আতিক। হয়ত যুদ্ধ জয়ের সমস্ত গৌরব একা তৈমুরের হলে খাঁখানান পদের জন্য সেই-ই সব চেয়ে বড় দাবীদার হয়ে দাঁড়াবে, এ চিন্তা তার মাথায় নিশ্চয়ই খেলে থাকবে। নইলে সদলে সে বাঁ দিকে হেলে পড়ল কেন? ফলে আমাদের ব্যূহের মাঝের অংশ খুব দুর্বল হয়ে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে প্রাপ্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করলেন হুমজা খাঁ। সংরক্ষিত বাহিনী নিয়ে দুর্বল মাঝের অংশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিনি। আমাদের প্রতিরোধ ব্যবস্থা খান খান হয়ে ভেঙে পড়ল তখনই।

হুমজা খাঁর অশ্বারোহী বাহিনী পেছন থেকে তৈমুরকে আক্রমণ করে হঠিয়ে দিলে। করতলগত জয় ক্ষণিকের মধ্যে পরাজয়ের অন্ধকারে মুখ লুকাল।

শেষ পর্যন্ত আমাদের পালাতে হ'ল। কিন্তু আশ্রয় কোথায়? হুমজা খাঁর প্রতিপক্ষকে কে আশ্রয় দেবে? তিনিও শত্রুর শেষ রাখতে চাইলেন না। পলায়নপর শত্রুদলকে ছায়ার মত অনুসরণ করে চলল তাঁর বাহিনীর একাংশ। এদিকে আমাদের চলার পথে বাধাস্বরূপ ছিল আইজল আর আতিকের স্ত্রী দিলশাদ।

কাজেই আমাদের পালানো প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠল। তৈমুরদের পালানোর সুবিধা করে দিতে আমিই যুক্তি দিলাম, আমরা দু'দলে ভাগ হয়ে যাই না কেন।

আমার মত সবাই মেনে নিল। তৈমুরের দলকে পালাবার সুযোগ করে দিতে আমরা রুখে দাঁড়ালাম। কিছুক্ষণ লড়াইয়ের অভিনয় করে ভিন্নপথে ছুটে চললাম। অনুসরণকারীরা আমাদের ফাঁদে পা দিলে। তৈমুর আর আতিক আমাদের দলে আছে মনে করে আমাদেরই পেছু নিল তারা। ঝাড়া হাত পা আমরা নিশ্চিন্ত মনে খেলাতে খেলাতে নিয়ে গিয়ে সুবিধে মত তাদের নিকেশ করে দিলাম।

কাজ শেষ করে তৈমুরের খোঁজে ফিরে এলাম। খুঁজে খুঁজে যখন আবিষ্কার করলাম, তাদের অবস্থা তখন রীতিমত সঙ্গীন হয়ে পড়েছে। শুনলাম, আমরা আলাদা হয়ে যাবার পরের দিন আইজলের ঘোড়াটা মুখ থুবড়ে পড়ে পা ভাঙে। বাড়তি ঘোড়া না থাকায় আইজলকে নিজের ঘোড়ায় চাপিয়ে হাঁটতে হয় তৈমুরকে। ফলে তার পায়ের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়ে। গত্যন্তর না দেখে মেষপালকদের এক ডেরায় গিয়ে ওঠে তারা।

আবার সকাল বেলা উঠে দেখে বাকী তিনটে ঘোড়াও উধাও। কার্যত তারা মেষপালকদের বন্দী। প্রথমে জোর করে নিজেদের দাবী প্রতিষ্ঠা করতে এসেছিল তারা, কিন্তু তৈমুরের তলোয়ারের মুখে হটে যেতে বাধ্য হয়। তখন তারা অবরোধ করে দাঁড়ায় আর জানিয়ে দিল, তাদের দাবী পূরণ না করলে হুমজা খাঁকে পলাতকদের খবর দিয়ে দেওয়া হবে।

দাবী অবশ্য তাদের সামান্যই। নিঃসঙ্গ জীবনকে মধুরতর করার জন্য দিলশাদ ও আইজলকে প্রয়োজন। স্ত্রীদের উপভোগ করতে দিলে স্বামীদের পালাবার ব্যবস্থা করে দিতে পারে। অবশ্য

যারা যে সরাসরি হুমজা খাঁর তাঁবুতে পেশ হবে না, এমন কোন নিশ্চয়তা তারা দেবে না, এ কথা বলাই বাহুল্য।

আতিক কিছুটা নিমরাজী ছিল। তার মনোগত অভিপ্রায়, আপনি বাঁচলে বাপের নাম। স্ত্রী গেলে আবার স্ত্রী হবে, কিন্তু মাথা গেলে কি মাথা হবে? তৈমুর কিন্তু বুঝেছিল, ও ভাবে বাঁচা যাবে না। তাই সরাসরি ঘৃণাভরে প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করে। তারা তখন হুমজা খাঁকে খবর দিতে যায়।

এই রকম একটা ঘোরালো অবস্থার মধ্যে আমরা গিয়ে পৌঁছলাম। আমাদের হাতে রক্ষী মেষপালকদের মাথাগুলো গর্দান থেকে আলাদা হয়ে গেল। তাদের আর আমাদের বাড়তি ঘোড়া তৈমুরদের মুক্তির পথ খুলে দিল। জানি না সম্পূর্ণ অক্ষম অবস্থায় বন্দীদের আকস্মিক অন্তর্ধানে হুমজা খাঁর লোকেদের সামনে কি অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। তবে লোভী মেষপালকদের বিস্মিত বিপন্ন মুখের কথা স্মরণ করে আমরা বিমল আনন্দলাভ করেছিলাম।

ক'দিনের অতিরিক্ত পরিশ্রম, দুশ্চিন্তা, অনিয়ম সব মিলিয়ে আইজল খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তৈমুরের চিন্তা বাড়াবার ভয়ে সেকথা সে প্রকাশ করেনি। অবশ্য প্রকাশ করলেও বিশেষ কিছু যে লাভ হ'ত এমন নয়। কারণ তৈমুরের দুশ্চিন্তা বাড়া ছাড়া করণীয় কিছুই ছিল না।

আমরা পৌঁছানোর পর তার নিরুদ্ধ আবেগ মুক্তি পেল। দুর্বল দেহ সেই প্রচণ্ড বেগ সইতে পারল না। নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছবার আগেই বিস্তীর্ণ তৃণভূমির মাঝখানে তৈমুরের বাহুবন্ধনের

মধ্যেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল সে। পরিচিত পরিজন ... বহুদূরে নিঃসঙ্গ প্রান্তরে শেষ আশ্রয় রচিত হ'ল তার। বসন্তের ... তৃণদল সেখানকার সমস্ত চিহ্ন মুছে দিয়েছিল। ভবিষ্যত বিশ ... তৈমুরলঙ্গের শেষ স্মৃতিটুকু সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেল।

আইজলের মৃত্যু তৈমুরের জীবনের এক দিকচিহ্ন। ঐ এ ... আঘাতে তার জীবনের ছেলেবেলাকার মধুর স্বপ্ন, যৌবনের ... প্রেমবিহ্বলতা, যা কিছু দুর্বলতা ধুয়ে মুছে গেল। আমীর তৈমু ... তৈমুরলঙ্গে উত্তরণ-পথের একমাত্র বাধা, একমাত্র বন্ধন আইজ ... মৃত্যু সময়োচিতই হয়েছিল। নাহলে সাধারণ আমীর হিসা ... হয়ত সারাজীবন কাটত তার। আইজলের মধ্যে দিয়ে স ... বিশ্বকে যেন পেয়েছিল সে। আইজলের বিহনে তাই সারা বিশ্ব ... ধরতে চাইল। আইজলের কোমল দেহকে আদরে-সো ... বাঁধতে গিয়েও পারেনি বলেই বোধহয় বিশ্বসংসারকে দলিত ম ... করে চরমানন্দ পেতে চাইত সে।

বহুবল্লভ তৈমুরের জীবনে আইজলের আগেও বহু নারী এসে ... গিয়েছে। তার জীবনের প্রথম দুই নারী, খাঁখানানের ... দুই বাঁদীর কথা মনে আছে আমার। জীবনের প্রথম নিজস্ব ... পেয়ে তৈমুর যেন উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু কিছুদিন পরে ... থেকে ফিরে যখন দেখলে তারা অন্যের লুঠের মাল হয়ে গে ... তখন ক্ষণিকের জন্য উন্মনা হয়ে গিয়েছিল মাত্র। তারপর তা ... কথা আর ক্ষণেকের জন্যেও মনে আসেনি তার। আইজ ... মৃত্যু কিন্তু তাকে প্রায় উন্মত্ত করে তুললে। একমাত্র আইজ ... সন্তান জাহাঙ্গীর তাকে কিছুটা শান্ত করতে পারত।

ক্রমে ক্রমে তৈমুর শান্ত হয়ে এল। এ শান্তির রহস্য অন্যের চোখে ধরা না পড়লেও আমার চোখ এড়ায়নি। আতিকের স্ত্রী দিলশাদ বেগমের কাছেই জাহাঙ্গীরকে রাখা হয়েছিল। আর সেই সুবাদে তৈমুর আর দিলশাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ক্রমে বেড়েই চলেছিল। সেই ঘনিষ্ঠতাই তৈমুরের অশান্ত মনকে শান্ত করে আনল। আইজলের জ্ঞাতিবোনের মধ্যেই বোধহয় তাকে খুঁজে পেল তৈমুর।

তৃণভূমি পেরিয়ে এসে আতিক আর তৈমুর ভিন্ন পথ ধরল। আতিক নিজের আস্তানায় ফিরল। দিলশাদ আর তৈমুরের মধ্যে যে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় হ'ল তাতে ভবিষ্যতের অনেক কিছুর আভাস রইল। নিশ্চিন্ত মনে তৈমুর ঘোড়ার লাগাম আলগা করে নিল। পরবর্তী পদক্ষেপের আগে অনেক সময় পাওয়া যাবে।

আবার সেই যাযাবর জীবন! আবার সেই দিক থেকে দিগন্তে ছুটে বেড়ানো। সেই শৃগাল বৃত্তি! কিন্তু ক্ষমতার স্বাদ পাওয়া, প্রেমের শৃঙ্খলমুক্ত তৈমুর, আগের সে লক্ষ্যহীন স্রোতে ভাসা তৈমুর নয়। পালাতে পালাতেই ভবিষ্যতের কর্মপন্থা স্থির করে নিয়েছিল সে। আস্তে আস্তে তারই প্রস্তুতি চলছিল তার।

দেখলাম, এক এক ডেরায় এসে থামে তৈমুর, আর তার দলের লোকসংখ্যা বাড়ে। অবশ্য আমরাই তৈমুরের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার উজ্জ্বল চিত্র এঁকে তাদের প্রলুব্ধ করতাম। কিন্তু তৈমুরের নতুন ধরণের রণশিক্ষার আকর্ষণও বড় কম কাজ করত না।

দীর্ঘদিন ধরে রীতি ছিল, বাইরের খোলা জায়গায় লড়াই চলবে

দু'দল অশ্বারোহীর মধ্যে। আক্রমণ, প্রতিআক্রমণ, প্রতিরোধ সব কিছুই করা হ'ত তাদের দিয়ে। তৈমুর সে ব্যবস্থার কিছুটা পরিবর্তন ঘটাতে চাইলে।

আক্রমণ প্রতিআক্রমণের দায়িত্ব অশ্বারোহী বাহিনীর ওপর রেখে দিয়ে প্রতিরোধের দায়িত্ব দেওয়া হ'ল পদাতিকদের ওপর। মধ্য এশিয়ার ঐ অঞ্চলে এ পরিবর্তন বৈপ্লবিক বলা চলে। যেখানকার শিশুরাও অশ্বারোহণ প্রায় প্রথম হাঁটতে শেখার সঙ্গে সঙ্গেই শেখে, ঘোড়া যাদের দ্বিতীয় সত্তা,—ঘোড়ার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া যাদের কাছে শাস্তি স্বরূপ, ঘোড়ার সংখ্যা থেকে যেখানে ব্যক্তির পদমর্যাদার বিচার করা হয়, সেখানে পদাতিক বাহিনীতে যোগ দেবার লোক পাওয়া কঠিন হবে, তাতে আর বিচিত্র কি?

অথচ শুধু প্রতিরোধ নয়। দুর্গ জয়ের কাজে পদাতিক বাহিনীর প্রয়োজনীয়তা অতি মাত্রায় অত্যাবশ্যক। শেষ পর্যন্ত কালামকে ঘোড়া ছেড়ে পদাতিক বাহিনীর নেতৃত্ব নিতে হ'ল। তার দেখাদেখি দু'চারজন করে লোক এসে জড় হতে লাগল।

একটু একটু করে তৈমুরের নতুন যুদ্ধ কৌশল সবাই কারো রপ্ত হয়ে গেল। শেষের দিকে কুচকাওয়াজে পদাতিক বাহিনীর লোকরা নিজের নিজের ঘোড়া থেকে নেমে জায়গা মাফিক দাঁড়িয়ে পড়ত। ঘোড়া রাখার কাজ ছিল যাদের, তারা ঘোড়া সরিয়ে নিয়ে যেত। তারাও আক্রমণকারী অশ্বারোহীদের বর্শা ছুঁড়ে প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করত। বিপক্ষ দল বিপর্যস্ত হয়ে পড়লে আবার অশ্বারোহণে তাদের অনুসরণ সুরু করত। কোন দুর্গ আক্রমণ কালে তারাই এগিয়ে গিয়ে দুর্গপ্রাকারে চড়ে দুর্গে প্রবেশের

চেষ্টা করত। তাদের পক্ষে সাধারণ অশ্বারোহীর চেয়ে এ কাজ করা সহজসাধ্য হয়ে পড়েছিল।

প্রথম যখন তৈমুরের ঐ কৌশল প্রয়োগ করা হয়, বিপক্ষ দল বিস্ময়ের আতিশয্যেই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। হতবুদ্ধি সৈন্যরা আমাদের পদাতিকের বর্শা পাকা ফলের মতই ধূলায় লুটিয়ে দিয়েছিল।

তৈমুর শরতের শেষের দিকে আতিক তখনো তার স্বপক্ষীয় কিনা জানতে গেল। কিন্তু নিশীথ রাতের অভিসার থেকে বুঝলাম, তার আসল উদ্দেশ্য দিলশাদ বেগমের কুঞ্জেতে যাওয়া। আতিককে স্বপক্ষে আনা উপলক্ষ মাত্র।

বোকা হলেও আতিক তৈমুরের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছিল। তাই তার ব্যবহারে তৈমুরের প্রতি নিস্পৃহতাই শুধু নয়, চাপা অসন্তোষও প্রকাশিত হয়েছিল। কয়েকদিন ধরে আলাপ আলোচনার ভাণ করে, নৈশবিহারে পরিতৃপ্ত হয়ে তৈমুর ফিরে চলল নিজের ডেরায়। ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার পূর্ণ ছবি ততদিনে তার সামনে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে।

খাঁথানান পদাধিকারী হবার পথে তার একমাত্র বাধা হুমজা খাঁর মোকাবিলা করার জন্য সে তৈরী হতে লাগল। কাজটা শেষ হলে আতিকের একটা ব্যবস্থা করা মোটেই তার কষ্টকর হবে না। আর এরপর দিলশাদের কাছে লুকিয়ে চুরিয়ে যাবার প্রয়োজনও হবে না। সহজেই সে ঐ রত্নটি তার অঙ্গনে তুলে আনতে পারবে।

প্রতি বছরের মতই হুমজা খাঁ শীতকালটা আরামে কাটাবার জন্য

কুর্ফায় আশ্রয় নিলেন। দুরূহ গিরিবর্ত্মের অভ্যন্তরে কুর্ফার অবস্থান। সহজে তার কাছাকাছি পৌছানো প্রায় অসম্ভব। সামান্য সৈন্য নিয়ে যে কোনও বিরাট বাহিনীকে দুর্গের অনেক দূরেই প্রতিরোধ করা যেত। উপযুক্ত পাহারার ব্যবস্থা করে হমজা খাঁ তাই নিশ্চিন্তে বছরের বাকি সময়টুকু যে সব সজীব ও নির্জীব রত্ন সংগ্রহ করতেন, তাদের উপভোগে দিন কাটাতেন।

সহজে বা স্বাভাবিক পথে যে কুর্ফা দখল করা যাবে না, এ বোধ তৈমুরের বেশ ভালভাবেই জানা ছিল। অনেক আগে ভাগেই তাই একদল বাছাই করা সৈন্যকে সে মেষপালকের ছদ্মবেশে কুর্ফা গিরিবর্ত্মের দু'পাশের পাহাড়ে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

সদলে হমজা খাঁ যখন কুর্ফায় এসে প্রবেশ করলেন, তখন সেই সামান্য মেষপালকদের চোখে পড়েছিল কিনা জানি না। কিন্তু পড়লেও সাকী আর সিরাজীর মোহে তাদের সেখান থেকে সরিয়ে দেবার কোন ব্যবস্থা অন্তত করেননি।

ফলে তৈমুরের সেনাবাহিনী যখন গিরিবর্ত্মের মুখে এসে দাঁড়াল, তখন পাহাড়ের ওপর থেকে গড়িয়ে দেওয়া পাথর আর বর্শার সাহায্যে প্রতিরোধকারীদের অতি সহজেই তারা সরিয়ে দিল। তৈমুর নির্বিঘ্নে গিরিবর্ত্মে প্রবেশ করে দুর্গ বেষ্টন করে অবরোধ করলে।

অবরুদ্ধ দুর্গে শীতের ক'মাস কাটানোর সব রকম ব্যবস্থা স্বাভাবিক ভাবেই থাকত। কাজেই হমজা খাঁ চিন্তিত হননি। তিনি এটাও জানতেন, কয়েক দিনের মধ্যে দুর্গ জয় করতে না পারলে শীতেই তৈমুরকে শায়েস্তা করে দেবে।

তৈমুরও তা জানত। কাজেই সরাসরি আক্রমণ করে দুর্গ জয়ের

চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কুর্ফাকে অত সহজে দখল করা সম্ভব ছিল না। অবশ্য তার গোপন অস্ত্র দুর্গাভ্যন্তরে কাজ করছিল। কিন্তু হমজা খাঁ এ বিষয়ে অতি সতর্ক ছিলেন। তিনি তৈমুরের কূট-কৌশলের ধাঁচ আগে থাকতেই জানতেন। ফলে দুর্গের প্রতিটি দরজায় পাহারার বিশেষ ব্যবস্থাও চালু রেখেছিলেন।

হমজা খাঁর দলের সঙ্গে হীরাতী সওদাগর আবদুল রসিদ ঐ দুর্গে ঠাঁই পেয়েছিল। তার গোঁফ দাড়িওয়ালা চেহারার মধ্যে তৈমুরের নিত্যসঙ্গী আবদুল্লাকে খুঁজে পাওয়া বেশ কঠিন ছিল। তবু হমজা খাঁর চোখকে আমার ভয় ছিল। কিন্তু হমজা খাঁ তখন যোদ্ধা জীবনের কৃচ্ছ্র সাধনার শোধ নিচ্ছেন। নিত্য নতুন হুরীর আশ্লেষ আর তরল গরল সিরাজীর মোহে তাঁর অতীত ভবিষ্যৎ সবই বিলীন হত স্বপ্নের কুহেলীতে।

হারেমে বার কয়েক মালপত্র বেচতে গিয়ে হমজা খাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার। নেশারক্ত চোখে হমজা খাঁ তাঁর হারেম-বাসিনীদের কার্পেট, কিংখাব, মতির মালা, হীরা-চুনীর আংটি কেনা দেখতেন, আর পরম আরামে হাসতেন। মাঝে মাঝে যখন একটু স্বাভাবিক অবস্থা থাকত, তখন নানাদেশ সম্বন্ধে সওদাগরের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতেন। সব আলোচনাই ঘুরে ফিরে এসে পড়ত বারলা দেশে। তিনি ওখানকার পথ ঘাট, দুর্গ ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করতেন। বুঝতে কষ্ট হত না, আগামী বসন্তে বারলা রাজ্য আক্রমণের পরিকল্পনা প্রস্তুত করছেন তিনি।

পরিকল্পনা রূপায়িত হবার অনেক আগেই তৈমুর এসে দাঁড়াল

কুফ়ার সিংহদ্বারে। ঠিক ঐ সময়ে আক্রমণ তিনি কল্পনাও করে নি। তাছাড়া গিরিবর্ত্মের প্রতিরোধ যে এত সহজে ভেঙে পড়া এ ধারণাও তাঁর ছিল না। তাই প্রথম আঘাতে সম্পূর্ণ হতচকিত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু রক্তে যার যুদ্ধের নেশা, দ্বন্দ্বের আঘাত তার সমস্ত জড়তা খসিয়ে দেয়। তৈমুরের আক্রমণ তাই পুরানো হমজা খাঁকে আবার জাগিয়ে তুলল। দুর্গের প্রতিরোধ ব্যবস্থা সমস্ত দায়িত্ব নিজের ওপর তুলে নিলেন তিনি।

অবশ্য তৈমুরের আক্রমণ দুর্গের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে কিছু বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল। কোন কোন সেনানী তার জন্য তাদের বিক্ষুব্ধ মনোভাব প্রকাশ করেছিল আমার কাছে। হমজা খাঁর সিপাহ শালারকে সেই কথাই শুনিয়েছিলাম, 'এ ত বড় আপশোসের কথা হল। শীতের মত্ততায় কোথায় দুর্গের মধ্যে আরামে বসে মজা মসকরা করবেন, তানয়, ঢাল তলোয়ার নিয়ে ছোট লড়াই করতে।

সিপাহশালার তখন তাঁর নতুন আনা ইরাণী বুলবুলকে পোষ মানাতে একছড়া মুক্তার সাতনরী হার বাছাইয়ে ব্যস্ত। তবু তারি মধ্যে জবাব দিলেন, 'হুঃ, ছোকরার মরণ পালক গজিয়েছে। ও লেঙড়াকে এক থাপ্পড়ে শায়েস্তা করে দেব আমরা।'

বাঁকা হেসে বললাম, 'খুব ভরসা পাচ্ছি না সিপাহশালার। পাসের মুখেতে যে কোন লোককেই রোখার ব্যবস্থা ত পাকা ছিল কিন্তু হতভাগা তৈমুরটা কেমন যেন যাদুমন্ত্রে ঢুকে এল সুড়সুড় করে। দুর্গেও যদি আবার ঐ রকম করে ঢুকে পড়ে?'

গোঁফ চুমরে সিপাহশালার বললেন, 'দুর্গ ত আর রাস্তা নয় যে যে খুশী চলে আসবে। এখানে মাছি গলার ফাঁকও নেই। বিশ্বাস না হয়, একবার ঘুরে দেখে আসবে চল।'

বললাম, 'না, না, আপনার কথাই যথেষ্ট।' ঐ কথা থেকে অন্য কথায় ফিরে গেলাম। কারণ ঘোরবার জন্যে সিপাহশালারের অনুমতির প্রয়োজন ছিল না আমার। দুর্গের সিপাই থেকে হমজা খাঁ পর্যন্ত সবাই আমার পরিচিত। আমার ঘরের সস্তা সিরাজী দু'পাত্তর নিয়ে যায়নি এমন কেউ ছিল না দুর্গে। সকলেই প্রায় ধারে জিনিষ নিত, আর সে দাম আদায়ের জন্য দুর্গের সর্বত্রই আমি ঘুরে বেড়াতাম সম্পূর্ণ নির্বিঘ্নে।

•

বারবার খুঁজেও কিন্তু দুর্গ প্রবেশের কোন অরক্ষিত বা অল্পরক্ষিত পথ খুঁজে পেলাম না। এদিকে শীত বেশ চেপে আসছে। কয়েকদিনের মধ্যে দুর্গ জয় করতে না পারলে তৈমুরের সমূহ বিপদ। তার কাছ থেকে তাই তাগিদের পর তাগিদ আসছে—দরজা খোলার কি হল? শেষ দিকের তাগিদে একটা মরীয়া ভাব লক্ষ্য করেছিলাম।

পথ না পেয়ে যখন প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছি, ঠিক তখনই পথ পাওয়া গেল। দুর্গের জল সরবরাহের একমাত্র ব্যবস্থা হিসেবে পাহাড়ী ঝরণাকে নহরের মধ্য দিয়ে এনে বাঁধা জলাধারে ফেলা হয়েছিল। সেখান থেকে তা বিতরণ করা হ'ত। দুর্গের নিম্নবিত্তরা পাত্র ভরে জল নিয়ে যেত দৈনন্দিন কাজকর্ম করার জন্য।

প্রধান ব্যক্তিদের অবশ্য জলের প্রয়োজনও কম ছিল। আর থাকলেও তাঁদের বিকল্প ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। মাথায় করে জল পৌঁছে দেওয়া হত তাঁদের ঘরে। যারা অর্থব্যয়ে অক্ষম, কিন্তু লোকবল ছিল, তারাও লোক দিয়ে জল নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করত।

কেবল হাতের গর্ব ছিল না, সামর্থ্যও ছিল না, তারাই এসে জড় হ'ত জল নিতে। কে আগে নেবে তাই নিয়ে হাতাহাতি শুরু হত। দু'চার জন অল্পবিস্তর আহতও হত না যে এমন নয়। যুবতী মেয়েদের অবশ্য কিছুটা সুবিধা ছিল। বাঁটোয়ারাকারীদের সঙ্গে উপযুক্ত বিনিময় ব্যবস্থায় এই ঝামেলা সইতে হত না তাদের। তবে তাদের ছেলে মেয়েরা কিছুক্ষণের জন্যে বেওয়ারিশ হয়ে যেত। তারা ঐ জলাধারের বাঁধা সিঁড়িগুলোর ওপর উঠে ছুটোছুটি করত। সেদিনও তারা এমনি খেলা করছিল।

এমন সময় হঠাৎ একটি ছেলে পা পিছলে জলের মধ্যে পড়ে গেল। উপস্থিত মেয়েরা সবাই হাঁউমাঁউ করে চেঁচিয়ে উঠল। পথচারীরা হতভম্ব হয়ে কি করবে ভাবছে, আমি তাড়াতাড়ি জামা কাপড় ছেড়ে জলের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে হাবুডুবু খাওয়া ছেলেটিকে তুলে ফেললাম।

সবাই হৈ হৈ করে উঠল। আমি সে সব সাধুবাদে কান না দিয়ে তাড়াতাড়ি কাপড়-চোপড় পরে চলে যেতে যাচ্ছি, এমন সময় এক নতুন বিপত্তি। এতক্ষণ ছেলেটির মা বিনিময় কার্যে ব্যস্ত ছিল বোধহয়। ছেলের জলে ডোবার খবর পেয়ে চীৎকার করতে করতে ছুটে এল। ছেলেকে জীবন্ত দেখে ক্ষণিকের জন্য আনন্দের আতিশয্যে সে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কি জন্য জানি না আবার চীৎকার করে কেঁদে উঠল।

অবিলম্বে কান্নার কারণ জানা গেল। বার বার বাচ্চা হয়ে মারা যাবার জন্য সে একেবারে হতাশ হয়ে পড়েছিল। তারপর এক জিন্দা পীরের কবচ পরিয়ে এটিকে বাঁচাতে পেরেছে। আজ যে নিশ্চিত

মৃত্যুর হাত থেকে সে বেঁচেছে, সেও ত ঐ কবচের দয়ায়। অথচ সেই কবচখানার ছেলের দেহচ্যুত হয়ে সলিল সমাধি ঘটেছে।

মেয়েটি হঠাৎ ছুটে এসে আমার পায়ে মাথা কুটতে লাগল। তার বক্তব্য অতি সহজ। আমার মত মহাপুরুষ ছেলেটিকে যখন উদ্ধার করেছে, তার কবচটিও নিশ্চয়ই উদ্ধার করতে পারবে।

ছেলেটিকে তোলার সময়েই একটা সম্ভাবনা চকিতের মত উদয় হয়েছিল। সেটার সত্যতা মেলাবার সুযোগ ছাড়লাম না আমি। তৎক্ষণাৎ আবার জলে নামলাম। ডুব দেবার সময়েই শুনলাম, উপস্থিত জনগণ 'হায় হায়' করে উঠল। কবচ খোঁজার জন্য ডুব দেবার ইচ্ছা মোটেই ছিল না আমার। তবে সামনেই যখন সেটা চোখে পড়ল, তখন তুলে না নিই বা কেন?

কিন্তু তুলতে গিয়েই গহ্বরের পথটা চোখে পড়ল। কোমরবন্ধে কবচটা গুঁজে রেখে গহ্বরের পথে ঢুকে পড়লাম।

পথটা অপরিসর, ঢালুভাবে চলেছে। জল অবশ্য বুকের ওপর কোথাও ওঠেনি। তবে চলবার সময় মাথা একটু নিচু করে চলতে হয়েছিল। নয়ত ওপরের দেয়ালে মাথা ঠুকে যাবার ভয়ও আছে। একটু এগোতেই অন্য প্রান্তের খোলা মুখটা নজরে পড়ল।

কিন্তু আর দেরী করা উচিত নয়। আমাকে খুঁজতে কেউ যদি জলে নামে ত সমূহ বিপদ। ফিরে এসে তাড়াতাড়ি ভেসে উঠলাম। সমবেত জনতা তখন রীতিমত চঞ্চল। উপরন্তু দু'চারজন ঢোলী লোকও জমায়েত হয়েছে। আমাকে ভেসে উঠতে দেখে সবাই জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল। ঢোলী লোকেরাই টেনে তুলল আমায়। তুলতে তুলতে একজন রসিকতা করলে, 'সওদাগর

তোমার জান বড় কড়া। আমরা তো ভেবেছিলাম তুমি এতক্ষণে খোঁড়া হয়ে গেছ।'

হাঁফাতে হাঁফাতে জবাব দিলাম, 'ধারের মাত্রাটা কি বড় বেশী হয়ে গেছে নাকি ?'

আমার কথায় সবাই হেসে উঠল। মালিকানকে তার হারানো কবচ ফেরত দিয়ে ঘরের পথ ধরলাম। সৈনিকরা আমার সঙ্গী হ'ল। ঘরে পৌঁছেই আমার পক্ষে প্রয়োজন বলে সিরাজী বার করে পাত্রের পর পাত্র সাবাড় করল তারা। আমাকে ছিটে ফোঁটা ভাগ দিতে কৃপণতা করেনি তারা। তবে নিজেরা একেবারে বেসামাল না হওয়া পর্যন্ত মুফতের সিরাজী চালিয়ে গেল।

আমি এক ফাঁকে মাতাল কটাকে এড়িয়ে ছাদে গিয়ে বার্তাবহ পারাবত মারফৎ তৈমুরকে খবর পাঠালাম, 'দুর্গ প্রবেশের পথ পাওয়া গেছে। রাত্রে ঝরণার ধারে কিছু সৈন্য সমাবেশ করবে। আর অবশিষ্ট বাহিনীকে মূল দুর্গদ্বারে সমবেত কর। কবে সত্বর হবে জানালে সেইরকম ব্যবস্থা করব।'

সে রাত্রে সেই কৃতজ্ঞ জননী তার একমাত্র সম্পদ যৌবন পুষ্প নিবেদন করে কৃতজ্ঞতার ঋণ আংশিক পরিশোধ করে গেল। দীর্ঘ দিনের উপবাসের পর ভালই লাগল তাকে। তাই বিদায় কালে প্রীতি উপহার দিলাম একছড়া ঝুটো মুক্তার মালার।

মালার বিনিময়ে পরের দিন রাতেও আবার এল সে। তার কাছ থেকেই দুর্গবাসী নীচের তলার মানুষদের দুঃখ-দুর্দশার কথা জানতে পারলাম।

জানতে পারলাম যে, অবরোধ ক্রমশঃই তাদের জীবনে বিপর্যয়

...কে আসছে। অধিকাংশের ঘরেই খাবার জিনিসের অভাব। সে অভাব পূরণের রেস্তও নেই তাদের। তার নিজের স্বামীও ...দের যুদ্ধের লড়াইয়ে খতম হয়েছে। তারপর পাঁচজনের দয়া-দাক্ষিণ্যে কোন রকমে চলছিল। তার কথা থেকে বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে, সে দয়া-দাক্ষিণ্য পুরোপুরি বিনিময়ের। তার যৌবনের বিনিময়ে সে জীবনধারণের রসদ সংগ্রহ করেছে। যৌবন না থাকলে কি অবস্থা যে হ'ত তার, তা আল্লাই জানেন। এবার সে স্রোতও গুটিয়ে আসছে। জীবনের চাকা প্রায় অচল। তার শেষ কথা হ'ল, এই দুর্ভোগের চেয়ে তৈমুরের সৈন্যদের হাতে মৃত্যুও ভাল।

অজানতে সে প্রায় ভবিষ্যৎবাণী করে বসল। তাদের বাঁচাবার আশায় বললাম, 'আমার ঘরে এসে থাক।'

হাতে যেন স্বর্গ পেল সে। বিনা বাক্যব্যয়ে আমার অনুরোধ মেনে নিল। আমিও কিছুটা নিশ্চিন্ত হলাম।

দিন তিনেক পরে অমাবস্যা। সেই রাতেই তৈমুরের আক্রমণের দিন স্থির করা হ'ল। অন্যান্য দিনের মত যথারীতি পথে বেরিয়ে পড়লাম। পথচারী সৈনিকরা জানত যে, ঐ সময় আমি তাগাদা দিতে বেরোই। এতদিনে তারা সবাই আমার অল্প বিস্তর খাতক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই আমায় পথে দেখলেই তারা লুকিয়ে পড়বার চেষ্টা করত।

আমি কখনো তাগাদা দিতাম, কখনো আবার ওদের দেখতে পাইনি এমন ভাব করতাম।

সেদিন কাউকেই দেখতে পাইনি, এমনি ভাব দেখিয়ে এদিক-

ওদিক কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে, ক্লান্ত অবসন্ন দেহে অন্যান্য দিনের মত জলাধারের ওপর উঠে বসলাম।

এমনি ভাবে অন্যদিনও বসেছি। কাজেই পথ চলতি সৈনিকের চোখে পড়লেও ভয়ের ছিল না কিছু। বরং পাছে আমার সঙ্গে চোখাচোখি হয়, এই ভয়ে তারাই চুপিসাড়ে এদিক ওদিক দিয়ে সরে পড়তে চাইবে। হয়ত এদিক দিয়ে যাওয়া আসাই বন্ধ করবে।

হ'লও তাই। প্রথম প্রথম দু' চারজন আমার সামনে দিয়ে যাওয়া-আসা করার পরই হঠাৎ যেন মন্ত্রবলে জলাধারের আশ-পাশের রাস্তাগুলো জনশূন্য হয়ে পড়ল। এই সুযোগই চাইছিলাম। তাড়াতাড়ি পাশাপাশি কয়েকটি থামের গায়ে আঙরাখার ফাঁক থেকে কতকগুলো দড়ির তাল বার করে বেঁধে ফেললাম। তারপর দড়িগুলোর অন্য মুখগুলো হাতে ধরে জলে নেমে পড়লাম। জামা কাপড় ভেদ করে সেই ঠাণ্ডা জলের স্পর্শে সমস্ত শরীর কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেল।

অপেক্ষা করার অবকাশ নেই। তাই নহরের মুখটা বার করতে ডুব দিতে হ'ল। অন্ধকারে প্রথম ডুবেই পথ খুঁজে পেলাম না। সেইজন্য পর পর গোটা কতক ডুব দিতে হ'ল। প্রত্যেকবার ডুব দিই, আর একটা ঠাণ্ডা ছুরি যেন আমার পাঁজর ভেদ করে যায়। অথচ বিশ্রামের অবকাশ নেই। সময় বয়ে যাচ্ছে, তৈমুর হয়ত অধৈর্য হয়ে পড়ছে। বহু যত্নে নহরের পথ আবিষ্কৃত হ'ল। হড়হড়ে শ্যাওলার ওপর দিয়ে মাথা নীচু করে টলতে টলতে এগিয়ে চললাম।

প্রায় এক যুগ পরে যেন নিশ্ছিদ্র অন্ধকার কিছুটা ফিকে হয়ে এল। মনে হ'ল অন্তবিহীন পথ পেরিয়ে ঝরণার মুখের কাছাকাছি এসে পড়েছি। অতি ধীরে ধীরে যখন খোলা আকাশের নীচে এসে দাঁড়ালাম, শরীরে তখন একটুও সামর্থ্য নেই। পাথরের গায়ে ঠেস দিয়ে অবসন্নের মত বসে রইলাম তৈমুরের সৈন্যবাহিনীর প্রতীক্ষায়।

বেশীক্ষণ অবশ্য অপেক্ষা করতে হ'ল না। দেখলাম, অন্ধকারে একটা ছায়া ঝরণার কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে। সে ছায়া অতি পরিচিত। চাপা গলায় সে ডাকল, 'ভাই আবদুল্লা।'

আলো আঁধারিতে তৈমুরকে চিনতে ভুল হ'ল না। বিপজ্জনক দায়িত্ব তৈমুর যে নিজের ঘাড়েই নেবে, তাত জানতামই। তবু বুকটা কেমন দুরদুর করে উঠল। মনে হ'ল সে না এলেই বোধহয় ভাল হ'ত। আর একবার বিচার করে দেখলাম, সব কিছু ঠিকমত করা হয়েছে ত? কোথাও কিছু ত্রুটি থাকলে তৈমুরের জীবন যে বিপন্ন হবে।

চিন্তাকে ভাষায় রূপ দেবার আগেই, আমার গলার শব্দ অনুসরণ করে তৈমুর আমাকে তার বলিষ্ঠ বাহু বন্ধনে বেঁধে ফেললে। কুশল সম্ভাষণের পর পথ দেখিয়ে নিয়ে চললাম। দড়ির সাহায্যে নিরাপদে দেওয়াল ডিঙিয়ে পথে নেমে এলাম আমরা। কয়েক জনকে আমার কাছে রেখে তৈমুর সদলে চলল হুমজা খাঁর প্রাসাদ আক্রমণ করতে। আমার সঙ্গীদের নিয়ে আমি চললাম দুর্গের সিংহদ্বার খুলতে।

পথে চলতে চলতে সঙ্গীদের করণীয় কর্তব্য বুঝিয়ে দিলাম।

সিংহদ্বারের কাছাকাছি পৌঁছেই তারা এদিক ওদিক ছোটাছুটি সুরু করলে। রক্ষীরা আমাকে আমার খাতকদের পেছনে ছোটাছুটি করা দেখতে এতই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল যে, কোন ফাঁকে বন্ধ দরজা খুলে গিয়েছিল তা বুঝতেও পারেনি। বুঝতে যখন পারল, তখন তৈমুরের দুর্ধর্ষবাহিনী সমস্ত প্রতিরোধকে নিতান্তই অবান্তর করে দিয়েছে।

সিংহদ্বার খুলে দিয়ে হুমজা খাঁর প্রাসাদের দিকে চললাম। সেখানে পৌঁছবার আগেই দুর্ভেদ্য কুর্ফা দুর্গের পতন হয়েছে। দিকে দিকে নাগরিকদের আর্তনাদ, আর তৈমুরের বাহিনীর বর্বর জয়োল্লাসে আকাশ-বাতাস মুখর হয়ে উঠল। সে জয়োল্লাস হুমজা খাঁকে জানিয়ে দিল যে, তাঁর প্রতিরোধ ব্যবস্থা কত ভঙ্গুর।

তবু আহত সিংহের মত দুর্জয় বিক্রমে রুখে উঠেছিলেন তিনি। সে তেজ তৈমুরের পক্ষেও সহ্য করা কঠিন হয়ে উঠেছিল। ঠিক এমনি সময় সেখানে আমার উপস্থিতি দেখে ক্ষনিকের জন্য হুমজা খাঁ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তরবারী তার শ্লথ হয়ে গেল। আর সেই মুহূর্তের সুযোগে তৈমুর তাঁর পাঁজরের মধ্যে তলোয়ারটা ঢুকিয়ে দিল। বীর হুমজা খাঁর বীরোচিত গতিলাভ হল।

যুদ্ধ শেষে বাকী রাতটা নিশ্চিন্ত আরামে কাটাতে আর যুদ্ধ জয়টা পূর্ণ মাত্রায় উপভোগ করতে তৈমুর হুমজা খাঁর অতুলনীয়, অনিন্দ্যনীয় হারেমে প্রবেশ করল। এতক্ষণে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া সম্বন্ধে সচেতনতা ফিরে এল আমার। মনে হ'ল, জয়োন্মত্ত সেনাবাহিনী তাদের ক্ষুধা মেটাতে তৎপর হয়ে উঠেছে। আবদুল রসিদ সদাগরের ঘর ত তাদের সবচেয়ে আগে আকৃষ্ট করবে। ঘরের

মালপত্র লুট হ'ক, তাতে দুঃখ নেই। কিন্তু যে দু'টি জান সেখানে আছে, তাদের কি হবে?

তাড়াতাড়ি ছুটে বেরিয়ে পড়লাম। পথের ধারে ধারে তখনও চলেছে প্রচণ্ড তাণ্ডব। পশুগুলো নারীদেহগুলোকে দলবদ্ধ বলাৎকারে দলে মথে শেষ করেছে। হতভাগিনীদের করুণ আর্তনাদ সে সব দানবদের বধির কানে ঢুকছিল বলে মনে হল না। আমার মনেও সে দৃশ্য কোন রেখাপাত করল না।

নিজের ডেরায় পৌঁছে দেখলাম, সেখানেও পৈশাচিক জয়োল্লাসের ঝড় বয়ে গেছে। আবদুল রসিদ সওদাগরের সমস্ত পণ্যবস্তু লুব্ধ সৈনিকেরা লুট করে নিয়েছে। ঘরের আশেপাশে তারই সামান্যতম ভগ্নাবশেষ ছড়িয়ে পড়ে আছে। ঘরের ভেতর এক কোণে তার ক্ষণ-সঙ্গিনীর ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত, বিধ্বস্ত দেহটা পড়ে আছে। বহু জনের দীর্ঘ দিনের অতৃপ্ত লালসার আগুনকে শান্ত করতে গিয়ে এ দশা হয়েছে তার।

ঘরের অন্য প্রান্তে ক'দিন আগে নিশ্চিত সলিল সমাধি থেকে জিন্দাপীরের কবচের দোয়ায় রক্ষা পাওয়া শিশুর ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন দেহটা পড়ে রয়েছে। কবচটা তখনও তার দেহলগ্ন। দৈব দুর্ঘটনার হাত থেকে সেটা তাকে বাঁচাতে পারলেও, মানুষের পৈশাচিকতার হাত থেকে বাঁচাতে পারেনি।

দীর্ঘদিন থেকে যে বিবেক ঘুমিয়েছিল, হঠাৎ যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠল আবার। মনে হল ঘরের চেরাগের আগুন দিয়ে মানুষের অমানুষিকতার সমস্ত চিহ্ন মুছে দিই। ছুটে গিয়ে সেটা তুলেও

নিয়েছিলাম। কিন্তু একটা কথা মনে পরে হাতটা থেমে গেল। এই সব ঘৃণ্য অপরাধীর শাস্তি দিতে গেলে তার সঙ্গে অনেক বেশী ধর্ষিত, লাঞ্ছিত মানুষকে অকারণ শাস্তি পেতে হবে। জোর করে মনের মধ্যেকার ক্রুদ্ধ উচ্ছ্বাসের কুলপ্লাবী তরঙ্গের কণ্ঠরোধ করলাম।

তবে অন্য ভাবে অপরাধীর শাস্তির ব্যবস্থা করলাম। পরের দিন সকালে তৈমুরের কাছে গিয়ে জানালাম, আবদুল রসিদ সওদাগরের ঘরের সমস্ত জিনিষ লুট হয়ে গেছে। তৈমুর ও গুলো আমাকে দিয়েছিল বলেই আমি আপত্তি জানাচ্ছি, এই ভেবে সে হেসে বললে, 'তোর যা গেছে তার অনেক অনেক গুণ বেশী তুই হুমজা খাঁর ধনাগার থেকে নিয়ে যা।'

বললাম, 'আমার কোন কিছুর ত অভাব নেই। কাজেই ঐ সামান্য জিনিষ যাওয়ায় আমি দুঃখিত নই। কিন্তু আমার ধারণা আবদুল রসিদ সওদাগরের ঘরে ঢুকতে বারণ করে দেওয়া হয়েছিল সৈন্যদের। তোমার আদেশ যদি তোমারই সৈন্যবাহিনীর লোকেরা এখন থেকে না মানে, ত খাঁখানান হয়ে কেমন করে রাজ্য শাসন করবে। তখন কেউ ত তোমায় মানবে না।'

কথাটা তৈমুরের মনে ধরল। এবং তখনই আমার ওপর ভার পড়ল সেইসব নিয়মভঙ্গকারীকে খুঁজে বার করে শাস্তি দেওয়ার।

খুঁজে খুঁজে সব ক'টিকে বার করলাম এবং অতি নৃশংসভাবে তাদের কৃতকর্মের শাস্তিও দিলাম। বাহিনীর সবাই জানল, নিয়ম ভঙ্গকারীর সাজা হল। একমাত্র আমি জানলাম, দু'টি অতি সাধারন প্রাণ, তাতারীতে যে প্রাণের কোনই দাম দেওয়া হয় না সেই প্রাণের বিনিময়ে অতগুলি শিক্ষিত সৈনিকের প্রাণ গেল।

কিন্তু তবু শান্তি পেলাম না। রক্তের নেশায় আরো মেতে মাতাল হয়ে উঠলাম। সৈন্যবাহিনীর যে কোন আইন অমান্য কারীর, যে কোন শৃঙ্খলাভঙ্গকারীর শাস্তি স্বেচ্ছায় হাতে তুলে নিয়ে আরো কঠোর, আরো নির্মম শাস্তির ব্যবস্থা করতে লাগলাম। সমবেত সৈন্যবাহিনীর সামনে অপরাধীর নগ্নদেহে যখন কাঁটা দেওয়া চাবুকটা সপাং সপাং করে দাগ কেটে বসে যেত, ফিনিক দিয়ে রক্ত ছুটত, অপরাধীর কাতর আর্তনাদে সমস্ত সৈন্যবাহিনীর অতি কঠোর প্রাণও গলে যেত, তখন আমি আবদুল্লা এক অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভব করতাম। মাঝে মাঝে যখন মনের মধ্যে সামান্য দুর্বলতা আসত, কল্পনা করতাম সেই দুটি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন দেহের কথা। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দুর্বলতা অপসৃত হত। নৃশংস জল্লাদ আবদুল্লা সকার্য সাধনে অগ্রসর হ'ত।

কুর্ফায় শীতকালে আবদ্ধ থেকেও বোধহয় তৈমুরের বাহিনীতে ছোটখাট স্বেচ্ছাকৃত অপরাধের সংখ্যা ক্রমশঃ কমতে কমতে একবারে শূন্যের পর্যায়ে গিয়ে পৌছল। তৈমুর নিজে কুর্ফায় সম্পূর্ণ আরামে নিশ্চিন্ত মনে সময় কাটালেও কালাম সৈন্যবাহিনীকে সুশিক্ষিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিল। আর তাই শীতের শেষে বসন্তের যুদ্ধযাত্রার সময় তৈমুরের বাহিনী অপরাজেয় দুর্ধর্ষ হয়ে উঠেছিল। সে বাহিনী খাঁখানান পদাভিলাষীদের ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিল। নাম মাত্র যুদ্ধ করে আতিক পরাজয় ও মৃত্যু বরণ করল। দিলশাদ বেগম তৈমুরের ঘরনী হল। নিরঙ্কুস হল খাঁখানান।

আর সঙ্গে সঙ্গে তৈমুরের জয়যাত্রার হ'ল সূত্রপাত। ধাপে ধাপে সে জয়রথ সূর্যাভিলাষী হয়ে দাঁড়াল।

পরবর্তী পর্যায়।

তৈমুর হীরাতে নিজের বশম্বদ হোসেনকে সুলতান করে দিল। দীর্ঘদিন পর আমিনা আবার ফিরে এল স্বামীর ঘরে। তৈমুর কিন্তু আর তার প্রেমময়ী স্ত্রীকে ফিরে পেল না। যে এল সে স্নেহময়ী জননী।

মাঝে মাঝে তৈমুর দুঃখ করে বলত, 'ওর রূপের জৌলুসও আর নেই, স্ত্রীর কোন কর্তব্য করবার ইচ্ছাও নেই। অথচ নিজের স্ত্রীকে অস্বীকার করি কি করে? দুঃখের দিনে তাকে ত্যাগ করার একটা সুযোগও এসেছিল। সেদিন কিন্তু পারিনি আত্মগৌরবের কথা ভেবে। আজ খাঁখানান হয়ে স্ত্রীকে ত্যাগ করলে লোকে কি বলবে।

অথচ কি ভয়ঙ্কর জ্বালাতন করে, কল্পনা করতে পারবি না। মুখে আর কোন কথা নেই। কেবল রাফাতকে এটা দাও, ওটা দাও। আকাশের চাঁদ এনে দিলেও বোধ হয় ওকে ওর ছেলের উপযুক্ত জিনিষ দেওয়া হ'ল না। ওর মনের ভাব দেখে তাই মনে হয়।

আচ্ছা বল দেখি আবদুল্লা, আমার সোনার চাঁদ ছেলে জাহাঙ্গীর থাকতে ঐ জরদ্গবটাকে আমি কি করে বড় করি?'

জাহাঙ্গীরই যে বাপের নয়নের মণি, এ খবর আমিনা না বুঝুক, দিলশাদ বুঝেছিল। তাই নিজের পেটের ছেলে শাহরুখ আর জাহাঙ্গীরের মধ্যে কোনরকম পার্থক্যই করত না সে। এমনকি অপরিচিতদের কাছে জাহাঙ্গীরকে তার নিজের পেটের ছেলে বলেই মনে হত। অবশ্য এ ব্যবহারের সুফলও হাতে হাতে পেয়েছিল সে। বেগম হিসেবে জ্যেষ্ঠা হলেও আমিনা প্রধানা বেগম হতে পারেনি। সে সম্মান জুটেছিল শুধু দিলশাদেরই ভাগ্যে।

খাঁখানান হয়ে নিশ্চিন্তে বসে থাকেনি তৈমুর। নিজের শক্তির প্রসার করতে দিকে দিকে বারবার দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছে। কখনও ইরাণ, কখনও তুরাণ, কখনও আবার সিরিয়া। আজ যদি আগুন জ্বলে সিরাজে, কাল বসরায়, পরশু দামাস্কাসে। গাঁথা হয় হাজার হাজার নরমুণ্ডের বেদী। তার ওপর বাতাসে মাথা তুলে সগর্বে ওড়ে তৈমুরের বিজয় বৈজয়ন্তী। আর সে বেদী গেঁথে চলে জহ্লাদ আবদুল্লা।

প্রতিটি নগর অবরোধ করার সঙ্গে সঙ্গে তৈমুরের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়—আত্মসমর্পণ করলে সামান্য কিছু ক্ষতিপূরণ নিয়ে শান্ত হবে সে।

প্রথম দিকে দু' একটি নগর এই ঘোষণায় বিশ্বাস করে আত্মসমর্পণ করেছিল। কিন্তু তৈমুরের সৈন্যবাহিনী নগরে ঢুকে যথেচ্ছ লুটপাট, বলাৎকার, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি করতে সুরু করে দেয়।

জয়োন্মত্ত সৈন্যবাহিনীকে সংযত রাখবার ক্ষমতা সেনানায়কদের ছিল না। একমাত্র আবদুল্লা সে কাজ করতে পারত। কিন্তু কুর্ফার স্বর্গ দু'টি দেহের রক্তধারা তার মনে যে অতৃপ্ত রক্ততৃষা জাগিয়ে দিয়েছিল, রক্তের স্রোত না বওয়ালে তার কোন রকম প্রশমনই হ'ত না। তাই সৈনিকদের বর্বরতাকে সংযত না করে উসকেই দিত সে।

আবদুল্লার এই অতি নৃশংসতা তৈমুর হয়ত কোনদিন পুরোপুরি সমর্থন করত না, কিন্তু আপত্তি করতেও দেখিনি তাকে। কতবার সারানিশি প্রমোদ-ক্লান্ত তৈমুরের বাহুবন্ধনের মধ্যে থেকে তার শয্যা-সঙ্গিনীকে ছিনিয়ে নিয়ে জ্বলন্ত আগুনে ফেলে দিয়েছে এই আবদুল্লা। কিন্তু কই, একটি কথাও ত বলেনি সে।

শুধু মাঝে মাঝে বলত তৈমুর, 'আবছল্লা, একটু থাম। একটু বিশ্রাম নে। জীবনে ভোগ করবার অনেক কিছু আছে, সেদিকে একটু নজর দে। একবারের বেশী হুবার ত এ জীবন পাবি না। যতক্ষণ পারিস মজা লুটে নে না। তুই যা চাস, আমার ভাণ্ডার থেকে নিয়ে যা। বন্দিনীদের মধ্যে যাকে তোর পছন্দ, বেছে নে। সিরাজী ঢাল, খা আর ফুর্তি কর।'

তার কথা শোনার মত মনের অবস্থা তখন ছিল না আমার। নিজেকে বিপন্ন করে যে হুটি প্রাণ আমি রক্ষা করেছিলাম, পরম বিশ্বাসে যে আমার কাছে আশ্রয় নিয়েছিল, তাদের বর্বর, বীভৎস, অর্থহীন মৃত্যুর দৃশ্য আমি কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না।

রাজধানী সমরখন্দে ফিরে এসে সবাই বিশ্রামে, আমোদ প্রমোদে মত্ত থাকত। আর আমি দিশাহারা নিঃসঙ্গ ভাবে ঘুরে বেড়াতাম নগরের অন্ধকার প্রান্তে। পুরাণো অভ্যাস মত যা চোর-ছ্যাচড়ের আড্ডায়।

তাদের মধ্যে পুরাণো প্রতিপত্তি তখনও বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি। সর্দার লেঙড়া কুত্তার প্রধান সহকারী বুড়ো শকুনকে সবাই খাতির করত। তাকে দেখলে অনেকেই হাতের পান পাত্র এগিয়ে দিত। সন্ধ্যা থেকে সকাল, এক আড্ডা থেকে আর এক আড্ডা ঘুরে বেড়াতাম আমি।

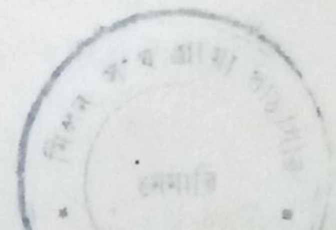
ফলে অনেক গোপন তথ্য, অনেক মহামূল্য খবর পেতাম। তৈমুরের রাজসভায় নিয়মিত না থাকাটা তাই আমার পক্ষে অপরাধ বলে গণ্য করা হ'ত না। একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবার সময়েই তৈমুর আমাকে বিশেষ করে ডেকে পাঠাত।

অন্য সভাসদরা আমাকে ভয় করত, কারণ তাদের সবরকম গোপন সংবাদ কি এক অদ্ভুত উপায়ে আমার কাছে এসে পৌছত। তাদের কাছে ঘটনাটা বিস্ময়কর মনে হলেও আসলে সেটা ছিল অতি সহজ পন্থা। নিজেদের দুর্বলতার সঙ্গী সব মানুষেরই থাকে। একক ভাবে বোধ হয় কোন কাজই করা যায় না। অবশ্য সেটাও ঠিক কথা নয়। দার্শনিকরা ত একক ভাবেই নানা জটিল সূক্ষ্ম সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান আবিষ্কারে সক্ষম। পৃথিবীতে অবশ্য এরাই একমাত্র ব্যতিক্রম।

লৌকিক সমস্যা সমাধানে দ্বিতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি একান্ত ভাবেই প্রয়োজনীয়। কোন কথা এক কান থেকে হু'কান হবার সময়, তৃতীয় কানে পৌছানো মোটেই অসম্ভব নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তৃতীয় কর্ণের অধিকারী বা কারিণীর কাছ থেকে তা আমার কাছে পৌছত।

ফলে অনেক সময় সভাস্থলেই তাদের বিব্রত করতাম সেই সব গোপন তথ্যের আভাস জানিয়ে। উপরন্তু তৈমুরের বিরুদ্ধে কেউ যদি কোন ষড়যন্ত্র করবার চেষ্টা করত, আমার প্রচেষ্টায় সে ভীষণ শাস্তি পেত। রাজসভায় আমার উপস্থিতি তাই তাদের সন্ত্রাসের কারণ হয়ে দাঁড়াত।

যেদিন আমি উপস্থিত থাকতাম না, সেদিন তারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলত। ব্যাপারটা আমি জানতাম বলেই মাঝে মাঝে তাদের ভয় দেখাতে রাজসভায় গিয়ে হাজির হতাম। এবং এক বা একাধিক ওমরাহের দিকে বার বার তাকিয়ে দেখতাম। উৎকণ্ঠায় যখন তাদের কণ্ঠতালু পর্যন্ত শুকিয়ে আসত, তখনই অন্য কারো দিকে নজর দিতাম।



নিজেদের মধ্যে অত্যন্ত সন্তর্পণে ওরা বলত, 'আবদুল্লা বাওরা।'

হয়ত সত্যি সত্যিই বাওরা হয়ে যেতাম, যদি না স্বাভাবিকত্বের পর্যায়ে আমায় নামিয়ে নিয়ে আসত জাহাঙ্গীর। ফাঁক পেলেই সে আমার কাছে এসে হাজির হ'ত। তাকে দেখলেই এক সঙ্গে তরুণ তৈমুর আর তরুণী আইজলের কথা মনে পড়ত আমার।

মনে পড়ত, অতীতের কত সুখস্মৃতি, কতদিনের হাসিকান্না, একটা পরিপূর্ণ প্রেমময় জীবন। সেই সব গল্প তার সঙ্গে করতে করতে কিছুক্ষণের জন্য স্বাভাবিক মানুষ হয়ে পড়তাম আমি।

জাহাঙ্গীর আমার কাছে ঘোড়ায় চড়া শিখতে আসত। আর সেই সঙ্গে জানতে চাইত তার বাপের কৈশোরের বিচিত্র কাহিনী। তার দিকে তাকিয়ে আমার মনে হ'ত, স্বর্গবাসী কোন ফেরিস্তা বুঝি সশরীরে মর্ত্যধামে নেমে এসেছে। এ মানুষ চিরদিন এ অবস্থায় থাকতে পারে না। এই চিন্তাই আমাকে দুঃখিত করে তুলত। তবে এ কথাও মনে হ'ত, জাহাঙ্গীর বড় হয়ে বাপের খ্যাতিকেও অনেক পেছনে ফেলে এগিয়ে যাবে। সেই প্রত্যাশাকে সফল করার জন্য আমার অভিজ্ঞতার থলি উজাড় করে তাকে শিক্ষিত করে তুলতাম।

দিন দিন শশীকলার মত জাহাঙ্গীরের ক্ষমতার পূর্ণতর বিকাশ যতই ঘটছিল, আমার প্রত্যাশা তত দৃঢ় বিশ্বাসে রূপান্তরিত হচ্ছিল। কিন্তু অঙ্কুরেই সেই মহীরুহ শুকিয়ে গেল। ভবিতব্যকে কে রোধ করবে।

যৌবনে পদার্পণ করতে না করতেই তৈমুর ছেলের বিয়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। খাঁখানানের ছেলে তথা ভবিষ্যত উত্তরাধি-

কারীর বিয়েত যার তার সঙ্গে হতে পারে না। উপযুক্ত কুলশীল বিচার করা অবশ্যই প্রয়োজনীয় ছিল। সে সব বিচার শেষ করে তৈমুর উত্তরাঞ্চলের সেরা সুন্দরী খাঁজাদী সোফিয়াকে পছন্দ করলে। অবশ্য এই খাঁজাদীর পিতৃসম্পত্তি লাভের আশা যে তার রূপ যৌবনের সঙ্গে তৈমুরের মনে সমান ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল, এ খবর আর কেউ না জানুক, আমি জানতাম।

তার পিতৃপুরুষরা কিন্তু অত সহজে ভুঁইফোঁড় তৈমুরের দাবীকে মানতে রাজী হয়নি। তারা উপহাস করে বলেছিল, 'তৈমুরের এমন কি পরিচয় আছে যে, খাঁজাদীকে পুত্রবধূ করতে পারে?'

তৈমুরের পরিচয় যে তার তলোয়ার, তৈমুরের দূত আবদুল্লা সে খবরটা তখনই জানিয়ে এসেছিল তাদের।

খাঁজাদীর পিতৃগৃহে অবস্থান কালে মেয়েটিকে প্রথম দেখেই চমকে উঠেছিলাম আমি। রূপের জলুসে যে কোন পুরুষের চিত্তবিভ্রম ঘটাবার ক্ষমতা ছিল এই খাঁজাদীর। কিন্তু সে রূপের পেছনে যে প্রচণ্ড হিংস্রতার উদ্যত নখর দেখেছিলাম, তাতে মনে মনে ভয়ও পেয়েছিলাম আমি।

জাহাঙ্গীরের মত স্বপ্নালু ছেলের পক্ষে সেই হিংস্র বাঘিনীকে বশ করা মোটেই সম্ভব নয় বলে মনে হয়েছিল। আমার আশঙ্কার কথা তৈমুরকে বলেও ছিলাম। সে কিন্তু ব্যাপারটা হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিল! এমন কি খাঁজাদী যে জাহাঙ্গীরের উপযুক্ত পাত্রী নয়, এ কথাও কানে তোলেনি সে।

একদিন এই প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করেই আমাদের রসিকতার সূত্রপাত হল।

তৈমুর বলেছিল, 'খাঁজাদী হ'ল দৌলত। জাহাঙ্গীরের জন্য ওই দৌলত কেড়ে আনতেই হবে।'

'এ দৌলত শৌর্য, অর্থাৎ তৈমুরেরই প্রাপ্য। জাহাঙ্গীরকে সে মালা দেবে কেন? সে কি অন্ধ?'

অট্টহাসি হেসে উত্তর দিয়েছিল সে, 'তৈমুর যখন লেংড়া, দৌলতের তখন অন্ধ হতে দোষ কি?'

খাঁজাদীকে জয় করবার জন্য যুদ্ধ যাত্রা করতে হ'ল তৈমুরকে। খাঁ সাহেব নিজ দুর্গে নিশ্চিন্তে অপেক্ষা করতে লাগলেন। উত্তরের প্রচণ্ড শীত আমাদের বিপর্যস্ত করে দেবে, এটা তিনি ধরেই নিয়েছিলেন। আর ততদিন নিশ্চিন্ত আরামে দুর্গমধ্যে অবস্থান করাটাই একমাত্র করণীয় মনে করে সেই মত প্রস্তুতও হচ্ছিলেন।

আমার দুর্গে অবস্থিতিকালে কোন রকম দুর্বলতা আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি। এমন কি দুর্গমধ্যে সহায়ক বাহিনীর ব্যবস্থা করতেও পারিনি। এ অবস্থায় সম্মুখ সংগ্রামই ছিল একমাত্র পথ। তৈমুরের দুর্ধর্ষ বাহিনী কিন্তু বারবার বাধা পেয়ে ফিরে এল। জয়লাভ প্রায় অসম্ভব। এ কথা মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই বলেই ধরে নিলাম আমরা। অথচ তৈমুরকে যদি ফিরে যেতে হয়, তাহলে সারা রাজ্যে যে অশান্তির আগুন জ্বলে উঠবে, এ কথা সুনিশ্চিত। উভয় সঙ্কটে পড়ল তৈমুর।

জাহাঙ্গীরের অসমসাহসিকতা কিন্তু অসম্ভবকে সম্ভব করলে। একটি আক্রমণের মুখে সে তার সঙ্গীদের সঙ্গে কি ভাবে যেন দুর্গ-প্রাকারের ওপর উঠে পড়েছিল। দুর্গ রক্ষীরা সেই সামান্য ক'জন

সৈন্যকে বিতাড়িত করতে ব্যগ্র হয়ে সেই দিকেই ছুটে গেল। আমরা সবাই জাহাঙ্গীরকে বাঁচাতে তীব্র শক্তিতে আক্রমণ করলাম।

সেই প্রচণ্ড আঘাতে দুর্গের রক্ষা ব্যবস্থা মুহূর্তের মধ্যে খড়কুটোর মত ভেসে গেল। আর বীর্যশুল্কে জাহাঙ্গীর খাঁজাদীর বরমালা লাভ করল।

তৈমুরের ছেলে তার বাপের সম্মান রক্ষা করল।

শুভলগ্নে শুভক্ষণে খাঁজাদীর সঙ্গে জাহাঙ্গীরের বিয়ে হয়ে গেল। তৈমুর বিয়ের যৌতুক হিসাবে ছেলেকে নিজের পৈত্রিক অধিকার বারলাভূমির আমীরত্ব প্রদান করল। সকলের শুভেচ্ছা পাথেয় করে জাহাঙ্গীর সস্ত্রীক নিজ শাসনের দিকে যাত্রা করল।

আমি আরো নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লাম। জাহাঙ্গীরের সাহচর্যে তবু কিছুটা সময় আমার ভালই কাটত। এখন তা যেন জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসল আমার ওপর। ফলে আমি সদা অশান্ত, সদা চঞ্চল। কোথাও দু'দণ্ড চুপ করে বসতে পারি না। রাজসভার আলাপ-আলোচনা অসহ্য লাগে। অসহ্য লাগে পত্নীর ক্ষণ-সান্নিধ্য। অসহ্য লাগে পানপাত্র।

শেষ পর্যন্ত প্রায় উন্মাদের মত ঘোড়ার পিঠে চেপে দিগন্তের দিকে ছুটে চলে যাই। অসীম শূন্যতার মধ্যে পৌঁছে নিজেকে আমি বিলিয়ে দিই প্রকৃতির কাছে। সময় আমার কাছে স্থির হয়ে যায়।'

সময় অবশ্য আপন গতিতেই চলতে থাকে। অন্যদের ওপর

তার প্রভাবও পড়ে। শ্রান্ত ক্লান্ত সুশিক্ষিত ঘোড়ার শ্রান্তি অপনোদিত হয়। মুক্তির আনন্দে ঘুরে বেড়ানোর পালাও বুঝি শেষ হয় তার। তখন সে এসে ডাক দেয় আমায়। নিজেকে আবার ফিরিয়ে আনি সময়ের চৌহদ্দীতে। ফিরে আসি সহরে।

মাঝে মাঝে নিয়মের ব্যতিক্রমও ঘটত। তখন তৈমুরের নিয়মিত যুদ্ধযাত্রায় সঙ্গী হতাম আমি নিজে। কোন বার সৈন্যদল যেত উত্তরে, কখনও দক্ষিণে, কখনও পূবে, কখনও বা পশ্চিমে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পলাতক বিদ্রোহীদের অনুসরণ করে তাদের আশ্রয়স্থল আক্রমণ করা হত। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও ছিল না যে এমন নয়। যেমন ধরা যাক, ক্যাথের কথা।

দুনিয়ার অন্যতম প্রধান এবং সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ক্যাথে। বিপুল তার আয়তন, তেমনি বিশাল তার জনসংখ্যা। একদা সেখানকার সৈন্যবাহিনী তাতারীর ওপর নিজেদের প্রভাব বিস্তার করেছিল। খাঁখানান পদটি ক্যাথের সম্রাটের প্রতিনিধি হিসাবেই সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে খাঁখানান পদাধিকারীরা এমনই শক্তিমান হয়ে উঠেছিলেন যে, তাঁরা কার্যত স্বাধীন ভাবেই রাজ্য-শাসন করতেন। ক্যাথের সম্রাটদের কাছে খবরটা যদিও বা পৌঁছত, তিনি তা গ্রাহ্যই করতেন না। হয় ত ভাবতেন, সামান্য এক খাঁখানান কি আর করতে পারে।

এ ছাড়া প্রচণ্ড সুখ আর আরামে তাঁদের যুদ্ধ করবার শক্তি ক্রমশঃই ক্ষীণ হয়ে আসছিল। কাজেই যা চলছে তাই চলতে দেওয়াই সমীচিন মনে করতেন তাঁরা। এই সুযোগে খাঁখানানের

অধিকার বেড়েই চলেছিল। আর শেষ পর্যন্ত তা সম্রাটের সাম্রাজ্যের দরজায় এসে থাবা গেড়ে বসেছিল।

যতটা সহ্য করা যায়, তার সীমা বহুদিন অতিক্রান্ত হবার পরেও ক্যাথের সম্রাট হয়ত আমাদের অত্যাচার সহ্য করতেন। কিন্তু আমাদের সীমান্ত রক্ষীদলের প্রধান সেনানী একটা গোলযোগ বাধিয়ে বসায় তা আর সম্ভব হল না।

গোড়ায় ব্যাপারটা ছিল নিতান্তই তুচ্ছ ঘটনা। একদল লোক সীমান্তে বে-আইনী অনুপ্রবেশ করে কিছু ঘোড়া লুট করেছিল। আমাদের সীমান্ত রক্ষীদল তাদের হাতেনাতে ধরে ফেলে যৎপরো-নাস্তি শাস্তি দেয়। উপরন্তু তাদের সঙ্গে প্রধান সেনানীর স্বাক্ষরিত অপমানসূচক একটি চিঠি দিয়ে তাদের সীমান্ত পার করে দেয়।

চিঠিটা লেখা হয়েছিল সম্রাটের নামে :

ওরে জরদগব বুড়ো, তোর ত ক্ষমতা বলতে কিছুই নেই। তবে কেন হাত পা ছুঁড়িস। যদি আমাদের যৌবন তোকে সাহার্য করতে পারে তবে জানাস। তোর বংশ রক্ষার ব্যবস্থা আমরা করব। তোর কাঠপিঁপড়েগুলোকে অকারণ এদিকে পাঠাস না।'

এ ধরণের চিঠি লেখাটা যে অত্যন্ত অন্যায় হয়েছিল, তা বলার দরকার করে না। কিন্তু হাতের তীর ছোঁড়া হয়ে গেলে তাকে ফিরিয়ে আনা যায় কি করে। সম্রাটের স্থানীয় সেনাপতি অত্যন্ত অপমানিত বোধ করে আমাদের সীমান্ত অঞ্চলে ব্যাপক হারে অভিযান চালাল। ফলে বেশ কিছু সীমান্ত রক্ষী নিহত হল।

এরপর সুরু হল কূটনৈতিক পর্যায়ে পত্রালাপ। দু'পক্ষই অবশ্য

যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, কিন্তু যুদ্ধ সুরু হবার আগে নিজেদের অধিকতর শক্তিশালী করবার জন্য যতটা সময় পাওয়া যায়, তা নেবার জন্যই এ পত্রাবলীর অবতারণা।

আমাদের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ পত্র প্রেরিত হ'ল ঃ

'বারবার এমন ভাবে সীমান্তে আক্রমণ সুপ্রতিবেশীর লক্ষণ নয়। আমাদের যে ক্ষতি হয়েছে, তা পূরণের জন্য লক্ষ দিনার পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।'

প্রত্যুত্তরে ওপক্ষ থেকে আমাদের তরফে যে সব অন্যায় হয়েছিল তারই এক সুদীর্ঘ তালিকা প্রেরিত হ'ল। তালিকার প্রতিটি ঘটনাই সত্য। কিন্তু কালাতিক্রমে দোষ দুষ্ট হওয়ায় তা বিনা বাক্য ব্যয়ে বাতিল করা হ'ল।

ওপক্ষও তখন আমাদের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে আবার পাল্টা প্রতিবাদ পাঠাল। অবশ্য দু'পক্ষই তলায় তলায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। সুযোগ ও সুবিধামত যুদ্ধ সুরু করার মতলবই ছিল উভয় পক্ষের। যুগে যুগে কূটনীতির মূল তত্ত্বই ত এই। তাতারীরা অবশ্য কূটনীতিতে খুব বেশী পটু নয়। তাই প্রথম তারাই অন্যবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করলে।

শীতের শেষে বসন্তের সমাগমের সঙ্গে সঙ্গেই তৈমুরের অজেয় বাহিনী সীমান্ত অভিমুখে অগ্রসর হ'ল। যাতায়াতে বসন্ত প্রায় শেষ হয়ে গেল। কিন্তু ঠিক ছকমাফিক সৈন্য সমাবেশ করা হ'ল। আশা করা গিয়েছিল যে, সীমান্তের কাছাকাছি বিরুদ্ধ পক্ষীয় সৈন্যদের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। কিন্তু কার্যকালে তা ঘটল না।

...র সীমান্ত রক্ষা ব্যবস্থাকে অতি সহজেই সরিয়ে দিয়ে আমরা ...থে রাজ্যে প্রবেশ করলাম।

...সভ্যতার অন্যতম আনুষঙ্গিক যে জড়ত্ব, ক্যাথে আর হিন্দুস্তান ...দুই সুসভ্য রাজ্যেই তার অজস্র প্রমাণ আমি পেয়েছি। এর ...ণ কি হতে পারে তা নিয়ে কিছুটা চিন্তাও করেছি আমি। ...আমার স্বল্প জ্ঞান থেকে বোধ হয় ঠিক ঠিক বিচার সম্ভব ...নি।

মোটামুটি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলাম যে, সুসভ্য দেশগুলি ...রণত প্রকৃতির অকৃপণ দানে ধনী হয়। আর এই অকৃপণতা ...ষগুলোকে করে তোলে আয়েসী আর আরামপ্রিয়।

দৈনন্দিন অশন-বসনের জন্য যেখানে সংগ্রাম করতে হয় না, ...র অন্ন যেখানে সামান্য চেষ্টাতেই জুটে যায়, সেখানে মানুষের ...ঠামোর গোড়াতেই কেমন একটা খুঁত থেকে যায়। সামান্য ...খেলেই মাথা নুয়ে পড়ে। রুখে উঠে মারের বিরুদ্ধে মার দিতে ...রে না তারা। চোখের জল তাদের তাই প্রধান সম্বল।

তৈমুরের প্রচণ্ড আঘাতে বিপর্যস্ত দেহলী নগরীতেও ত সেই ...নাই ঘটল।

আবার এই দুঃখের মধ্যে গভীরতাও বোধহয় কম। তাতারীর ...ক প্রতিশোধের যে তীব্র জ্বালা থাকে, খুনের বদলে খুন না ...লে তা যেমন তৃপ্ত হতে চায় না, হিন্দুস্তানের মানুষের মধ্যে ...উকে তেমন দেখিনি। তৈমুরের ধ্বংসলীলার বিরুদ্ধে একটি ...নুষকেও ত জীবনপণ করে তৈমুরকে হত্যা করার জন্য ছুটে যেতে ...খিনি।

ক্যাথের ক্ষেত্রেও ঠিক একই ঘটনা ঘটতে দেখা গেল।

রাজধানীর পথে আমাদের অগ্রগতি একমাত্র তাদের এই বিশাল প্রাচীরই যা নিরুদ্ধ করতে পেরেছিল। মঙ্গোল-তাতারদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার্থ ক্যাথের সম্রাটরা বিস্ময়কর এই প্রাচীর গেঁথেছিলেন। কত লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে মানুষের অপূর্ব কীর্তি গড়ে উঠেছিল, আজ আর তা বলার কোন উপায় নেই। কিন্তু সেই সব বিদ্রোহী আত্মার প্রভাবেই বোধহয় অতি সাধারণ দুর্গ প্রাচীরের চেয়েও সহজে আমরা সে প্রাচীর পেরিয়ে গেলাম।

এরপর ক্যাথের সম্রাটের সন্ধি প্রার্থনা করা ছাড়া গত্যন্তর রইল না। অতি অসম্মানজনক সর্তে নিজের কন্যা সম্প্রদান করে, তৈমুরের সমস্ত সঙ্গত-অসঙ্গত দাবী মেনে নিয়ে সম্রাট সন্ধি করলেন।

ক্যাথের প্রাচুর্য তথা বিলাস, তাতারীদের মধ্যে যে বিপর্যয়ের সূত্রপাত করছে, এটা বুঝেই তৈমুর ক্যাথের সম্রাটত্বের মোহ জয় করে স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেছিল। হিন্দুস্তান থেকে একই কারণে তার প্রত্যাবর্তন। জীবনের বন্ধুরতা আর রুক্ষতা ছাড়া সে বাঁচতে পারে না। অস্ত্রের ঝনঝনা আর অশ্বের হ্রেষা তার কাছে সর্বোত্তম সঙ্গীত। জীবনের শেষক্ষণটুকুও বোধ হয় তার যুদ্ধক্ষেত্রেই অতিবাহিত হবে।

আর এই বন্ধুর জীবনই তাকে জীবনকে পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করতে শিক্ষা দিয়েছিল। যা পাওয়া যায় তার শেষবিন্দু টুকুও নিঙড়ে পান করতে পারত সে। শেষ পর্যন্ত হয়ত নিজেকে তাই ঈশ্বর বলে ভাবতেও প্ররোচিত করেছিল।

কিন্তু সে সব ত পরের কথা। আমার কাহিনীর স্রোতে আবার ফিরে যাই।

বিয়ের পর থেকে জাহাঙ্গীরের মধ্যে অদ্ভুত একটা পরিবর্তন দেখা দিল। যুদ্ধক্ষেত্রে সকলের আগে আর তাকে দেখা যেত না। ক্রমশই সে যেন পিছিয়ে পড়তে লাগল। শেষ দিকে তার দেখাই পাওয়া যেত না। ক্রমশঃ সে যেন দূরে সরে যাচ্ছিল। নিজের অধিকারের মধ্যেই অধিকাংশ সময় কাটত তার। এই ভাবটা ছেলে পীর জন্মের পর থেকেই যেন আরো প্রকট হয়ে উঠেছিল।

ওর বিয়ের বছর পাঁচেক পরে বিদ্রোহী হোসেনকে শায়েস্তা করতে হীরাতে যাবার পথে বারলাভূমি অতিক্রম করতে হ'ল। আমরা আশা করেছিলাম যে, জাহাঙ্গীর নিজের অধিকারের প্রান্ত পর্যন্ত এগিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করবে? কিন্তু তার প্রাসাদের দরজায়ও যখন তার দেখা মিলল না, তখন আমাদেরকে একেবারে তার ঘরে গিয়ে দেখা করতে হ'ল।

তার এ ব্যবহারে আমরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম, এ কথা স্বীকার করলে সত্যের অপলাপ করা করা হবে। জাহাঙ্গীরকে দেখে কিন্তু সে ক্ষোভ আমাদের ভয়ে পরিণত হ'ল।

এ কোন জাহাঙ্গীর? তৈমুরকে তার বাপ না বলে, তাকেই তৈমুরের বাপ বলে মনে হবে। সদা হাস্যময় জাহাঙ্গীরের মুখে একটা অজ্ঞাত বিষাদের ছায়া ফুটে উঠেছে যেন।

আমাদের দেখে সে কিছুটা থতমত হয়ে বললে, 'খানিকটা এগিয়ে যাব ভেবেছিলাম, কিন্তু শরীরটার তেমন জুৎ নেই। তাছাড়া আমাকে দেখবে কে?'

পথে তৈমুর আমার কাছে ক্ষোভ করে বললে, 'জাহাঙ্গীর ভীরু হয়ে গেছে আবদুল্লা।'

আমি কিন্তু তার সঙ্গে একমত হতে পারিনি। তার রক্ত-মাংস অস্থি-মজ্জা যে ঐ বাঘিনীর পিপাসা মেটাতেই যাচ্ছে, তা বুঝতে বিশেষ কষ্ট হল না। উপরন্তু শের মহম্মদ আর পীর মহম্মদের গায়ে বাঘিনীর নখরাঘাতের চিহ্ন আমার দৃষ্টি এড়ায়নি। জাহাঙ্গীরের ভয়ের আসল কারণও তাই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল আমার কাছে।

হীরাতে সেবার অনেকদিন থাকতে হয়েছিল আমাদের। অপদার্থ হোসেন পালিয়ে বেঁচেছিল। কিন্তু স্থানীয় অধিবাসীদের বাধা প্রতি পদে আমাদের বিব্রত করে তুলেছিল। বহু রক্তপাতের পর হীরাত সমস্যার মোটামুটি একটা সমাধান করা সম্ভব হয়েছিল।

শ্রান্ত-ক্লান্ত আমরা সমরখন্দের পথ ধরেছিলাম। ঘরে ফেরার আনন্দে সবার মত তৈমুরও খুসীতে ভরপুর হয়ে উঠেছিল। কিন্তু মাঝপথেই বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত জাহাঙ্গীরের মৃত্যু সংবাদ এসে পৌঁছল তার কাছে।

একেবারে পাথর হয়ে গেল তৈমুর। আইজলের মৃত্যুর পর তার চোখে জল দেখেছিলাম—সেই প্রথম আর সেই শেষ।

পুত্রের শেষকৃত্যাদি সমাপন করে সমরখন্দে ফিরে এল তৈমুর। খাঁজাদীকে প্রথম কিছুদিন তার ছেলেদের অভিভাবিকা হিসাবে জাহাঙ্গীরের পুরানো অধিকার শাসনের দায়িত্ব দেওয়া হল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই নানা সূত্র থেকে তার দুর্ব্যবহারের এতরকম

নালিশ তৈমুরের কানে এসে পৌঁছল যে, সে পুত্রবধূকে পিতৃগৃহে নির্বাসিত করতে বাধ্য হ'ল।

আমিনা অনেকদিন ধরে রাফাতকে উপযুক্ত দায়িত্ব দেবার জন্য আবদার করছিল তৈমুরের কাছে। তার হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য তৈমুর তাকে খাঁজাদীর অভিভাবক হিসাবে পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হল। অবশ্য এ নিশ্চিন্ততা আগ্নেয়গিরির গহ্বরের পাশের নগর-গ্রামের নিশ্চিন্ততার মত। সেটা বোধহয় সে কল্পনাও করেনি।

নিশ্চিন্ত মনে তৈমুর এবার রাজ্য শাসন আর ব্যক্তিগত ভোগ-বিলাসে মনোনিবেশ করল। রাজ্যের প্রান্ত থেকে প্রত্যন্ত প্রদেশের মধ্যে যোগাযোগের উন্নতি সাধনই হল তার প্রথম কাজ।

যাতায়াতের জন্য ভাল ভাল পথ, নির্দিষ্ট দূরত্বে সরাই, আর বার্তাবহদের জন্য ঘোড়াসহ আস্তাবল তৈরী করে সহজে এবং নিয়মিত ভাবে খবরাখবর আদান প্রদানের ব্যবস্থা এমনই পাকা করে ফেলল যে, দূরতম প্রত্যন্ত প্রদেশের যে কোন খবরই স্বল্পতম সময়ের ব্যবধানে রাজধানীতে এসে পৌঁছে যেত।

ফলে কোথাও কোন গোলোযোগ হতে না হতেই তৈমুরের সৈন্যবাহিনী সেখানে উপস্থিত হতে লাগল। সহজে কোন খাঁর পক্ষে বিদ্রোহ করা তাই সম্ভব হ'ত না।

এ ব্যবস্থায় আর এক দিক থেকে লাভবানও হয়েছিল সে। পূর্বে ব্যবসায়ীদের মালপত্র নিয়ে যাবার পথে লুট হবার সমূহ সম্ভাবনা ছিল। নিরাপদে বাণিজ্য করবার সুবিধার জন্য তারা খাঁখানানদের নিয়মিত ভাবে প্রচুর অর্থ নজরাণা দিয়েও নিরাপত্তা পায়নি।

তাই ক্রমশঃ ব্যবসায়ে তাদের ঘাটতি হচ্ছিল এবং বহু প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য সাধারণের আয়ত্তের বাইরে চলে যেত। এর প্রধান কারণ ছিল, দূরবর্তী অঞ্চলের খাঁ-রা এই লুটতরাজ করত, আর তাদের সহজে শায়েস্তা করা খাঁখানানের পক্ষে সাধ্যাতীত ছিল।

প্রথমেই তৈমুর পথঘাটের অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। যে কোন মুহূর্তে অপরাধী খাঁর বিরুদ্ধে শক্তিশালী সৈন্য পাঠাবার সম্ভাবনা তাদের অনেকটা সংযত করে রাখত। তার ওপর জহ্লাদ আবদুল্লার নিত্য নতুন উদ্ভাবনী ক্ষমতা প্রয়োগের খবরও অজ্ঞাত ছিল না তাদের। তাতেও কিন্তু বেশ কিছুটা সংযম এসেছিল তাদের মধ্যে।

বণিকরা নিশ্চিন্ত মনে বাণিজ্য করার সুযোগ পাওয়ায় কৃতজ্ঞ চিত্তে অধিকতর পরিমাণে নজরাণা দিল দরবারকে। এতে তৈমুরের রাজকোষে ক্রমবর্ধমান হারে রাজস্বই যে শুধু জমা পড়ছিল তা নয়, প্রচুর পণ্যদ্রব্য আমদানিতে জিনিষপত্রের দামও সস্তা হয়ে গিয়েছিল।

সমরখন্দকেও নতুন সাজে সাজিয়েছিল তৈমুর। সুরম্য অট্টালিকা আর নতুন নতুন ফুলের বাগিচায় সারা সমরখন্দ অপরূপা হয়ে উঠল। গড়ে উঠল নতুন নতুন মসজিদ। এর মধ্যে তৈমুরের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বিবি খাতুমের মকবরা।

আইজলের প্রতি তৈমুরের গভীর প্রেমের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল তার এই অসামান্য সৃষ্টিতে। এর জন্য অর্থব্যয়ে তৈমুর বিন্দুমাত্র

র্পণ্য করেনি। তিল তিল করে এক তিলোত্তমাকেই উপস্থিত রেছিল সে, আইজলের তরুণ প্রাণের প্রতীক হিসাবে।

ভেঙে-গড়ে নতুন ছাঁদে পুরাণো সমরখন্দকে সাজানোর কাজে ঝে মাঝে আবার ছেদও পড়ত। তৈমুর যখন তার হারেমের তম আকর্ষণটিতে উন্মত্ত, পারিপার্শ্বিক সব কিছুই তার সামনে ন সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। দু'টি কোমল করপল্লবেই বিশ্বজয়ী খাঁখানান মীর তৈমুরলঙ্গ সম্পূর্ণ বন্দী তথা পরাভূত।

জীবনকে পূর্ণমাত্রায় উপভোগে তৈমুরের কোনরকম দ্বিধা ছিল । এবং তার জন্য অর্থব্যয়েও কোনরকম কার্পণ্য ছিল না তার। একবার এক এক খেয়ালে মেতে উঠত সে। আর সেইটাই র কাছে তখন একমাত্র ধ্রুব বস্তু হয়ে দাঁড়াত।

মনে পড়ে, এক খৃষ্টান কুমারী বাঁদী কেনার জন্য বিশ হাজার নার খরচ করেছিল সে। পছন্দমত বাঁদীর জন্য এই রকম দাম ওয়া খুব যে একটা অস্বাভাবিক ঘটনা ছিল তা নয়, তবে ব্যয়ের অর্থ থাকাও ত দরকার। তৈমুরের পক্ষে তখন অর্থের প্রসঙ্গ ম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। দুনিয়ার সমাজের একটা ভালরকম অংশই তার করতলগত তখন।

অবশ্য বাঁদী কেনা ত তখনকার দিনে অতি সাধারণ নৈমিত্তিক না। আমীর-ওমরাহ ত সামান্য কথা, কিঞ্চিৎ বিত্তবান হলেই রা বাঁদী কিনত, এবং নব যৌবন-উদ্ভিন্না বাঁদীর যৌবন কুসুমদল পিষে শেষ করে দিত অতি অল্প দিনেই। তারপর

অপ্রয়োজনীয় বোধে, সেই ধর্ষিত খণ্ডিত দেহটাকে বাজারের অন্য দামী পণ্যদ্রব্যের মত সস্তা দরে বেচে দিত।

তৈমুরের বৈশিষ্ট্য ছিল কিন্তু অন্যরকম। কুমারী বাঁদীর কৌমার্য অপহরণের জন্য তার নানাবিধ উদ্যোগ আয়োজন হত। তার আদেশে ওস্তাদ কারিগররা বাঁদীর দেশের অনুরূপ খেলাঘরের সহর আর ঘর-বাড়ি তৈরী করতে লেগে যেত। বহুদিন পরিশ্রমের পর যখন সে-সহর তৈরী হ'ত, তখন কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট সেই পরিচিত পরিবেশে কুমারী প্রায় স্বেচ্ছায় তার কৌমার্য তৈমুরকে অর্ঘ দিত।

আবার একবার তৈমুর এক হাবসী বাঁদীকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল। সে বাঁদীর ক্ষেত্রে কৌমার্যের প্রশ্ন ছিল অবান্তর। বহু-দিন ধরে বহু ঘাটের জল খেয়ে পোড় খাওয়া কঠিন মানুষ হয়েছিল সে। কিন্তু সেই সঙ্গে পুরুষ মনোরঞ্জনের সর্ববিধ কৌশলই রপ্ত হয়ে গিয়েছিল তার। এ ধরনের গুনসম্পন্নাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্বাধীন করাটা বড় কথা নয়। বড় কথা ছিল রতি যুদ্ধে তাকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করা। সেই কাজেই একনিষ্ঠভাবে আত্মনিয়োগ করেছিল তৈমুর এবং সফলও হয়েছিল।

জীবনের ঘাটে ঘাটে থরে থরে যে আনন্দ উপাদান ছড়িয়ে আছে, সবাই তা সচেতন ভাবে ও পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করতে পারে না। ভোগ করবার জন্য চাই হিম্মত। আর সে হিম্মত পরিবেশ নিরপেক্ষ আর প্রায় পুরোটাই মনোগত। যে পরিবেশ বা যে উপাদানে আমীরের মন ভরে না, পথের ভিক্ষুকের হয়ত তাই কল্পনার সীমান্ত।

এমন মানুষ খুব অল্পই দেখা যায় যে, যে কোন পরিবেশে বা যে কোন উপাদানের মধ্য থেকেই চরম আনন্দ লাভ করতে পারে। কেবল তারাই রূপসাগরে ডুব দিয়ে অরূপ রতন লাভও করতে পারে।

অবশ্য এ রকম মানুষের খবর পাওয়া ভাগ্যের কথা। সাধারণ মানুষ সর্বদাই এর ব্যতিক্রম। ব্যতিক্রম বললে বোধহয় ভুল বলা হবে, অধিকাংশ যা করে সেটাই ত নিয়ম বা রীতি। রীতিকে অতিক্রম করে যে যায় সেই ব্যতিক্রম, অসাধারন।

তৈমুরের ক্ষেত্রে এই অসাধারণত্বের স্পর্শ বারবার দেখেছি। দেখেছি তার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। খাঁচার পাখী আর বনের পাখীর মিল বড় একটা হয় না। খাঁচার পাখী বুনো পাখীকে সহজে পোষ মানাতে পারে না বলেই প্রসিদ্ধ। তৈমুর কিন্তু যে কোন বুনো পাখীকে পোষ মানাতে পারত। অবশ্য সে পোষ মানবার প্রয়োজনীয় রসদ তার অফুরন্ত ছিল, এটা ত খুবই সত্য কথা।

কিন্তু না থাকলেও কি তার খুব অসুবিধা হ'ত? আমারত তা মনে হয় না। আইজলকে সে কথা মানিয়েছিল কি করে? খাখানানের পেয়ারের নাতনীর উপযুক্ত ত সে কোন দিক দিয়েই ছিল না। তবু শত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও আইজল তাকে ছেড়ে যাবার কথা চিন্তাও করেনি কেন?

দিলশাদের কথাই ধরা যাক না! তৈমুরের প্রতি সে যখন আকৃষ্ট হয়েছিল, তখনও তৈমুরের ভাগ্যচক্র প্রায় পূর্ণগ্রাসের কবলে পড়ে রয়েছে। তবুও নিজের শরম ধরম সব কিছু জলাঞ্জলি দিয়েছিল কিসের প্রলোভনে?

ভবিষ্যত সম্ভাবনার বিন্দুমাত্র আভাসও যখন দেখা যায়নি,

তখনও তৈমুরের বিজয় বৈজয়ন্তী দুর্গ থেকে দুর্গান্তরে উড়েছিল কোন মায়া বলে? নারী মহলে তৈমুরের অপূর্ব প্রভাবের মূলতত্ত্ব অনেককে যাদু মন্ত্র, জিনের কারসাজি বলতে শুনেছি। কিন্তু সত্যি কি তাই?

তাহলে ত কোথাও হার মানবার কথা ছিল না তার। অথচ অন্ততঃ দুটি ক্ষেত্রে তার পরাজয় আমি সচক্ষে দেখেছি। আমিনা তার স্ত্রী হিসাবে যতটা ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশী রাকাতের মা ছিল। তার মাতৃসত্ত্বাটাই দয়িতাকে সরিয়ে দিয়েছিল।

দ্বিতীয়, খাজাদী সোফিয়া। সোফিয়ার সঙ্গে তৈমুরের সম্পর্ক ছিল দুই দ্বন্দ্বযোদ্ধা,—পরস্পরের দোষত্রুটি আবিষ্কারেই ব্যস্ত ছিল তারা। যুদ্ধে অবশ্য কারুরই জয় হয়নি। তবে একদিক থেকে তৈমুরের সেটা পরাজয়।

এই পরাজয়ই তৈমুরকে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে, সে মানুষ। কিন্তু মানুষ হলেও অসাধারণ। আর তার এই অসাধারণত্বের মধ্যে স্বার্থপরায়ণতার সুস্পষ্ট প্রকাশ ছিল। এবং সেই স্বার্থপরায়ণতাই তার আশপাশের লোকের ওপর প্রসাদ স্বরূপ নেমেও আসত।

উপভোগটা অবশ্য সে নিজে একলাই করত না, আমার কথাও তার স্মরণে থাকত। নিয়মিতভাবে আমার কাছে নতুন নতুন নারী আসত তার উপহার হিসাবে। তাদের স্পর্শসঙ্গ আমাকে কিছুটা সময় আনন্দ দিত ঠিকই, কিন্তু তারপর আবার সেই বিতৃষ্ণা। তৈমুরের উপহারের ওপর জল্লাদ আবদুল্লার নৃশংসতার পরীক্ষা করা হয়ত চলত, কিন্তু নারীর ক্ষেত্রে সে পরীক্ষা চালাতে কেমন অস্বস্তিবোধ হত আমার। আমি তাদের তখন অন্যের কাছে বিলিয়ে দিতাম। তৈমুর তখন আবার আর একজনকে পাঠাত।

…মনি করেই দিনগুলো কাটছিল আমাদের। নিত্য নতুন …সঙ্গে রহমাও এসে পড়ল এবার। আমার উত্তপ্ত হৃদয়ে সে …শান্তির প্রলেপ দিতে পেরেছিল। নিজের অশান্ত মনের …কে তখন আমায় দূরে পালাতে হ'ত না। বড় উতলোই …বুঝতে পারত। জোর করে আমার মনের কথা জানতে …সে। তারপর দিত সান্ত্বনা, দিত সান্নিধ্য। কিন্তু সে সবই …ব্যর্থ হয়ে যেত, তখন দু'বাহুর নিবিড় আশ্লেষে আমার সমস্ত …চিন্তা দুঃখ ক্ষোভ এবং বেদনাকে আপনার মধ্যে নিঃশেষে …করে নিতে চাইত।

…আঘাত পেয়েছে সেই বোধ হয় অন্যের আঘাতের ব্যথা …ভালভাবে বুঝতে পারে। তবে আঘাতের শেষে যেদিন …ের উচ্ছ্বাসটাই প্রবল হয়ে ওঠে, সেদিন বোধ হয় অনেকেই …দুঃখের দিনগুলি ভুলে যায়।

এই ভুলে যাওয়াটাই কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। একদিন যাকে …বৃত্তি অবলম্বন করে বাঁচতে হয়েছে, যেদিন তার সুদিন …, সেদিন সে-ই নিজেকে চিরন্তন শের বলে মনে করে। …যদি অতীত স্মৃতিকে উজ্জীবিত করতে চায় ত তারা বিরক্ত …অতীত তাদের সম্পূর্ণ মৃত। বর্তমান স্বপ্নপ্রসু, আর ভবিষ্যত …আশার আলোয় উজ্জ্বল।

তৈমুর এই দলেরই লোক। তাই অতীত তার কাছে ফুরিয়ে …চেরাগের মত সম্পূর্ণ অবাস্তব। বর্তমানকে সে দু'হাতের …চেপে ধরে পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করতে চায়। আর তার …চিন্তা ভবিষ্যতের স্বর্ণ সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপায়িত করার …ই ব্যস্ত।

আর একদল আছে, যারা সংখ্যায় নগণ্য হলেও সামান্য নয়। এরা অতীতের দুঃখকে ভুলতে পারে না। বরং তারই সহায়তায় ভবিষ্যতের অনেক অন্ধকারকে দূর করতে সক্রিয় হয়ে ওঠে। তাদের কোমল স্পর্শে তাই অনেক তাপিত চির শীতল হয়ে যায়। এ অবস্থা যে অনুভব না করেছে, সে বুঝবে না যে, জগদীশ্বরের কত বড় আশীর্বাদ এই মানুষ।

নিজের জ্বালা জোড়াতে পারুক না পারুক, রহমা ধূপের মত আমার কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে তৃপ্তি পেত। আর আমিও চরম স্বার্থপরের মত নিজের দুঃখের ভারের ভাগীদার করেছি তাকে, বিনা চিন্তায়, বিনা দ্বিধায়।

পুরুষরা ত চিরদিনই এমন স্বার্থপর। নারীরা নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে যে তাদের স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখে, এই সহজ তথ্যটা তারা বেমালুম ভুলে যায়। তাই অপ্রাপ্য বস্তুকে তাদের অবশ্য প্রাপ্য বলে ধরে নেয়। আর সেই বস্তুটিই না পাবার জন্য তাদের লম্ফঝম্ফ দেখে কে?

এই সাধারণ দোষ থেকে আমিও মুক্ত ছিলাম না। তাই আজকে বিচার করতে বসে রহমার অমূল্য অবদানের দাম দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। মনে হয় আমার মত অতি সাধারণের মধ্যে কি সে দেখল, যাতে মৃত্যুর চেয়েও ভয়াবহ মস্তিষ্ক বিকারের পথ থেকে আমাকে স্বাভাবিক জীবনের পথে নিয়ে যাবার জন্য সে অতটা সক্রিয় হয়ে উঠল। সেটা কি স্ত্রী চরিত্রের দুর্জ্ঞেয় রহস্যেরই প্রকাশ?

আবার ঝড় উঠল? খবর এল, সমস্ত নিয়ম ভঙ্গ করে রাফাত খাজাদীর ওপর বলৎকার করায়, সে সন্তান সম্ভবা। এ হেন অনিয়মে খাজাদীর প্রজারা বিক্ষুব্ধ। তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে।

তৈমুরের কাছে ডাক পড়ল আমার। দেখলাম, তৈমুর অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে পড়েছে। স্বাভাবিক অবস্থায় এ ব্যাপারের মোকাবিলা করার জন্য সে নিজেই যেত। কিন্তু তখনও তার সর্বাঙ্গে সম্ভোগের মায়া অঞ্জন। হারেমের আরাম ছেড়ে বেরোতে ইচ্ছা নেই তার।

আমায় বললে সে, 'দেখ আবদুল্লা, এমন একটা ব্যাপার নিয়ে যত কম গোলমাল করা যায় ততই ভাল। তুই ঐ হতভাগা রাফাতকে সোজা এখানে পাঠিয়ে দিবি। আমার ইচ্ছে করছে ওর মোটা মাথাটা কাঁধ থেকে নামিয়ে দিই। কিন্তু সেটাত সম্ভব নয়। ওটাকে আফিম আর আরক খাইয়ে খাইয়ে আমিনা একেবারে বরবাদ করে দিয়েছে। খাজাদীকেও আনতে হবে এখানে। আমার চোখের সামনে অতটা ঝামেলা পাকাতে পারবে না। আর ওর প্রজাদের শায়েস্তা করবার জন্য কি করতে হবে না হবে, সে কথা তোকে বলাই বাহুল্য।

মোট কথা, বেশী ঝামেলা না পাকিয়ে কার্যোদ্ধার করতে হবে। ব্যাপারটা বেশী লোককে জানাজানিও হতে দিতে চাই না আমি। কাজেই যত কম সম্ভব লোক নিয়ে গিয়ে কার্যোদ্ধার করতে হবে।'

ব্যাপারটা বুঝলাম। মাত্র জন কুড়ি অনুচর নিয়ে বেরিয়েও পড়লাম। রাফাত আত্মরক্ষার কোন ব্যবস্থাই করেনি। কাজেই অত্যন্ত সহজেই নগরে ঢুকে পড়লাম।

সোজা তার কাছে গিয়ে জানালাম, 'তৈমুরের সঙ্গে দেখা করতে হবে।'

রাফাত কোন কিছু সন্দেহ না করেই বাপের সঙ্গে দেখা করবার জন্য তার মাকে নিয়ে সমরখন্দের দিকে রওনা হ'ল।

রাফাতকে তার মা নষ্ট করেছিল। নইলে উপযুক্ত সুযোগ পেলে সে তৈমুরের সুযোগ্য পুত্র বলে নিজেকে প্রতিপন্ন করতে পারত। মার অত্যধিক আদর আর প্রশ্রয়, আর সেই সঙ্গে তার প্রতি বাপের অত্যধিক অবহেলা, রাফাতকে অলস, বিলাসী, জরদগবে পরিণত করেছিল। ওর জন্য আমার দুঃখ হয়।

খাঁজাদী কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য জাতের মানুষ। তৈমুরের হাতের মুঠোয় গিয়ে পড়লে তার যে রীতিমত অসুবিধা হবে, এটা সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল তার কাছে। তাই প্রথম ক'দিন সে কিছুতেই আমার সঙ্গে দেখা করল না। তার বাঁদীরা প্রতিবারই খবর আনত, খাঁজাদীর তবিয়ৎ ঠিক নেই। মনে হয়েছিল, তার প্রত্যাশা, প্রজাসাধারণ তার স্বপক্ষে বিদ্রোহী হয়ে তাকে সুলতানা করে দেবে। আর সে তখন নিজের অভিরুচিমত নিজ রাজ্যে স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করতে পারবে।

তার প্রত্যাশা কিন্তু অপূর্ণই থেকে গেল। কারণ, তখনও সে রাজ্যে তৈমুরের সৈন্যবাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণের ফলস্বরূপ তার বিবাহকালীন যুদ্ধের যে ক্ষত হয়েছিল, তা সম্পূর্ণ শুকোয়নি। আবার তৈমুরের শৌর্য সম্বন্ধে তাদের মনে সন্দেহের অবকাশও ছিল না। সেইজন্য কিছুটা মাথা চাড়া দিলেও সম্পূর্ণ বিদ্রোহী তারা হয়নি।

খাঁজাদী যখন আমার সঙ্গে দেখা করল না, তখন সে সময়টা আমি নগরবাসীকে শান্ত করার কাজে নিজেকে নিয়োগ করলাম।

খাঁজাদীর এক জ্ঞাতিভাই ছিল তৈমুরের অনুগত। তাকেই নগর শাসক নিযুক্ত করে, তার মাধ্যমে বিক্ষুব্ধ প্রজাদের শান্ত করতে খুব বেশী কষ্ট পেতে হ'ল না আমার।

রাফাত-খাঁজাদী পর্বের পূর্ণতথ্যও এই ফাঁকে সংগৃহীত হ'ল। সকলেই বললে, খাঁজাদী একটু একটু করে রাফাতকে খেপিয়ে তুলেছিল। তাকে প্রতি কথায় অপমান করত। বুঝিয়ে দিত, সে একটা অপদার্থ। তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করত, আর তার উপস্থিতিতেই অন্যদের সামনে তার সম্বন্ধে ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য করত। এ ছাড়া ক্ষণে ক্ষণে নিজের উত্তুঙ্গ যৌবনশ্রীকে রাফাতের মুগ্ধ চোখের সামনে ক্ষণিকের জন্য মেলে ধরে আবার তা গোপন করত। উদ্দেশ্য, তার মনে কামনার আগুন ধরিয়ে মজা দেখা। রাফাতের সামান্য ধৈর্যের বাঁধ ভাঙতে বেশী দেরী হল না।

আর এ ব্যাপারে তাকে বেশী দোষও দেওয়া যায় না। খাঁজাদীর মোহ থেকে তৈমুর বা আমার মত অভিজ্ঞ যখন মুক্ত হতে পারেনি, তখন অনভিজ্ঞ তরুণ রাফাত যে সামান্য পতঙ্গের মত সে আগুনে পুড়ে মড়বে, এ আর বিচিত্র কি?

আগুনে পতঙ্গ যে পুড়ে মরবে এইত বিধির বিধান। অথচ তবু আমরা দোষ দি তাদের। বলি অন্ধ, বলি বিবেচনাহীন। কিন্তু দৃষ্টিশক্তির বর যে পায়নি, তাকে দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী করে লাভ কি? আগুনের দাহিকাশক্তি সম্বন্ধে জ্ঞান যার জন্মায়নি, তাকে বিবেচনাহীন বলাটাও অর্থহীন নয় কি?

জন্মলগ্নে ঐতিহ্য নিয়ে যে মানুষ জন্মায়, তার ত আগুন সম্বন্ধে কোন জ্ঞান থাকে না। তাই বারবারই শিশু আগুনের দিকে তার কচি হাত বাড়িয়ে হাসে। কিন্তু আগুন তাকে ছেড়ে দেয় না।

দেখতে দেখতে তার আঁচে রাঙা হাত আরো রাঙা হয়। হাসি রূপান্তরিত হয় চোখের জলে।

মৃত্যু যার অবধারিত, কোন বাধা নিষেধ কি তাকে বেঁধে রাখতে পারে? আর পারে না বলেই ত অপরাজেয় মানুষের জয়যাত্রাকে প্রতিকূল প্রকৃতিও বেশীদিন ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। যে এভাবে বিজয়ী হয়, তাকে আমরা মনে রাখি, সম্মান জানাই। কিন্তু তার আগে আরো বহুজনে আপন বুকের রক্ত ঢেলে পথের দুর্লঙ্ঘ্য বাধাকে কিছুটা সহজতর করে দিয়েছে, তাদের কথা কিন্তু স্মরণেও রাখি না। আর রাখলেও, তা থাকে তার অবিমৃষ্যকারিতার জন্য, তার বিবেচনা হীনতার জন্য।

অবশ্য সেটাই স্বাভাবিক। মানুষ সাফল্যের অনুসরণ করাটাই পছন্দ করে। তা করুক আপত্তি নেই। কিন্তু যারা হতভাগ্য, জীবনের বন্ধুর পথে পথ ভুল করে যারা হারিয়ে যায়, তাদের ব্যঙ্গ করার অধিকার কে দিল এই সব গড্ডালিকা প্রবাহকে?

রাফাত ভুল করেছিল ঠিকই। কিন্তু সে ভুলের সূত্রপাত তার বাপ-মার ভুলের জন্যে। অথচ রাফাতকে তার জন্য চরম মূল্য দিতে হয়েছিল। ত্রিভুবনজয়ী তৈমুরলঙ্গের রক্ত তার ধমনীতে থাকলেও কেন সে তার সদ্ব্যবহার করল না। এ তত্ত্ব কেউ বিশ্লেষণ করেছিল কি?

তৈমুর নিজের দয়িতার অপমৃত্যুর কারণ। সন্তানকে শেষ দিনই ত' উপযুক্ত মূল্য দেয়নি। রাফাত ত. তৈমুরের কর্মকাণ্ডের মধ্যে নিজেকে সংযুক্ত করবার সুযোগ পায়নি! তার মা নিজের স্বামীকে বঞ্চিত করে তার প্রাপ্য সন্তানকে যা দিয়েছিল, তার জন্য

...নকার শিশু ত দায়ী নয়। অথচ চিরকাল জন্মকদের অজানিত ...র শাস্তি পেতে হ'ল সেই হতভাগাকে।

তৈমুরের ঘৃণা তথা অনীহাকে আমিনা বেগম নিজের স্নেহ-...বাসা দিয়ে ঢেকে দিতে চেয়েছিল বটে, কিন্তু তার ফল ভাল ...নি। পুত্র যদি পিতার উপযুক্ত হতে না পারে, তাহলে মায়ের ...তাকে বিপথগামী করবেই। রাফাতকেও করেছিল। তার সন্তানের কোন দোষ-ত্রুটিকেই দোষ-ত্রুটি বলে গ্রাহ্য করেনি। ... তার সমস্ত দুষ্কর্মকে সহায়তাই করেছে। লোক-চক্ষুর অন্তরালে ...তে চেয়েছে।

এ হেন সর্বগ্রাসী স্নেহের শেষফল কিন্তু ভাল নয়। রাফাতেরও ...নি। তবে সে যদি একটু কম পিতৃভক্ত হ'ত, তাহলে অন্ততঃ ...র আগে মেরে মরত। অন্ততঃ তৈমুর বা আমি হলে তাই ...তুম।

এদিক দিয়ে বিচার করলে তৈমুরের সন্তান-ভাগ্য ভালই ছিল।

সেদিনটা ছিল খাঁজাদীর জন্মদিন। নগরের গণ্যমান্য লোকেরা ...সেছিল তাকে নজর দিতে। আর সেই উপলক্ষে আয়োজিত ...নাপিনা তথা নাচ-গানের আসরে যোগ দিতে। খাঁজাদীর ...জ-পোষাক সাধু-সন্তদেরও চিত্তবিভ্রম ঘটাত। তাকে দেখে ...েহেস্তের হুরী বলে ভুল হওয়া কিছু বিচিত্র ছিল না।

রাফাত একটু দেরীতেই এসেছিল সম্পূর্ণ বে-এক্তার অবস্থায়। ...চ-গানের অনুষ্ঠান ভাল না লাগায় প্রথমেই সে তাদের তাড়িয়ে ...। অতিথিরা এতে কিছুটা ক্ষুব্ধ হলেও তৈমুর-পুত্রকে অসম্মান ...রেনি। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকবার পর সবাই যখন

অস্বস্তিতে উসখুস করতে আরম্ভ করেছে, ঠিক তখনই রাফাত বলে বসল, 'খাঁজাদীকে নাচতে হবে।'

সবাই নড়ে চড়ে উঠে পরস্পরের দিকে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল। খাঁজাদী প্রথমে ব্যাপারটা রসিকতা ভেবে আমল দেয়নি। কিন্তু রাফাত যখন জোর দেখাতে গেল, তখন যেন নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বেই নাচতে উঠল সে।

নাচ দেখেই বোঝা গেল খাঁজাদী রাফাতকে আরো গরম করতে চায়। নাচের ছন্দ উপস্থিত সকলেরই রক্তে দোলা দেয়। চঞ্চল হয়ে ওঠে সবাই।

রাফাতের দিকে যাদের লক্ষ্য ছিল, তারা বলেছে, রাফাত বেশ কিছুক্ষণ নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে।

তারপর এক সময়ে বাঁধ ভাঙল। নিজের জায়গা থেকে লাফিয়ে উঠে সে অল্প দূরে আত্মসমর্পণের ভঙ্গীতে লুটিয়ে পড়া খাঁজাদীর অর্ধনগ্ন দেহটাকে দুই বলিষ্ঠ বাহুর মধ্যে বেঁধে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে পড়ে।

এরপর বেশ কিছুদিন খাঁজাদী রাফাতের ঘরের মধ্যেই ছিল। নানাজনের কাছে শুনেছি, রাফাতের অকথ্য অত্যাচার তথা উৎপীড়নে খাঁজাদী সোফিয়া নাকি অত্যন্ত কাতর।

শেষের অংশটা যে অলীক কল্পনা, একথা পরবর্তী ঘটনার পরিপ্রেক্ষিত বলতে বাধা নেই। কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে এ তথ্য জানা সম্ভব নয় বলেই রাফাতের অস্বাভাবিক আচরণে তারা ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল।

প্রত্যাশা পূরণ না হওয়ায় হতাশ হয়ে খাঁজাদী আমায় ডেকে পাঠালে। অনেকদিন পর তাকে দেখে চমকে উঠলাম। প্রথম দিনের মোহিনীরূপ যেন আরো মোহময় হয়ে উঠেছে। তবে তাতে তৃষ্ণার শান্তি ছিল না। ছিল সিরাজীর উন্মত্ততা। সে মনকে শুধু উদ্দীপ্তই করত, রক্তে ধরাত জ্বালা। তার দাহিকা শক্তি অসতর্ক পতঙ্গকে পুড়িয়ে মেরে ফেলত।

আমাকে কাছে পেয়ে সে তার সমস্ত ছলকলা, আর কামনার ইন্ধন প্রয়োগ করে আমাকে কর্তব্যচ্যুত করতে চাইল। সে আমাকে মোহিত করেনি, এমন কথা বললে সত্যের অপলাপ হবে। তবে তাতে কর্তব্যচ্যুত হবার মত মানসিক অবস্থা ছিল না আমার। কাজেই হেরে গেল সে, যেতে হল সমরখন্দে।

ফেরার পথে কিন্তু আত্মসংযম একটু একটু করে কমে এসেছিল। হয়ত কার্যসিদ্ধির পর তারও আর প্রয়োজন ছিল না। আর এ বোধটাই বোধ হয় আমায় তার রূপ-লাবণ্যের বন্ধনে ধরা দিতে সাহার্য করেছিল। তিন দিনের পথ আসতে না আসতেই খাঁজাদী সোফিয়া আমার শয্যাসঙ্গিনী হল।

অল্প বয়স থেকেই নারী সম্বন্ধে কৌতুহল বলতে কিছু অবশিষ্ট ছিল না আমার। নারীদেহ উপভোগটা তখন আর পাঁচটা নিত্য-কর্মেরই অনুরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রয়োজন মত তা পেলেই চলত। সে নারী কে, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার বিশেষ প্রয়োজন হত না।

খাঁজাদী সোফিয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু তার ব্যতিক্রম ঘটল। তার সান্নিধ্য আর আশ্লেষের প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়ে থাকতাম। তার দৈহিক মিলন অবশ্য ছকে বাঁধা ছিল না। প্রতিদিন কোন

এক দুর্ভেদ্য দুর্গ জয় করার মত কসরৎ করতে হত। ফলে জয়ের উন্মাদনায় মিলন মহনীয় হয়ে উঠত।

সে ভাবটা অবশ্য মাত্র ক'দিন স্থায়ী হল। আমাকে সম্পূ করায়ত্ব করার পর তার নিজস্ব প্রকৃতি প্রকাশ হয়ে পড়ল। সে প্রথম অনুভব করলাম, কি উদগ্র হতে পারে নারীর কামনা। আর সেই বাঁধভাঙা স্রোতের মুখে যে কোন পুরুষ তৃণবৎ ভেসে যায়। তখন তার আহত পৌরুষ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সবকিছু তুচ্ছ করে রতিআহবে ঝাঁপিয়ে পড়তে যায়। বারবার হারে, কি বারবারই আবার জয়ের আশায় এগিয়ে যায়।

তার সেই কুহকের জালে জড়িয়ে পড়ে কেন রাফাত নিজের ভবিষ্যতকে বিপন্ন করে শুধু ওর দু'টি বাহু-বন্ধনে ধরা পড়েছে, কেন জাহাঙ্গীরকে ওর কামনা বাসনা চরিতার্থ করতে প্রাণ দিতে হয়েছিল, এই ক'দিনের মধ্যেই তা স্পষ্ট হয়ে গেল আমার কাছে। সঙ্গে সঙ্গে সেই পুরাণো ধারনাটাই আমার মনের মধ্যে দৃঢ়মূ হয়েছিল যে, ওকে তৈমুরই এক মাত্র বশ করতে পারে।

সমরখন্দে পৌঁছে তৈমুরের কাছে আমাদের পুরাণো রসিকতা ছলে জানালাম, 'দৌলত আবার ফিরে এসেছে তৈমুরের কাছে।'

তৈমুর বলল, 'দৌলত কি অন্ধ?'

বললাম, 'তৈমুর যখন লেঙড়া, দৌলতের অন্ধ হতে দোষ কি।'

দু'জনের মিলিত অট্টহাসিতে সারা ঘর কেঁপে উঠল।

খাঁজাদীর ব্যবহারের পেছনে দৈহিক আর্জি ছাড়া যে আরো কিছু আছে, সমরখন্দে পৌঁছানোর পর তা ধরা পড়ল। পথে

টেনে আমার কাছে সমরখন্দেও আসতে লাগল সে। কিন্তু নে তার অন্য মূর্তি। আমার কামনাকে জাগ্রত করে, শেষ র্তে নিজেকে সরিয়ে নিত সে। তৃষ্ণায় যখন কণ্ঠগত প্রাণ, তখনই জল থেকে তাকে বঞ্চিত করলে অনেক কথাই না যায়—এ তথ্য যে তার অজানা নয়, সেটা তখনই জানলাম।

আমি যখন ব্যাকুল আগ্রহে পূর্ণতা চাইতাম, সে তখন রাজ্যের না খবর জানতে চাইত। জানতে চাইত, কোথায় কোন দুর্গ ছে? সেখানে কত সৈন্য আছে? কোন আমীর পুরোপুরি রের পক্ষাবলম্বী নয়, অর্থাৎ কাকে কোথায় কিভাবে স্বপক্ষে ন তৈমুরকে পদচ্যুত করা যায়, তা স্পষ্টভাবে জানবার আগ্রহে থায় তার শক্তি আর কোথায় দুর্বলতা এই খবরগুলি সংগ্রহ তে চাইত।

প্রথম দিকে দু'চারটে আজেবাজে খবর দিয়ে তাকে খুসী রেছিলাম। কিন্তু তারপরই সে আমার চালাকী ধরে ফেললে। তি গোপনীয় খবর ছাড়া তাকে তুষ্ট করা যাবে না, এটা বুঝে লাম অতি সহজেই।

খাঁজাদী আমাকে আরও উত্তেজিত করতে চাইত, নিজের াভরণ বরতনুকে নানা মোহিনী ভঙ্গিমায় আমার সামনে প্রকাশ রে। এক এক সময় মনে হ'ত, আর বুঝি আত্মসম্বরণ করতে রব না। যা জানতে চায়, তা হয়ত বলে ফেলব। প্রাণপণে টা শেষ চেষ্টা করতে না করতেই আপন প্রবৃত্তির কাছে সমর্পণ করতে হ'ত তাকে।

এমনি করে বেশ কিছুদিন আবদুল্লার ওপর তারই অত্যাচারের রে সূক্ষ্মতর প্রয়োগ করে তাকে বশে আনবার চেষ্টা চলল

খাঁজাদীর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হার মানতে হ'ল তাকে। কয়েক দিনের মধ্যেই আমার লোকেরা খবর আনল, সে এখন কালামকে ধরেছে।

তৈমুরের সিপাহ-সালার কালাম। আমার ওপর একটা অহেতুক বিদ্বেষ ছিল তার। তৈমুরের প্রতি তার ভক্তি বা আনুগত্যের অভাব ছিল যে এমন নয়। কিন্তু আমার প্রতি বিদ্বেষের বশে তার হিতাহিত জ্ঞান অনেক সময় লোপ পেত। তখন তৈমুরের অনেক গোপন সংবাদও প্রকাশ করে দিত সে। হয়ত আমার প্রতি তৈমুরের স্নেহ ভালবাসা, নির্ভরশীলতা সব কিছুই তার অসহ্য মনে হ'ত। তৈমুর যে আমাকে তার চেয়ে বেশী আপনার মনে করত, এর জন্যও তার মনে কম জ্বালা ছিল না।

এই অহেতুক বিদ্বেষের কারণ প্রথমে বুঝতে পারিনি। কিন্তু কথায় কথায় একদিন জানলাম, তৈমুরের ধারণা, রহমানের মৃত্যু ঘটিয়েছিল কালাম। আর সেইজন্যই তাকে সে অতটা খাতির করত। তার উন্নতির মূল কারণটাও নাকি ঐ ঘটনাকে কেন্দ্র করে। সঙ্গে সঙ্গে কালামের মনোভাব দিবালোকের মত আমার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গেল।

সেদিনকার সেই ঘটনার নায়ক যে সে নয়, আমি, এ তথ্য কালামের বেশ ভাল করেই জানা ছিল। আর কোনক্রমে যদি কথাটা প্রকাশ হয়ে পড়ে ত তার মিথ্যাচারণের জন্য তৈমুর তাকে ক্ষমা করবে না, এ কথাও বেশ ভাল ভাবেই জানা ছিল তার। সেইজন্যই আমার পতন কিংবা আরো ভাল—মৃত্যুই চাইত সে।

বুদ্ধিমতী খাঁজাদী অতি সহজেই কালামের এ দুর্বলতা ধরে

ছিল। এবং বারবার সেই কোমল তন্ত্রীতে ঘা দিয়ে তার সবকিছু গোপন খবর অল্প দিনেই জেনে ফেলেছিল। তার া হয়েছিল যে, তৈমুরকে পরাজিত করতে হলে তার পৌরুষকে করতে হবে। আর সেই কাজে একনিষ্ঠ ভাবে আত্মনিয়োগ সফলও হয়েছিল সে। এবার তার বাধাবন্ধনহীন উদ্ধত রথের নূতন সোয়ার হ'ল তৈমুর নিজে।

কথাটা প্রথম শুনে প্রচণ্ড একটা ঘা খেয়েছিলাম। পুত্রবধূকে রে নিজের অঙ্ক-শায়িনী করল তৈমুর। কিন্তু বিচার করে তে গেলে জাহাঙ্গীরও ত আমার পুত্র-স্থানীয় ছিল। তার স্ত্রীর আমি যদি বিনা দ্বিধায় সহবাস করতে পারি, তবে তৈমুরের কাজ করতে বাধা কি?

তাছাড়া তৈমুর যে ঐ ধরনের লৌকিক বিধিনিষেধের কোন াই দিত না, এ তথ্যও আমার অজানা ছিল না। কিন্তু তবু কে বোঝাতে পারলাম না। অবশ্য তার কিছুটা যে ঈর্ষা বসে, কথা নিজের কাছে স্বীকার করতে দ্বিধা ছিল না। আর তাই মুরকে কিছু বলিও নি আমি।

তার কথাবার্তায়, চালচলনে সে বহুবার সুস্পষ্ট করে দিয়েছিল ব্যক্তিগত জীবনে যথেচ্ছাচারিতাই তার কাম্য। সুলতান বা সকরা লৌকিক নিয়মের ঊর্ধ্বে। এ তত্ত্ব সে মনে প্রাণে বিশ্বাস ত। এবং শুধু বিশ্বাসই করত না, প্রতি মুহূর্তের কাজে কর্মে সে র প্রমাণও দিয়েছে।

অবশ্য কিছু বললেও কথা শুনত না তৈমুর। চিরদিনই বেয়াড়া ঘোড়ার মতই একরোখা ছিল সে। যা তার মনে হ'ত করণীয়, শত বাধা নিষেধ সত্ত্বেও তা সে করেছে। আবার যা মনে হয়েছে অকরণীয়, অতি প্রিয়জনের অনুরোধ উপরোধেও তা তাকে দিয়ে কিছুতেই করানো যায়নি।

প্রথম যৌবনে কিন্তু দু'জন অন্তত তাকে নিজেদের মতাবলম্বী করতে পারত। সে প্রেয়সী আইজল, আর দুধভাই আবদুল্লা।

আইজলের প্রতি তৈমুরের প্রেমে বিন্দুমাত্র খাদ ছিল না। এমন কি সে-ই একমাত্র নারী, যাকে তৈমুর মনপ্রাণ যথাসর্বস্ব দিয়ে ভাল বেসেছিল। আইজলের মুখে হাসি ফোটাতে নিজের প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে পারত সে।

প্রমাণ, আতিক হোসেনের পক্ষ সমর্থন করে হুমজা খাঁর বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া। পরিণত বয়সে তৈমুর এ ধরনের হিসাবের ভুল করত না। আতিকের পক্ষে যাওয়া আর তৃণভূমির মাঝখানে শেষ ঘোড়াটির মৃত্যু হওয়া, দুটোই প্রায় একই ছিল। একথা সে পরে স্বীকার করেছে।

কিন্তু সেদিন মনে মনে বুঝেও তাকে মত বদলাতে হয়েছিল আইজলের চোখের জল মোছাতে। আইজলকে ভ্রাতৃপ্রেমের মূল্য হিসাবে নিজের প্রাণ দিতে হয়েছিল। তৈমুরের মনটা সেই থেকেই বজ্র কঠিন হয়ে উঠে।

তৈমুরের সেই প্রথম যৌবনের সঙ্গী আবদুল্লাও তাকে সে সময় নিজের ইচ্ছার বশবর্তী করতে পারত। কারণ তৈমুর তাকে শুধু বিশ্বাসই করত না, ভালও বাসত।

তারপর একটু একটু করে ভাগ্যের চাকা ঘুরেছে। তৈমুরের

...নের কেন্দ্র থেকে আবদুল্লাও ক্রমশঃ সরে যাচ্ছে। সে তখন ...রে পড়ছে তৈমুরের ইচ্ছাপূরণের যন্ত্র মাত্র। অন্ততঃ তৈমুর ...টাই ভেবেছে।

যন্ত্রকে প্রয়োজনের তাগিদে ব্যবহার করে যন্ত্রী। হয়ত তার ...তি আকর্ষণও থাকে। কিন্তু তার নির্দেশমত চলবার কোন ...কি খুঁজে পায় না সে। আর পায় না বলেই যন্ত্রের আর্তনাদে ...র্ণপাতের প্রয়োজনও অনুভব করে না।

রাফাতকে নিজের অবিমৃষ্যকারিতার চরম দণ্ড নিতে হ'ল। অবশ্য ...থমে অতটা বোঝা যায়নি। মনে হয়েছিল, ছেলেকে অবাঞ্ছিত ...নে করলেও, তাকে অন্য কোন শাস্তি দেবে না তৈমুর। তবে ...াকে সে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করত। আমিনার সনির্বন্ধ অনুরোধ ...াকে একটুও টলাতে পারত না।

ব্যবহারটা এ পর্যন্ত তৈমুরের উপযোগীই হয়েছিল। মনে মনে ...স কঠিনতর শাস্তির কথা চিন্তা করছে এটাই ভেবেছিলাম। কিন্তু ...ঠাৎ যখন কসাক নেতা সুলমানের সাহার্যার্থ উত্তরাপথের যাত্রী ...তৈমুর নিজের অগ্রগামী সৈন্যদলের নেতৃত্ব রাফাতকে দিল, তখন ...আশ্চর্য হয়েছিলাম খুব বেশী। পুত্রস্নেহ তৈমুরের যে অত বেশী ...ছিল না, তা জানতাম। তাছাড়া অপরাধীকে শাস্তি না দিয়ে ...পুরস্কার দেবার মানুষ ত নয় তৈমুর? মনে হয়েছিল, সমস্ত ...ব্যাপারটার মধ্যে সন্দেহজনক কিছু রয়েছে।

আর একটা জিনিষ আমার কাছে আশ্চর্যজনক মনে হল। এই ...প্রথম তৈমুর যুদ্ধযাত্রায় বেরোল তার বেগমমহল খালি করে। ...বোধ হয় এ যুদ্ধযাত্রাটা যে কিছুই নয়, তাই বোঝাতে চাইল

সবাইকে। আমি বারণ করলাম, যুদ্ধরীতির দিক থেকে ব্যবস্থাটা যে বিপজ্জনক এ কথা বোঝাতেও চাইলাম।

কিন্তু সে হেসে আমার কথা উড়িয়ে দিল। বললে, 'বুড়ো হয়ে পড়েছিস আবদুল্লা।'

আমার আশঙ্কাই শেষ পর্যন্ত সত্যি হয়ে দাঁড়াল। দিগন্ত-বিস্তৃত তৃণভূমির মাঝে নেকড়ের মত একদল শত্রু অগ্রবর্তী সৈন্যদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারা বীর বিক্রমে লড়ল এবং শেষ পর্যন্ত পরবর্তী সেনাদল এসে পড়তেই তাদের সাহার্যে তাড়িয়ে দিতে পারল আক্রমণকারীদের। আমাদের অতি সামান্য ক'জন হতাহত হলেও রাফাত নিজে অত্যন্ত মারাত্মক ভাবে আহত হ'ল।

পলায়িত শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনের নামমাত্র একটা চেষ্টা হয়েছিল বটে, কিন্তু কাউকেই ধরা গেল না। যেন ভোজবাজির মত সকলের চোখের সামনেই তারা উধাও হয়ে গেল। বিদেশীদের পক্ষে সে কাজ অবিশ্বাস্য মনে হ'ল।

রাফাতকে ধরাধরি করে যখন হারেমে তার মার তাঁবুতে নিয়ে যাওয়া হ'ল, প্রাণ তখন তার ওষ্ঠাগত। ছেলেকে ঐ অবস্থায় দেখে পাগলের মত ছুটে এল আমিনা। ছেলের পাণ্ডুর দেহটা কোলে তুলে নিল সে। মায়ের কোলে মাথা রেখে, মায়ের মুখের দিকে চেয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল রাফাত।

রাফাতের মৃতদেহ কিন্তু আমিনার কোল থেকে কেউ ছাড়িয়ে আনতে পারল না। পুত্রের মৃত্যু সে কিছুতেই স্বীকার করতে চাইল না।

বার বার জোর দিয়ে বললে সে, 'ছেলে তার ঘুমিয়ে পড়েছে। ...নিয়ে যেতে হবে তাকে।'

কারুরই বুঝতে বাকী রইল না যে, পুত্রশোকে সম্পূর্ণ উন্মাদিনী ...গেছে আমিনা বেগম। এ অবস্থায় তাকে সঙ্গে করে নিয়ে ...ওয়া বিপজ্জনক ছাড়া আর কিছু নয়। তাই ভাবলাম হয়ত ...সঙ্গী দিয়ে তৈমুর তাকে সমরখন্দে ফেরত পাঠাবে।

ফেরতই পাঠাল তৈমুর। তবে কোন সঙ্গী দিয়ে নয়। একটা ...ঘোড়া জুতে আমিনা বেগমকে তুলে দেওয়া হ'ল। সঙ্গে রইল ...ফাতের মৃতদেহ। সন্ধ্যার আলো-আঁধারিতে সম্পূর্ণ অপরিচিত ...থে নিঃসঙ্গ আমিনা বেগম তীর বেগে ছুটে গেল কোন অজানার ...থে।

দূরে পথের বাঁকে মিলিয়ে যাবার ঠিক আগে আমিনা ...গমকে শেষবারের মত দেখলাম। এক হাতে ঘোড়ার লাগাম ...রা, আর অন্য হাতে সস্নেহে ছেলের দেহটা জড়িয়ে ধরে একদৃষ্টে ...র দিকে চেয়ে আছে সে।

সেই তাকে শেষ দেখা। এরপর আমিনা বেগম আর রাফাতের ...তদেহের কোন খোঁজ আর পাওয়া গেল না।

তৈমুর খবর পেয়ে কিছুটা মৌখিক উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল, ...বং লোক মারফৎ খোঁজাখুজিও করেছিল। কিন্তু তার সবটাই যে লোক দেখানো এটা বুঝতে কষ্ট হয়নি। আসলে একই সঙ্গে অবাঞ্ছিত স্ত্রী ও সন্তানের হাত থেকে চিরতরে মুক্তি পেয়ে তৈমুর ...নে মনে খুসীই হয়েছিল।

আমিনা বেগমের কাহিনীর কিন্তু সেখানেই শেষ নয়। পরে ঐ অঞ্চলের লোকদের কাছে শুনেছি, প্রদোষে প্রায়ই দেখা যায় তার দ্রুত ধাবমান রথ। তাতে সন্তানের দেহ কোলে নিয়ে আমিনা বেগম বসে। রথ ছুটে চলেছে নিরুদ্দেশের কোন অনাদি অনন্ত পথে। মায়ের কিন্তু সন্তান ছাড়া অন্য কোন দিকে দৃষ্টি নেই। ঐ অঞ্চলের লোকের কাছে আমিনা বেগম মাতৃত্বের প্রতীক।

রাফাত বা আমিনা কারো সঙ্গেই আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল না। প্রকৃতপক্ষে আমিনা আমাকে হিংসাই করত। তৈমুরের কাছে তার চেয়ে আমার প্রতিপত্তি বেশী ছিল বলে বোধহয়। তবু তার বা রাফাতের এই শেষ পরিণতি আমার মনকে দুঃখ ভারাতুর করে তুলেছিল। বাইরে বেশীক্ষন অপেক্ষা করতে ভাল লাগেনি। সেদিন নিজের ডেরায় ফিরে এসেছিলাম শুধু শান্তির আশায়।

রহমার সেবায় হয়ত শান্তি পেতাম। কিন্তু শান্তি সেদিন আমার কপালে ছিল না। একটু পরেই আমার লোকরা আহত এক বন্দীকে নিয়ে এল। শুনলাম, সে নাকি আক্রমণকারীদের অন্যতম। শত্রুপক্ষের গুপ্ত খবর জানবার সুযোগ ত ছাড়া যায় না। তাছাড়া লোকটির জীবনীশক্তি ক্রমক্ষীয়মান। কাজেই তাড়াতাড়ি খবর জানার প্রচেষ্টায় রত হতে হ'ল।

আমার উদ্ভাবিত কয়েকটি প্রক্রিয়া প্রয়োগ করতেই ঈপ্সিত ফল লাভ করা গেল। লোকটি মুখ খুলল। তার কথা শুনে মনে হল, না শুনলেই বোধহয় ভাল হ'ত।

শুনলাম, সমরখন্দে মারাত্মক অপরাধে দণ্ডিত অপরাধীদের

এই সর্তে মুক্তি দিয়েছিল যে, সুযোগ সুবিধামত রাফাতের চড়াও হয়ে তাকে খতম করে দিতে হবে।

এ কথা বলার পর তাকে আর বাঁচতে দেওয়া যায় না। কিন্তু আগে তার সঙ্গীদের সম্ভাব্য গন্তব্যস্থলটা জানা অতি প্রয়োজনীয় ছিল। প্রথমে সে কথা সে বলতে চায়নি। কিন্তু আবদুল্লার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অত্যাচারের সুকুমার কলায় মোহিত না হয়ে উপায় ছিল না তার। কাজেই সামান্য প্রয়াসে প্রয়োজনীয় তথ্য জানা হয়ে গেল। তারপর জীবনের শেষ যাত্রায় তাকে স্বচ্ছন্দে রওনা করে দিলাম।

কাজ কিন্তু তখনও শেষ হয়নি। বাকীগুলো ব্যবস্থা করবার জন্য কয়েক বাছাই সঙ্গী নিয়ে রাতের অন্ধকারেই বেরিয়ে পড়লাম। আমার প্রয়াত পথপ্রদর্শকের বর্ণনা এত নিখুঁত ছিল যে, মাঝ রাতের আগেই তাদের আস্তানা খুঁজে পাওয়া গেল। তারা তখন নিশ্চিন্তে সুষুপ্তি মগ্ন।

সে ঘুম আর তাদের ভাঙ্গল না। চারিদিক থেকে ঘিরে বেড়া আগুনে পুড়িয়ে মারলাম তাদের। সেই ছাইয়ের গুঁড়ো তৃণভূমির প্রান্তে প্রান্তে বাতাসে ছড়িয়ে গেল বটে, কিন্তু তৈমুরের গোপন কথাটি গোপনই রয়ে গেল। সেই অবিশ্বাস্য ঘটনার একমাত্র সাক্ষী আবদুল্লার বুকের মধ্যে কথাগুলো কিন্তু আগুনের আখরে লেখা হয়ে রইল।

ঘটনার গুরুত্ব সম্বন্ধে তৈমুরকে ওয়াকিবহাল করতে গিয়ে বললাম, 'এ সব ব্যাপারে ওর আরো একটু সহ্য থাকা উচিত ছিল। এটা রীতিমত বোকামি হয়েছে। ব্যাপারটা আমার কাছে প্রকাশ

পেয়েছে তাই, নইলে কি হ'ত? পাঁচ কান যদি হ'ত খবরটা, তাহলে কি বিশ্রী ব্যাপারই না হ'ত! সবাই ভাবত, খাঁজাদীর প্রতি তুমি অবৈধ সম্পর্কের অংশীদার ছিলে বলেই এমনি করে তাকে সরিয়ে দিলে।'

হেসে উঠল তৈমুর, বললে, 'খাঁজাদীর কৃপা কনিকা যারা পেয়েছে, তাদের সবাইকে সরাতে গেলে আমার রাজসভাই যে একেবারে খালি হয়ে যেত। আমার ডান হাত বাঁ হাতও ভেঙে যেত যে।'

বুঝতে পারলাম তৈমুর আমার আর কালামের সঙ্গে খাঁজাদীর অবৈধ সম্পর্কের কথাটা জানে। কথাটাকে তাই ঘুরিয়ে দিলাম। বললাম, 'নিজের ছেলের ওপর এ রকম ব্যবহার শাসক হিসাবে তোমার নামে কলঙ্ক রটাবে।'

একটুখানি চুপ করে থেকে মুখ খুলল সে, 'লৌকিক বিচারের দিক দিয়ে কথাটা ঠিকই বলেছিস আবহুল্লা। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে পুত্রস্নেহ, ভ্রাতৃপ্রেম, নিষিদ্ধ সম্পর্ক, ন্যায়-অন্যায়, এ সব সাধারণ বিচারের মাপকাঠি প্রযোজ্য নয়, হতেও পারে না কোনমতে।'

অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম, 'কেন?'

'ছুনিয়াতে যুগে যুগে এমন মানুষ বার বার এসেছে, যার ওপর পৃথিবীকে নতুন রূপে সাজাবার দায়িত্ব থাকে। এ কাজ করতে হলে সমাজের বাঁধা নিয়মের গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ থাকা যায় না। তারা সমস্ত নিয়ম শৃঙ্খলার ওপরে। নিজের খেয়াল খুসীতে ছুনিয়াকে ভেঙে নতুন করে গড়ে তোলে। তারা এ কাজে যেখান থেকে যে বাধা আসুক, সব ভেঙে ফেলে। আর নিজের প্রয়োজনে ন্যায় অন্যায়, পাপ পূণ্য, ধর্মাধর্ম কোন বোধকেই প্রশ্রয় দেয় না।'

এমন মানুষের কথা ত শুনিনি?'

শুনেছিস, কিন্তু কান দিসনি। বেশ, বিচার করেই দেখ না, ...ার ইতিহাসে যতজন দ্বিগ্বিজয়ীর নাম লেখা আছে, প্রত্যেকেই ...া তলোয়ারের মুখে নয়া ছুনিয়া গড়ে গেছে। ছুনিয়ার মানুষ ...জো তাদের নাম সভয়ে সশ্রদ্ধায় উচ্চারণ করে।'

'তোমার কথা মানতে পারলাম না তৈমুর। দ্বিগ্বিজয়ীদের নাম ...াকে ঘৃণার সঙ্গে বলে থাকে শুনেছি। হয়ত তাদের ভয়ও করে। ...ন্তু শ্রদ্ধা? শ্রদ্ধা করবে কেন? কখনই না।'

'বেশ শ্রদ্ধা না হয় নাই করে, কিন্তু ভয়? সেটাই বা কম কি?'

'ভয়কে যদি বড় বলে মনে কর, বলার কিছু নেই। কিন্তু ...য় ত শুধু বাইরের খোলসটার। ভেতরে যে আত্মা আছে, ভয় ত ...াকে স্পর্শ করতে পারে না।'

'আর শ্রদ্ধা?'

'শ্রদ্ধা অন্য জিনিষ। আমরা যাকে শ্রদ্ধা করি, তাকে ...নুসরণের চেষ্টাও করে থাকি। কাজেই শ্রদ্ধা সেই মুক্ত আত্মাকে ...ুঁয়ে যায়।'

'বেশ, তোর কথাই না হয় মেনে নিলাম। কিন্তু তবু আমার ...মতা যে অতি প্রচণ্ড, এ কথা ত অস্বীকার করতে পারিস না।'

'না, তা পারি না বটে। কিন্তু তোমার শক্তিরও যে একটা সীমা আছে, এ তথ্যকেই বা অস্বীকার কর কি করে?'

'কে বলেছে আমার শক্তির সীমা আছে? আমি অসীম শক্তিধর। মানুষের জীবন মৃত্যু আমার হাতের মুঠোর মধ্যে। একটি আঙুল হেলালে তোর জীবনের ওপরেও সমাপ্তির অন্ধকার নেমে আসবে।'

'তাতেই কি প্রমাণ হয় যে তুমি অসীম শক্তিধর? তুমি আমার প্রাণটাই নিতে পারবে, আমাকে ত শেষ করতে পারবে না। আমার প্রিয়জনের মধ্যে আমি ঠিকই টিঁকে থাকব।'

'তোর প্রিয়জনদেরও যদি তোরই পথের পথিক করে দি?'

'তবুও আমার আমিত্ব চিরন্তন হয়ে থাকবে।'

'তোর আমিত্ব? কোথায় পেলি সে আমিত্ব আবদুল্লা? ছোট বয়েস থেকে আমার অনুগামী তুই। তিল তিল করে আমাকে অনুসরণ করেই বড় হয়েছিস। তোর নিজস্ব বলতে যা কিছু আছে তা আমারই দান। আমি তোর প্রভুই নই শুধু, তোর জগদীশ্বরও বটে। শুধু তুই কেন, আমার অধীনে যত মানুষ আছে, তাদের সকলেরই ভাগ্য নিয়ন্তা এই জগদীশ্বর! তোদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আমার ওপর ছেড়ে দিয়ে শুধু নদীর স্রোতের মত ভেসে চলবি আমারই নির্দেশিত পথে। আর এটাই তোদের ভবিতব্য। এবং এটাই হল তোদের কর্তব্যজীবনের স্থির অবিচল একমাত্র লক্ষ্য।'

আলোচনা সুরু হয়েছিল সাধারণভাবে, দুই পুরাণো বন্ধুর মধ্যে। কিন্তু কথার মধ্যেই সে রূপ পালটাতে সুরু করল। শেষদিকে আমার সঙ্গে যে কথা বলছিল, সে শাহানসা তৈমুর, না তার চেয়েও বড় আত্মসৃষ্ট জগদীশ্বর তৈমুর? আর তারই সামনে দাঁড়িয়েছিল তার দুধভাই আবদুল্লা, না অন্য কেউ? তার দীর্ঘদিনের সুখ দুঃখের নিত্যসঙ্গী আবদুল্লা, অথবা তার একান্ত অনুগত সেবক। আবদুল্লা নিশ্চয়ই নয়? তৈমুরের নৃশংসতম হুকুম-তামিলকারী জহ্লাদ আবদুল্লাও নয় হয়ত। যে দাঁড়িয়েছিল, সে হয়ত ঈশ্বর সম্মুখীন তুচ্ছাতিতুচ্ছ মানুষ আবদুল্লা।'

অনেক, অনেক বছরের মোহাঞ্জন এক নিমেষেই চোখ থেকে মুছে গেল। আমার প্রাণপ্রিয় তৈমুর যে আর নেই, এও প্রভাতের আলোর মত সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। বুঝলাম, আজকের তৈমুর মদগর্বী ক্ষমতান্ধ তৈমুরলঙ্গ।

দুনিয়াকে এ তৈমুর নিজের প্রয়োজনে দলে মথে পিষে তার শেষ বিন্দু পর্যন্ত সুখ আদায় করে ধুলোয় ফেলে দিয়ে যায়। ঠিক যেমন যৌবনারম্ভে লালসার তাড়নায় কামার্ত আমরা যূথবদ্ধ ভাবে অনিচ্ছুক নারীদেহ থেকে জীবনের শেষ বিন্দু পর্যন্ত নিঙড়ে নিয়ে, নিজেদের প্রয়োজন চরিতার্থ করতাম। আর পরে তাদের প্রাণহীন ছিন্নবিচ্ছিন্ন দেহটাকে পথের ধূলোয় ফেলে চলে যেতাম।

সেদিনের বারলা কুলতিলক আমীর তৈমুর! পিতার মৃত্যুর পর যে সামান্য একটা জায়গীর উদ্ধারের জন্য রহমানের আক্রমনে পাহাড়ের গুহায় চোরের মত আশ্রয় নিয়েছিল। কার বুদ্ধি এবং কৌশলে এই রহমানের মৃত্যু হয়েছিল? সে কি তৈমুরের বুদ্ধিতে?

সদলে যেদিন হুমজা খাঁর সঙ্গে তৈমুর হীরাত আক্রমণ করেছিল, সেটা ত খুব বেশীদিনের কথা নয়। নিজের প্রাণকে তুচ্ছ করে কে সেই দুর্গের সিংহদ্বার খুলে দিয়েছিল? সেও ঐ আমীর তৈমুর বোধ হয়। সেদিন যদি এই আবদুল্লা নিজের প্রাণকে তুচ্ছ করে এগিয়ে না যেত, তাহলে তৈমুর বা হুমজা খাঁর কারুই পক্ষে হীরাত জয় করা সম্ভব হত না।

এইত সেদিন! সওদাগর আবদুল্লা কুর্ফা দুর্গে তৈমুরকে হুমজা খাঁর বিরুদ্ধে কি ভাবে সাহার্য করেছিল? সেদিন এই আবদুল্লা নিজের জীবনকে বিপন্ন করে ঐ ভাবে যদি তৈমুরকে পথ দেখিয়ে না নিয়ে যেত, তবে কি আজ সে খাঁখানান হতে পারত।

আর আজ।

তৈমুরের অধিকারভুক্ত পৃথিবী থেকে আমরা তার শক্তিলালসার ইন্ধন সংগ্রহকারীমাত্র। তার কাছে একমাত্র সে নিজেই মূল্যবান। আমরা তার হাতের খেলনা মাত্র। যতক্ষণ তার ভাল লাগবে ততক্ষণ সে স্ত্রী-পুত্র-পরিজন, বন্ধু-আত্মীয়, আমীর-ওমরাহ, নফর-বাঁদী, আর প্রেমিকাদের নিয়ে খেলবে। যেদিন ভাল লাগবে না, সেদিন ভাঙা খেলনার মত ধুলোর মধ্যে ফেলে দেবে। ব্যক্তিগত প্রয়োজন ছাড়া কারো সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই তার।

ভাবতে ভাবতে একবার চমকে উঠি, এ কোন তৈমুর? আইজলের প্রেমময় স্বামী তৈমুর,—যে দু'টি ছোট্ট হাতের মধ্যে তার বিশ্বকে খুঁজে পেয়েছিল। যার বিরহে দিনের পর দিন সে চোখের জল ফেলেছে। এ ত সে তৈমুর নয়! জাহাঙ্গীরের মৃত্যুতে ছোট ছেলের মত যাকে কাঁদতে দেখেছিলাম। এও ত সে তৈমুর নয়। তবে এ কে?

ছেলেবেলা থেকে যে স্নেহের বন্ধনে তৈমুরের কাছে বাঁধা পড়েছিলাম, নিশ্চয়ই তার মধ্যে ঘুণ ধরেছিল। নয়ত ক্ষণিকের মধ্যে তা খান খান হয়ে পড়বে কেন? তৈমুর, যত শক্তিমানই হও তুমি, ঈশ্বরের দেওয়া আলো-বাতাস, গাছের পাতা-ফুল-ফল, পাখীর গান, নদীর স্রোত, এর কোনটির ওপরই যেমন তোমার আধিপত্যের কোন ক্ষমতা নেই, তেমনি আবদুল্লার ওপরও নেই। সে তোমার জন্য যা করেছে, প্রেমের বশেই করেছে। তোমার শক্তির কাছে সবাই নতি স্বীকার করতে পারে, সবাই তোমাকে ঈশ্বর বলে মানতে পারে, কিন্তু আবদুল্লা কোনদিনই তা করবে না। তার জীবন থাকতে নয়।

দপ করে জ্বলে উঠল তৈমুর। বললে, 'স্বীকার করবি না? জানিস, আগুনে একটু একটু করে ঝলসে তোর মুখ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করে নিতে পারি।'

হো হো করে হেসে উঠলাম আমি, বললাম, 'ভয় দেখাচ্ছ? কিন্তু ভুল করছ বন্ধু! জল্লাদ আবদুল্লা লোককে শাস্তি দিতে দিতে নিজের অনুভব শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। তাই যে শাস্তি সে অন্যকে দেয়, নির্বাক্যে সে শাস্তি নিজেও নিতে পারে। এই দেখ তার প্রমাণ।'

তাঁবুর দেওয়ালে আঁটা মশালটা এক টানে খুলে নিয়ে বুকের কাপড় সরিয়ে সেখানকার চামড়ার ওপর চেপে ধরলাম। পড়্‌পড়্‌ করে চামড়া পুড়তে থাকলেও হাসিমুখেই দাঁড়িয়ে রইলাম আমি।

মশালটা তৈমুরই কেড়ে নিল। জোর করে পোড়া জায়গায় মলম লাগিয়ে বললে, 'ঠাট্টাও বুঝিস না, কেমনতর হয়েছিস বলত।'

মুখে ঠাট্টা বললেও, কথাগুলো যে সে ধ্রুব বিশ্বাস থেকে বলেছে, এ তথ্য আমিও যেমন বুঝেছিলাম, আমি যে বুঝেছি সেও তা বুঝতে পেরেছিল।

তৈমুরকে আমার চেয়ে ত কেউ ভাল চিনত না। কাজেই তার চিন্তাধারার বিরুদ্ধাচরণ করার কি ফল হবে তা বুঝতে কষ্ট হয়নি। একটু একটু করে সে যে আমাকে তার উদ্যত দণ্ডের সামনে নিয়ে আসবে, এ কথাও বুঝতে পেরেছিলাম।

সমরখন্দে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে ছক মাফিক কাজ সুরু হয়ে গিয়েছিল। প্রথমে আমাকে নিজের ব্যক্তিগত সহকারীত্ব দিল

সে। এবং সৈন্যবাহিনীর পরিদর্শক হিসাবে আমার কাজ অন্য একজনের ওপর নস্ত করলে।

সমস্ত দরবার অবশ্য জানল, আভ্যন্তরীন সংবাদ সংগ্রহের দায়িত্বটাই এত বেশী জরুরী হয়ে উঠেছে এখন যে, একই লোকের ওপর অতিরিক্ত ভার দেওয়া অনুচিত। তাছাড়া আবদুল্লাও ঠিক আর যুবক নয়। এখন তাকে কিছুটা আরাম উপভোগের সুযোগ দেওয়া উচিত।

কথাগুলোর সঙ্গে সে এমনই একটা অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করল যে, সমস্ত দরবার হেসে উঠল। কিন্তু তা মাত্র কিছুক্ষণের জন্য। আমার ভ্রূকুটি দেখে অনেকের হাসি মাঝ পথে বন্ধ হয়ে গেল। কারণ তখনও আবদুল্লার ক্ষমতার সীমা সম্বন্ধে তারা ওয়াকিবহাল হয়নি।

অবশ্য হতেও বেশী দেরী হল না। কিছুদিন পরেই আভ্যন্তরীন সংবাদ সংগ্রহের কাজে প্রতিটি অঞ্চলের জন্য অঞ্চলপ্রধান নিয়োগ করল তৈমুর। আর তাদের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য আমার তথাকথিত এক সহকারী নিয়োজিত হ'ল। প্রথম প্রথম সে সমস্ত খবর আমার মাধ্যমে তৈমুরের কাছে পাঠাত। কিন্তু ক্রমেই দেখলাম, খবর সরাসরি তৈমুরের কাছে পৌঁছচ্ছে। শেষ অবধি আমি যে তার ওপরওলা, এ ভাণটাও আর রইল না।

বুঝতে বাকী রইল না যে ক্ষেত্র প্রস্তুত। উদ্যত খড়্গ নামলেই হয়। সব ব্যাপারটা জেনেও সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট হয়ে রইলাম। আত্ম-রক্ষার বিন্দুমাত্র ব্যবস্থাও করলাম না।

যত শক্তিহীনই হই না কেন, তৈমুরের কবল থেকে মুক্ত হবার ক্ষমতা তখনও আমার ছিল। কিন্তু জীবনে কেমন যেন বীতস্পৃহ হয়ে পড়েছিলাম। যে মানুষ দিনের পর দিন রক্ত নিয়ে গেণ্ডুয়া

...ছে, একদিন তারও রক্তের ওপর বিতৃষ্ণা জাগে। মনে হয়, ...অর্থহীন, অকারণ। নিজের রক্তে তখন শেষ তর্পণ করে সে। ...রও বোধহয় তাই হয়েছিল।

...এতদিন ন্যায় অন্যায়, প্রয়োজন অপ্রয়োজন বিচার না করে ...হীন অবর্ণনীয় নিষ্ঠুরতায় শিশু নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে ...ত করেছিলাম যে বিশেষ লক্ষ্যসাধনে, হঠাৎ তা আর বজায় ...না। আমার কাছে তৈমুরের উন্নতি আর জীবন পথের ধ্রুবতারা ...রইল না। অথচ দীর্ঘদিন ধরে আমার দৈনন্দিন জীবনের বেশ ...টা বড় অংশ শুধু ঐ কাজেই নিয়োজিত ছিল। শয়নে-স্বপনে-...-জাগরণে যে চিন্তা মনকে ঘিরে থাকত, হঠাৎ তা যেন উবে ...। এখন শুধু ভবিতব্যের জন্য প্রতীক্ষা করা ছাড়া করণীয় ...ই ছিল না।

আর একটা কারণও আমার নিষ্ক্রিয়তার পেছনে সক্রিয় ছিল। রহমা। ব্যাপারটা বিশ্লেষণ করে দেখতে গিয়ে নিজেই ...ক হয়েছিলাম সব চেয়ে বেশী।

জীবনের যাত্রাপথে বহু নারীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছে, কিন্তু তারা ...ই প্রায় ক্ষণ আগন্তুক। পারস্পরিক প্রয়োজন কখনও মিটেছে ... সংসর্গে, কখনও আবার তা কিছুদিন স্থায়ীও হয়েছে। তবে ...র্ক যখন ছিঁড়ে গেছে, তখন আর তার সামান্য যোগসূত্রও থেকে ...নি।

রহমাও এমনি ক্ষণ আগন্তুকের মত আমার জীবনে এসে ...ড়িয়েছিল। এতদিন ভেবেও এসেছি তাকে আগন্তুক বলে। ...র আজ। জীবনের প্রান্তদেশে এসে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে ...কিয়ে দেখতে গিয়ে চমকে উঠলাম। জীবনের প্রতিটি পাকে

পাকে, রক্তে রক্তে কেমন করে যেন জড়িয়ে গেছে রহমা। সেখা
থেকে তাকে ছাড়ানো আর সম্ভব নয়।

নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করলে তাকে নিশ্চিত শোচনীয় মৃত্যু
সম্মুখীন করতে হবে বুঝেই আরো নিশ্চেষ্ট হয়ে বসেছিলাম।

আমি বাঁচাতে চাইলেও রহমাকে বাঁচানো গেল না। নিয়তি
হাতে মানুষ ত ক্রীড়নক মাত্র। চাইলেই ত আর সে নিজে
ইচ্ছামত চলতে পারে না।

রহমার সঙ্গে তৈমুরের হারেমের যোগাযোগ তখনও অব্যাহ
ছিল। মাঝে মাঝে সে সেখানে বেড়াতে যেত। সেদিনও তেম
গিয়েছিল। ফিরে এল ফ্যাকাসে মুখে। নিজের ঘরে শুয়েছিলাম
হয়ত কিছু ভাবছিলাম। এমন সময়ে ছুটতে ছুটতে এসে
আমার গায়ের ওপর ভেঙে পড়ল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদ
কাঁদতে বললে, 'আবদুল্লা, পালাও, পালাও শীগগীর।'

অবাক হয়ে উঠে বসলাম। বললাম, 'কি হয়েছে পিয়ারী
মনে হচ্ছে তোমায় যেন জিনে তাড়া করেছে।'

কান্না থামিয়ে চেঁচিয়ে উঠল রহমা, 'এখনও তুমি হাসি ঠা
করতে পারছ? জান না, তৈমুর তোমার জান নেবার জন্য যে
উঠেছে।'

হাসতে হাসতেই বললাম, 'মানুষের জান নেওয়া ত খুব কঠি
কাজ নয় বিবি। আর তৈমুরের পক্ষে সে কাজটা খুবই সহজ
তার হুকুমে হাজার হাজার মানুষের জান ত আমার হাতেই শ
হয়েছে। কথাটা ত তোমার অজানা নয়।'

গর্জন করে উঠল রহমা, 'গর্ব করার মত খুব বড় কাজ

! লোকে যে সেইজন্যেই তোমায় জহলাদ বলে থাকে, তা
জান না? আর জানলেই বা কি। তৈমুরের জন্যে সুনাম
, সবই তোমার কাছে ত সমান। কিন্তু তৈমুর তোমায় কেমন
বাসে জান? একটা কুত্তার চেয়ে বেশী নয়। হ্যাঁ, তবে
কুত্তা। তোমার জানের দাম হাজার স্বর্ণমুদ্রা। আর সেটা
আমাকেই দিতে চায়।'

আর বলতে পারল না সে। মুখে হাত চাপা দিয়ে অঝোরে
তে লাগল।

তৈমুর নিজেকে অতি বুদ্ধিমান ভাবলেও তার চিন্তায় যে ত্রুটি
ছ বুঝতে কষ্ট হ'ল না।

প্রাথমিক হিসাবে সে অবশ্য ভুল করেনি। এ দুনিয়ায় সব
র বিশ্বাসের পাত্র বা পাত্রীই যে সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতা
র থাকে, এ কথা ত পরীক্ষিত সত্য।

লোভ মোহ মদ মাৎসর্য কাম এবং ক্রোধ—নানা রিপুর তাড়নায়
ষ সবচেয়ে প্রিয়জনের বুকে ছুরি বসাতে পারে। স্বামী স্ত্রীকে,
স্বামীকে, বাপ মা ছেলে-মেয়েকে, ছেলে-মেয়ে বাপ-মাকে,
ই বোনকে, বোন ভাইকে, আপন আপন স্বার্থের যূপকাষ্ঠে বলি
য়ে থাকে। সেই বিচারেই রহমার মত স্বৈরিণীকে অর্থলোভে
লুব্ধ করতে বাধেনি তার।

আইজলকে তৈমুর একেবারে ভুলে গেছে। তাকে মনে থাকলে
কটু ইতস্ততঃ করত বোধহয়। দিলশাদ বেগম আর খাঁজাদী
সাকিয়াকে দেখে তার মনে হয়েছে একনিষ্ঠতা নারীর মধ্যে
অনুপস্থিত থাকে। বিশেষ করে যারা সামান্য অর্থের বিনিময়ে

পুরুষ থেকে পুরুষান্তরে নিজের সব কিছু বিলিয়ে দেয়, তাদের মন থাকতে পারে, তারা যে কাউকে একনিষ্ঠভাবে ভালবাসতে পারে, সেটা তার পক্ষে ভাবা অসম্ভব ছিল।

বোধহয় তাই ছাপমারা মেয়ে রহমাকে সে প্রিয় প্রাণহন্ত্রী ব বলেছিল। তার এ অধঃপতন দেখতে আইজল যে বেঁচে নেই এ কথা ভেবে আনন্দ পেলাম।

কসবীদের সম্বন্ধে আমার ধারণা কিন্তু খুব স্পষ্ট ছিল। আমি বিশ্বাস করতাম, সর্বাধিক নিষ্কাম প্রেম শুধু ওদের মধ্যেই বিদ্যমান। ওদের প্রিয়জনের কাছে কোন প্রত্যাশা নেই, নেই প্রার্থনা। ওরা শুধু নিজেকে উজার করে দিতে চায়।

বিনিময়ে সবরকম বঞ্চনা-লাঞ্ছনা ওরা হাসিমুখে স্বীকার করে নেয়। নিজেকে তিল তিল করে পুড়িয়ে অনুপযুক্ত প্রিয়ের কাছে নিঃশেষে নিবেদন করে আপনার সব কিছু। অথচ তথাকথিত সমাজ তাদের কাছ থেকে শুধু নেয়। নিংড়ে শেষ রক্ত বিন্দুটুকু পর্যন্ত শুষে নেয়। আবার তাদের ঘৃণাও করে।

রহমা যে আমায় ভালবাসে তা জানতাম। কিন্তু কেন মনে হত যে, ওটা তার কৃতজ্ঞতার নামান্তর মাত্র। সাম বাহাদুরের হাত থেকে তাকে বাঁচাতে গিয়েছিলাম বলেই কৃতজ্ঞ হৃদয়ে সে আমায় আপন ভেবেছিল। এখন বুঝলাম সেটা উপলক্ষ্য হলেও আজ তার প্রেমে কোন খাদ নেই। সাগরের মতই তা গভীর, তেমনি তরঙ্গ সঙ্কুল।

কথাটা বুঝতে পেরে খুবই আনন্দ হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে দুষ্টু বুদ্ধিও মাথায় খেলে গেল। নিবিড় করে তাকে কাছে টেনে নিয়ে বললাম, 'জানি, আমার জানত তোমার নয়ন বাণে অনেকদিন

আগেই খতম হয়েছে। এখন আছে শুধু খোলসটা। খোলসটার জন্য অত ভাবনা কেন? তবু ত একটা জানের বদলে হাজার স্বর্ণ মুদ্রা পেলে এতদিনে। তুমি ত আচ্ছা বোকা মেয়ে। এমন সুযোগ পেয়েও, তুচ্ছ একটা জানের জন্য—'

আমার কথা শেষ করতে দিল না রহমা। মুখখানা হাত দিয়ে চেপে ধরল। প্রেমের জোয়ারে তখনকার মত আমাদের সমস্ত দুর্ভাবনা ভেসে চলে গেল।

তৈমুরের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের পর দেহে মনে একটা প্রচণ্ড অবসাদ অনুভব করছিলাম। এবার সেটাকে সরিয়ে দিয়ে ভবিষ্যতের কথা ভাবতে বসতে হ'ল। অবশ্য ভবিতব্যকে সুনির্দিষ্ট-ভাবে বোধ করা যায় না। অন্ততঃ প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা সে কথাই বলে থাকেন। তবে তাঁরা তাই বলে নিজেকে ভবিতব্যের হাতে সমর্পণ করেন না। অজগরের চোখের টানে পড়লে মৃত্যু সুনিশ্চিত। কিন্তু তবু নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করতে হয় বৈকি?

তৈমুরের বিশাল বাহুপাশ থেকে রহমাকে বাঁচানোর জন্যই বেশী করে সচেষ্ট হতে হ'ল। আমায় ক্ষমা করা তৈমুরের পক্ষে হয়ত সম্ভব। যতই হ'ক না কেন, আমি তার দুধভাই। সর্ব সময়ের সঙ্গী। এমন কি হয়ত মনের গভীরতম কোণে কোথাও এ বোধটাও জাগ্রত হতে পারে, একদিন আমি তার প্রাণরক্ষা করেছি। আমারই জন্য আজ সে শাহানসা তৈমুর। কাজেই সময়ে আমার উপর থেকে তার রাগটা পড়েও যেতে পারে।

কিন্তু রহমা? সে আদেশ অমান্যকারী। তা সে যেই হোক না

কেন, তাকে তৈমুর কিছুতেই ক্ষমা করবে না। মৃত্যু তার অবধারিত। কারণ, আমাকে মারা তার সাধ্যাতীত।

আর সে মৃত্যু কি বীভৎস! নৃশংসতা উদ্ভাবনে তৈমুর আবদুল্লার খুব পড়ে নয়। রহমার মরদেহের প্রতিটি অণু-পরমাণু তার নব নব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অত্যাচারে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে, এ কল্পনাটা করাও আমার কাছে অসহ্য মনে হ'ল।

বাঁচার একটা পথ তার ছিল—আত্মহত্যা। তবে স্বাভাবিক-ভাবে জীবনাবসানের আগে তার মৃত্যু আমার মনোঃপূত হ'ল না।

আর একটা পথও হয়ত ছিল, নিজে মরা। কিন্তু তাতে যে সে বাঁচবে, তার ত কোন নিশ্চয়তা ছিল না।

তাছাড়া আমার মনে হ'ল, একবার আত্মবিজ্ঞাপিত জগদীশ্বর তৈমুরের ক্ষমতার দৌড়টা দেখাই যাক না। আবদুল্লার বুদ্ধিটা একবার শানিয়ে নিয়ে তার চিরসঙ্গী তৈমুরের বিরুদ্ধে লাগানো যাক? তৈমুরের চিন্তা ভাবনা সব কিছুই যে আমার কাছে দর্পনের বুকে প্রতিভাত চিত্রের মতই স্বচ্ছ। ও কি ভাবছে, সেটা ঠিক করে নিয়ে তার বিপরীত কাজ করাটাই ত শ্রেয়।

ও অবশ্য আমায় চেনে। কিন্তু আমার মত ভাল করে নিশ্চয়ই নয়। আবদুল্লা চিরকালই তৈমুরের ছায়া। নিজের ছায়াকে আর কোন মানুষ চেনে?

একমাত্র ছায়া যখন থাকে না, দুনিয়ার তামাম মানুষের চোখের সামনে নিজের কি নেই, সেই অভাব বোধটা যখন জাগ্রত হয়, তখনই ছায়ার কথাটা আবছা আবছা তার মনে পড়ে। আমি যেদিন থাকব না, সেদিন হয়ত আমার সম্বন্ধে তৈমুর আজকের

য়ে একটু নরম মন নিয়ে ভাববে। হয়ত তখন অতীত দিনের সুখস্মৃতিগুলি একটু একটু করে মনেও পড়বে।

ওকে কি করতে হবে শিখিয়ে দিলাম। প্রথম দু'একদিন ও একেবারেই রাজী হবে না। তারপর একটু একটু করে মনের ভাব বদলাবে।

শেষ পর্যন্ত বলবে, সমরখন্দে আবদুল্লাকে মারার ব্যবস্থা করা খুবই কঠিন। কারণ এখানে ওর শত্রুর অভাব নেই। সব সময় সতর্ক থাকে সে। তাছাড়া এখানে ওর বহু বন্ধুও আছে। ওর কিছু হলে তারা হৈ-চৈ করবে। সেইজন্যই ওকে কোনও এক প্রত্যন্ত প্রদেশে কোন রাজকার্যের দায়িত্ব দিয়ে পাঠালে ভাল হয়।

আমি আবদার করে এবার ওর সঙ্গিনী হব। তারপর সুযোগ সুবিধামত যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা আমার পক্ষে মোটেই কঠিন হবে না।

রহমা প্রথমে কিছুতেই রাজী হল না। তার ধারণা হয়েছিল, আমি বোধ হয় তাকে বিশ্বাসহন্ত্রী হতে প্ররোচিত করছি। অন্ততঃ তার কথার ভাবে আমার তাই মনে হয়েছিল।

সে বললে, 'মুখে একটা কথা বললে মনে তার বাসা বাঁধতে দেরী হয় না। বলতে বলতে একদিন হয়ত সত্যি সত্যিই ইচ্ছা হবে তোমার ওপর হাত তুলতে। কিন্তু তাত আমি পারব না।'

মানুষ একটি দুর্জ্ঞেয় প্রাণী। যাকে বিশ্বাস করা যায়, মনে হয়, পরমাত্মীয় সে-ই কত সহজে বিশ্বাসঘাতকতা করে বসে। অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও ত সেই বিশ্বাসঘাতকতার বিষজ্বালা থেকে মুক্তি পায় না। বাপ হয়ে সন্তানের, সন্তান হয়ে বাপ-মার, স্বামী-স্ত্রীর,

স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে সব সময়েই ত বিশ্বাসঘাতকতা করছে, অন্যায় আচরণ করছে। অথচ দুনিয়ায় প্রিয়তম, মধুরতম, সুন্দরতম বস্তুগুলির সঙ্গেই সম্বন্ধগুলি জড়িত।

এদিকে যাদের কাছে কোন প্রত্যাশা থাকে না, যারা বিশ্বাস-ঘাতকতা করলে বিস্ময়ের কিছু থাকে না, তারা জীবনের শেষ রক্তবিন্দুটুকু পর্যন্ত দিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে বিশ্বাসের মর্যাদা রেখে থাকে।

অবশ্য আভিজাত্যের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি অন্যায় আচরণ বোধহয় অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সাধারণ মানুষের মধ্যে যে সব আচরণ অনুচিত বলে বিবেচিত হয়, অভিজাতরা তা করতে দ্বিধা পর্যন্ত করেন না। বোধহয় আভিজাত্যের আনুষঙ্গিকই অনাচার, অবিশ্বাস আর আত্মপরায়ণতা।

রহমাকে অত তত্ত্বকথা বলে কোন লাভ নেই। সে তা বুঝবেও না। অধিকন্তু উল্টো ধারণা করতে পারে। তাকে সরলভাবে বুঝিয়ে দিলাম, তৈমুরের হাত থেকে বাঁচতে হলে তার অধিকারের বাইরে কোথাও চলে যেতে হবে। ছোট খাট কোন রাজত্বে ঠাঁই পাওয়া কঠিন। আমাদের টিঁকে থাকতে হলে হিন্দুস্থানে আশ্রয় নিতে হবে।

আর সেইজন্যই আমাদের যাওয়া চাই হীরাতের দিকে। অথচ তুমি যদি সেদিকে যেতে চাও ত তৈমুর তোমায় সন্দেহ করবে। কাজেই এমনভাব দেখাবে যেন ক্যাথের দিকে বা সিরিয়ার দিকে তুমি যেতে চাইছ। তাহলেই ও তোমায় উল্টো দিকে পাঠাবে। আর আমাদের উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হবে।

রহমা ব্যাপারটা বুঝলে মনে হ'ল। তারপর চতুরঙ্গের

দান পড়তে লাগল। আস্তে আস্তে সে যেন তৈমুরের প্রস্তাব স্বীকার করে নিতে লাগল। তার চালচলন নিখুঁত হয়েছিল বলেই মনে হয়। তৈমুর হয়ত সন্দেহ করছে তাকে। তাই প্রতিদিনের প্রচেষ্টা তার কাছে অত্যন্ত পীড়াদায়ক হ'ত, এটা বুঝতেও পারতাম। কারণ ঘরে এসে নির্জীবের মত শুয়ে পড়ত সে।

তৈমুর অবশ্য আপন ক্ষমতা সম্বন্ধে এতই সুনিশ্চিত হয়েছিল যে, সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি সে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেনি। হয়ত আবদুল্লার ক্ষমতার দৌড় কতটা হতে পারে, সে তা ভুলে গিয়েছিল। নইলে আর একটু সাবধানতা অবলম্বন করত নিশ্চয়ই।

আবার এমনও হয়ত হতে পারে যে, সে বন্দী বিহঙ্গমের পায়ের শেকলটাকে কিছুটা আলগা দিয়ে মজা দেখতে চাইছিল। কি যে তার মনোগত অভিপ্রায় তা আজ আর বলা সম্ভব নয়। তার পরবর্তী ব্যবহার এখনও আমার কাছে দুর্জ্ঞেয় রহস্য বলেই মনে হয়।

এক সময় রহমা আমার প্রাণের অগ্রিম মূল্য হিসাবে এক থলি স্বর্ণ মুদ্রা নিয়ে এসে কান্নায় ভেঙে পড়ল। প্রতিটি মুদ্রা তার মনে শত বৃশ্চিকের জ্বালা ধরিয়ে দিল। সেগুলো তার বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার বলে যখনই মনে হয়েছে, তখনই ভেঙে পড়েছে সে।

অনেক কষ্টে, অনেক বুঝিয়ে শান্ত করি তাকে। বলি, 'ও অর্থ আমাদের উপকারেই লাগবে রহমা।'

কথাটা মিথ্যে বলিনি। তৈমুরের সুবিশাল এলাকার মধ্যে কোথাও আমাদের অর্থের প্রয়োজন হবে না, এ কথা সত্য। কিন্তু একদিন ত বাঁধা সড়ক ছাড়তে হবে আমাদের। তখন তৈমুরের

উদ্ধত দণ্ডের ঝুঁকি নিয়ে গলিপথ সুঁড়িপথে এঁকে বেঁকে চলার সময়ে স্বর্ণমুদ্রার প্রলেপত অত্যাবশ্যক হয়ে উঠবে।

এদিকে দীর্ঘদিন অতি বিশ্বস্ততার সঙ্গে তৈমুরের সেবা করে সামান্য যা কিছু অর্থ সংগ্রহ করেছিলাম, তার সামান্য ভগ্নাংশটুকুও সঙ্গে নেওয়া যাবে না। নিলে তৈমুর সন্দেহ করবে।

তখন রহমার স্বর্ণমুদ্রা আমাদের বাঁচাবার রসদ জোগাবে। রহমার ত নিজের অলঙ্কার বা স্বর্ণমুদ্রা নিতে কোন বাধা নেই। না নিলেই বরঞ্চ সন্দেহজনক মনে হবে।

নারীর অলঙ্কার যে প্রীতির, এ খবর তৈমুরের চেয়ে ভাল করে আর কে জানবে? স্বর্ণ বা ততোধিক মূল্যবান দ্রব্যসম্ভার যে নারীর পরম কামনার ধন, এ তথ্যত তার অজানা নয়।

সেই ত আমায় বারবার বলেছে, 'আবদুল্লা একটা রাজ্য জয় করতে গেলে যে ব্যয় হয়, একজন নারীকে জয় করতে তার চেয়ে অনেক বেশী পড়ে। একটা গোটা রাজ্য থেকে যা পাওয়া যায়, খাঁয়ের হারেম থেকে তার চেয়ে বেশী মেলে।'

কথাটা যে মোটামুটি সত্যি, এ কথা ত সবাই মানবে। প্রতিটি নারীর মধ্যে এক স্বর্ণপিপাসু মন লুকিয়ে থাকে। স্বর্ণ বলতে শুধু সোনাই বলতে চাইছি না, যে কোন মূল্যবান বস্তু-সম্ভারই তার মধ্যে ধরে নিচ্ছি। বহুমূল্য বস্ত্র, অলঙ্কার, স্বর্ণমুদ্রা,—এর বিনিময়ে প্রায় প্রতিটি নারীর কাছ থেকে সব কিছুই পাওয়া যেতে পারে।

অবশ্য ব্যতিক্রম যে নেই, তা বলতে পারি না। বললেও সত্যের অপলাপ করা হবে। এমন নারীও ত আছে, যার কাছে এ সবের

বিন্দুমাত্র মূল্য নেই। তারা অসাধারণ। সাধারণ মানুষকে অসাধারণের মাপকাঠিতে বিচার করা বিড়ম্বনা মাত্র।

এই সব বলে রহমাকে মোটামুটি শান্ত করলাম। এবার আমার ডাক পড়ল তৈমুরের কাছে। আমি যেতেই বিনা ভূমিকায় বললে সে, 'হীরাতের অবস্থা খুব ভাল নয়।'

হোসেনকে সরিয়ে দিয়ে যাকে সে সিংহাসনে বসিয়েছিল, সুযোগ মত সেও বিদ্রোহী হয়েছিল। তারপর থেকে হীরাতের শাসনকর্তার পদ যাকেই দিয়েছে, সেই বিদ্রোহী হয়েছে এক সময়। অর্থাৎ হীরাতের বিদ্রোহ একটা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপারে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। তৎকালীন শাসকও চিরাচরিত পথে চলেছে বলে খবর এসেছে।

তৈমুর বললে, 'এ বিষয়ে একটা সরেজমিনে তদন্ত করে আয়। যদি বুঝিস খবরটা সত্যি, তাকে কায়দা করে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সমরখন্দে ফিরিয়ে নিয়ে আসবি! আর যদি বুঝিস সত্যি নয়, যেমন আছে তেমনি রেখে চলে আসবি।'

অনেককাল এ ধরণের কাজ করা ছেড়ে দিয়েছি আমি। তবু সন্দেহ করার কিছু ছিল অনুরোধের মধ্যে। রহস্যজনক মনে হ'ল তখন, যখন শাসনকর্তার কাছে দেবার জন্য একখানা পরিচয়-পত্র দিলে।

সে সময় আবদুল্লাকে পরিচিত করাবার দরকার ছিল না। এ তথ্য সেও বেশ জানত, আমিও জানতাম। তবু কোনরকম সন্দেহ প্রকাশ না করে কুর্নিশ জানিয়ে চলে এলাম। বুঝলাম, আরো পাঁচজন অনুগামীর স্তরেই আমায় ফেলেছে তৈমুর।

সেইদিনই বিষপাত্র নিয়ে ফিরল রহমা। আমায় মারবার সহজতম উপায় হিসাবে আমার খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দেবার কথা বলেছে তৈমুর। সে রাতে শত আদর যত্নেও তার কান্না থামানো গেল না। আমায় মারবার জন্য বিষপাত্র হাতে নেওয়া আর আমায় বিষ দেওয়া তার কাছে সমার্থবোধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

যাত্রার দিন সমরখন্দের উপকণ্ঠ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেল তৈমুর নিজে।

তার পক্ষে ব্যাপারটা এতই অস্বাভাবিক যে সহগামী আমীর-ওমরাহদের মধ্যে কাণাকানি করতে শুনলাম—আবদুল্লার কি বরাত, শাহানসাহ স্বয়ং তাকে এগিয়ে দিতে এসেছেন।

অন্য একজন মন্তব্য করলে, 'যাদু জানে আবদুল্লা। নয়ত এত রকম অন্যায় করেও পার পেয়ে যায়।'

তাদের কথাগুলো শুনে মনে মনে হাসছিলাম। তৈমুরের মানসিকতা বোঝবার মত ক্ষমতাও নেই আহাম্মকদের। আবদুল্লার কর্মপদ্ধতি তৈমুরের পছন্দমত না হলে অনেক আগেই সে তা বন্ধ করে দিতে পারত। তা যখন দেয়নি, তখন তাদের বোঝা উচিত ছিল, কাজগুলো তার ইচ্ছানুযায়ীই হয়েছে।

তৈমুরের জন্য দুঃখ হ'ল। এই সব নির্বোধদের নিয়েই কাল কাটাতে হবে এবার থেকে। মন্ত্রী বা পরামর্শদাতা বলতে আর কেউ থাকবে না তার। মনের কথাও কারো কাছে খুলে বলতে পারবে না। হারেমের মধ্যেও তার মনের কথা বোঝবার মত কেউ নেই। বেগম মহলে দিলশাদ বেগম অঙ্গ দিতে পারে, হারেম পরিচালনা করতে পারে, কিন্তু মনের কথা ত বুঝতে পারবে না।

আমি চলে গেলে তৈমুর একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়বে। হয়ত ...ই বোধটা মনের মধ্যে উদয় হয়েছিল বলেই, তৈমুর আমাকে ...দায় দিতে এসেছিল। অনেক সুখ দুঃখের স্মৃতিভরা অতীতকে ...বারের মত কাছে নেবার ইচ্ছা হয়ত হয়েছিল তার।

বিদায় ক্ষণে সে বললে, 'দৌলত নিয়ে ফিরবি আবদুল্লা।'

হেসে বললাম, 'দৌলত কি অন্ধ?'

'হ্যাঁ, তৈমুর যখন লেঙড়া।'

একসঙ্গে দুজনের প্রাণখোলা হাসি সকলকে সচকিত করে ...ললে।

অতি পরিচিত পথে আস্তে আস্তে এগিয়ে চললাম। ...ন্তব্যস্থলই যেখানে অনির্দিষ্ট ছায়াময়, সেখানে তাড়াতাড়ি ছোটার ...কান অর্থই হয় না। বিশেষ করে তাড়াতাড়ি করলে তৈমুর ...প্তচর মারফৎ সে খবর পেয়ে সন্দেহান্বিত হ'ত। আমি শারীরিক ...ারণে দেশ ভ্রমণে যাচ্ছি, এই খবরটাই সারা দেশে প্রচারিত ...য়েছিল।

তৈমুরের উদ্ভাবনী শক্তির তারিফ করতে হয়। আগে থেকেই ...স রটিয়ে রেখেছিল যে, আমার শরীর অসুস্থ। তারপর পথে ...খন আমার ভালমন্দ কিছু হবে, তখন সে আমার অসময়ে ...ভাবিত মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করবে। কিন্তু ঘুর্ণাক্ষরেও কেউ ...ন্দেহ করবে না যে, সমস্ত মৃত্যুটাই পূর্বপরিকল্পিত।

কেমন সহজে তার পথের কাঁটা দূর হবে। অথচ তার জন্য ...কেউ তাকে দায়ী করতে পারবে না। এমন কি হয়ত তার ...শাকোচ্ছ্বাসের প্রাবল্যে সবাই ভাববে, কি ভয়ানক ক্ষতি হয়ে

গেল তার। চোখের জলের পেছনে সূক্ষ্ম হাসির আভাস কারো চোখে পড়বে না বোধহয়।

নিতান্ত ছন্নছাড়া মানুষও আপনার ছোট্ট ডেরাটাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়। নির্বাসিত ঘরে ফেরার স্বপ্ন দেখে। সেখানে স্বেচ্ছানির্বাসিতের দুঃখ সহজেই অনুমেয়। রহমার জীবনের বেশ একটা অংশ কেটেছে যাযাবরী বৃত্তিতে। সমরখন্দ তার জন্মভূমি নয়। তবু দু'দিনের ঘর ভাঙতেই অবসন্ন হয়ে পড়েছিল সে।

আর আমি?

যে মাটির সঙ্গে আমার নাড়ীর যোগ, যার প্রতিটি ধূলিকণা, প্রতিটি তৃণখণ্ড আমার একান্ত আপনার, সেখানকার সঙ্গে চির-কালের মত সমস্ত সম্পর্কচ্ছেদ হয়ে যাবে, ভাবতেই ব্যথায় সারা মন ভরে উঠেছিল। তাই শেষবারের মত জন্মভূমির সঙ্গে পুরোনো যোগটা ঝালিয়ে নিচ্ছিলাম।

বার বার দেখা যে সব বস্তু আর সহজে চোখে পড়ত না, তারাই আমার চোখের সামনে নতুন সুষমায় অপরূপ হয়ে উঠেছিল। দেখে দেখে আশ যেন মিটছিল না। উপরন্তু আরো যেন কাছে টানছিল আমাকে।

যাবার ইচ্ছা না থাকলেও যেতে হয়, এই ত দুনিয়ার নিয়ম। চলতে চলতে আমাদেরও পথ ফুরিয়ে এল। পথ যত শেষ হয়ে আসে, মন ততই ম্রিয়মান হয়ে পড়ে। তবু আমরা দু'জন দু'জনের ছিলাম তাই, নইলে বোধহয় পাগল হয়ে যেতাম।

হীরাত এখান থেকে দু'দিনের পথ। দূর থেকে বাঁধা সড়ক

লাম। তার আগে আমার সম্বন্ধে তৈমুর কি বলে হীরাত-শাসককে সতর্ক করে দিয়েছে, সেটা জানতে তৈমুরের খতটা খুলে একবার পড়ে নিলাম।

দেখলাম, অনুমানে আমার ভুল হয়নি। তৈমুর পরিষ্কার লিখে দিয়েছে:

আবদুল্লা যেন জীবন্ত অবস্থায় তোমার এলাকা থেকে ফিরে না আসে। অবশ্য যদি ও জীবন্ত অবস্থায় তোমার কাছে না পৌঁছায়, তাতে আমি মোটেই দুঃখিত হব না।

ওর সঙ্গিনী হিসাবে রহমা যাচ্ছে। তার সম্বন্ধে যথা অভিরুচি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পার। তুমি ও তোমার সঙ্গী সহযোগীরা তাকে বিলাসসঙ্গিনী হিসাবে ব্যবহার করলে অবাকও হব না, আর দোষও দেব না। কারণ এখনও পুরুষকে চঞ্চল করবার ক্ষমতা ওর আছে।

যাই হোক, ওকে আমি আর দেখতে চাই না। বাজারে বোধ হয় এখনও ওর ভাল দামই পাওয়া যাবে। আবদুল্লা যদি না পৌঁছায়, তাহলেও রহমা সম্বন্ধে ব্যবস্থার ব্যতিক্রম ঘটানোর দরকার নেই।

তৈমুরের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ থাকতে দেখে মোটেই অবাক হইনি। কিন্তু রহমার জন্য দুঃখ হয়েছিল। তৈমুরের আদেশ বিশ্বস্ততার সঙ্গে তামিল করলেও নিস্তার ছিল না তার। সে বিশ্বস্ততার পুরস্কারস্বরূপ তার দেহটাকে বহুজনের লালসার শিকার হ'তে হ'ত। তারপর সেই দলিত-মথিত দেহটাকে সর্বোচ্চ মূল্যদাতার হাতে সঁপে দেওয়াও বিচিত্র নয়। পণ্যের মত পাত্র থেকে পাত্রান্তরে ক্ষণিকের নেশা জাগানোর কাজও ত হবে।

হয়ত দীর্ঘদিন আমার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের জন্য সে ক্ষমতা তার বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কাজেই সাধারণ অবস্থার চেয়ে অনেক বেশী কষ্ট পেত সে।

আমার অন্ততঃ তাই ধারণা। তবে নারীচরিত্র মহাজনেরাও যেখানে বুঝতে পারেন নি, সেখানে আমার মত অর্বাচীন নারীচরিত্র বিশেষজ্ঞ বলে গর্ব করতে পারে না।

তাছাড়া নারীর বহু বিচিত্র রূপ আমিও কম দেখিনি। চিরকালের রঙ্গিনী বিলাসসঙ্গিনীকে আকস্মিকভাবে সব কিছু ছেড়ে সম্পূর্ণ ত্যাগব্রতী হতে দেখেছি।

আবার তার বিপরীত দৃষ্টান্তেরও অপ্রতুলতা নেই। এও দেখেছি, চিরদিনের কল্যাণী বধূ, স্নেহময়ী মা, ভিন্ন অবস্থায় পারিপার্শ্বিকের চাপে উজ্জ্বল বিলাসসঙ্গিনী তথা বহুজনবল্লভা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দোলকের এই দোলন বোধহয় সবচেয়ে স্বাভাবিক। তবু তার আকস্মিকত্ব বারবার আমাদের বিস্ময়াবিষ্ট করে। রহমার মত বহুবল্লভার সে রূপ অক্ষুণ্ণ থাকলেও বিস্ময়ের কিছু নেই। কিন্তু আমার পৌরুষ চায়, সে যেন আমার প্রতি একনিষ্ঠ থাকে। দ্বিতীয়ের প্রতি যেন কোন আকর্ষণ অনুভব না করে।

পুরুষের এই পৌরুষের দাবী পৃথিবীর বহু দুর্ঘটনার মূল, এ তথ্য অস্বীকার করা যায় না। আমার ওপর তৈমুরের ক্রোধের অন্যতম কারণ যে খাঁজাদী সোফিয়াকে সম্পূর্ণ নিজস্ব করে পাবার প্রত্যাশা, এ কথা আর কেউ না জানলেও আমি ত জানি।

তবে কালামও একই দোষে দোষী হয়েও তার বিষদৃষ্টিতে

ল না কেন? সোজা হিসাবে তার অর্থ করা হয়ত কঠিন। ন্তু তৈমুরকে আমি চিনি বলেই তার মনোভাব বুঝতে পেরেছি।

বহুবার দেখেছি তৈমুরকে নিজের হাতের খাবার প্রিয় ঘোড়াকে ওয়াতে এবং ভুক্তাবশেষ নিজের মুখে দিতে। তার মানসিকতা ল যে ঘোড়াটি তার নিজের, আর তাকে নিজের খাবারের ভাগ ওয়া নিজেরই স্বার্থে। পোষা কুকুরকেও ত অনেকে অমনিভাবে াদর করে থাকে। এমন কি তাদের চুমুও খায়। আবার সেই কুর যখন খেপে গিয়ে মনিবের হাতে দাঁত বসায়, তখন তাকে াবকে সোজা করতে মনিব ইতস্ততঃও করে না।

তৈমুরের কাছে আমি বা কালাম পোষা কুকুরের চেয়ে বড় কিছু য়। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা তার হুকুম মেনে চলেছি, ততক্ষণ াদর যত্ন অত্যধিক পরিমাণেই পেয়েছি। কালাম আজো তাকে েনে চলছে বলেই তার ওপর কোন ক্ষোভ নেই তৈমুরের। কিন্তু চিরদিনের বশম্বদ আবদুল্লা তৈমুরের বিরুদ্ধাচরণ করার জন্যই তাকে ইঁদুরের মত চেপে মেরে ফেলতে চাইছে তৈমুর। হয়ত পরে এরজন্য অনুতাপ করবে সে। কিন্তু এখন ক্রোধই বলবান যে!

হীরাতের আগেই বাঁধা সড়ক ছাড়লাম। এতদিন পরম আরামে রাজকীয় মেজাজে আসছিলাম। বাঁধা পথে নিয়মিত রত্বে সরাই। সেখানে আহার বা বিশ্রামের সবরকম ব্যবস্থা ছিল। পরম নিশ্চিন্তে ও আরামে বিশ্রাম নিয়ে যখন আবার যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলাম, তখন আমাদের জন্য তাজা ঘোড়া সাজিয়ে নিয়ে আসা হল।

শেষ সরাই ছেড়ে হীরাতের দিকে কিছুটা এগিয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে বাঁক নিলাম। দেখতে দেখতে পুরানো পথের পরিচিত নিশানা হারিয়ে গেল। একেবারে অপরিচিত পথে বার বার ভুল করে কোন রকমে সামনের পথে এগিয়ে চললাম।

সমরখন্দ থেকে বেরোবার আগেই ঠিক করেছিলাম, তৈমুরের হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয় হ'ল হিন্দুস্থানের কোন একটি নগর। অবশ্য তৈমুর যে অদূর ভবিষ্যতে হিন্দুস্থান আক্রমণ করবে না, এমন কোন নিশ্চয়তা নেই।

আর এও জানি, হিন্দুস্তানের ধনরত্নের খ্যাতি অনেকদিন থেকেই তাকে আকৃষ্ট করেছে। এবং সেইজন্যেই হিন্দুস্তান আক্রমণের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি, সেখানে যাবার বিভিন্ন পথঘাট, প্রধান প্রধান নগর আর দুর্গের বিবরণ, সুলতানের সৈন্যবল ইত্যাদির পূর্ণাঙ্গ বিবরণও সে সংগ্রহ করে রাখছিল।

সে সংগ্রহের খবর অবশ্য আমি জানতাম। আর সেইজন্যই সমরখন্দ থেকে বেরোবার আগেই পথঘাটের নকসা অতি সঙ্গোপনে নকল করিয়ে নিয়েছিলাম।

তৈমুর সম্ভবতঃ আমার এই গোপন সংগ্রহের খবর পায়নি। পেলে আমাদের হীরাতের দিকে যে আসতে দিত না, এ কথা সুনিশ্চিত। অবশ্য পরবর্তী ঘটনা থেকে জোর করে কথাগুলো বলতে পারছি না। হয়ত আমাকে নিয়ে সে খেলা করতে চেয়েছিল। দেখতে চেয়েছিল, আমার দৌড় কতটা।

সে যাই হ'ক, আগে থেকে আমি হিন্দুস্তান যাত্রার সহজতম

…ছকে নিয়েছিলাম। এর কারণ যেখানে জনপদ খুব অল্প, বিশেষ …র যে সহর বড় নয়, সেখানে তৈমুরের সৈন্যদের আমাদের …নুসরণ করা কঠিন হবে।

প্রথম জনপদে পৌঁছেই আমরা অতিরিক্ত দু'টি ঘোড়া, যাত্রা…থের উপযুক্ত রসদ আর একটি তাঁবু সংগ্রহ করলাম। সেগুলো …গৃহীত হবার পর আমরা মানুষের সান্নিধ্য এড়িয়ে আমাদের …ন্তব্যপথের দিকে এগোতে লাগলাম।

মানুষের সংস্পর্শ এড়াবার প্রধান কারণই হল যে, ক্ষুধার্ত …নকড়ের মত অনুসরণকারী তৈমুরের সৈন্যরা সহজে আমাদের …বর পাবে না। আর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা তৈমুরের …ধিকার থেকে বেড়িয়ে যেতে পারব, তবেই নিরাপদ হ'ব।

অনুসরণকারীরা সহজে সীমান্ত অতিক্রম করতে পারবে না। …র জন্য তৈমুরের বিশেষ আদেশ প্রয়োজন হবে। আর সে …আদেশ পৌঁছবার আগেই হিন্দুস্তানে আমাদের নিরাপদ আশ্রয় …টে যাবে। আর একবার হিন্দুস্তানের জনারণ্যে হারিয়ে গেলে তৈমুরের পক্ষে আমাদের খুঁজে পাওয়া রীতিমত কঠিন হবে।

শরতের শেষ, হেমন্তের সুরু। বাতাসে ঠাণ্ডার চাবুক শিস দিতে সুরু করেছে। সকালে ঘন কুয়াশায় চারিদিক ঢেকে আছে। পাঁচ হাত দূরের জিনিষ নজরে পড়ে না। এই অবস্থায় চড়াই উতরাইএর পরিচিত পথে চলা যে কি কষ্টকর, তা বলে বোঝানো যায় না।

তার ওপর পথ যদি অপরিচিত হয়, আর একজনকে যদি চারটে

ঘোড়া আর প্রচুর লটবহরসহ একটি নারী নিয়ে এগোতে হয়, তাহলে সেটা যে কি অসম্ভব ব্যাপার, তা একমাত্র ভুক্তভোগী ছাড়া আর কারো পক্ষে কল্পনা করা সম্ভব নয়।

হপ্তাখানেক পরেই মনে হ'ল, পেছন পেছন অনুসরণকারী সৈন্যরা এগিয়ে আসছে। দিনরাতের অধিকাংশ সময় ঘোড়ায় চেপে থাকার জন্য রহমা ক্রমেই অবসন্ন হয়ে পড়ছিল। এবং আমাদের ঘোড়াগুলোও ক্রমশঃ ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল।

এক সময় বাড়তি ঘোড়া দুটোর মায়া আমাদের কাটাতে হ'ল। এবং সেইসঙ্গে তাঁবু, কম্বল, আর বাড়তি মালপত্র সবকিছুই ছাড়তে হ'ল। ঝোলার মধ্যে কিছু ঝলসানো মাংস আর অতি প্রয়োজনীয় পাথেয় মাত্র সম্বল করে আবার আমরা রওনা হলাম।

হালকা হয়ে যাওয়ায় আমাদের গতিবেগ বেশ কিছুটা বেড়ে যায়। ফলে অনুসরণকারীদের অনেকখানি পেছনে ফেলে রেখে আসা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে।

কিন্তু সেটাত সাময়িক মাত্র। বিরুদ্ধ পক্ষ যেখানে নিয়মিত আশ্রয়, আর তাজা ঘোড়া পাচ্ছে, সেখানে আমরা খোলা মাঠে ক্লান্ত ঘোড়ার গায়ে গা দিয়ে কোনরকমে বিশ্রাম নিচ্ছি।

সারা রাত পরস্পরের সান্নিধ্যে এসে যতটুকু উত্তাপ সংগ্রহ করতে পারি, ততটুকুই আমাদের একমাত্র লাভ। সকালে যখন ধূসর কুয়াশার গায়ে আধো আলো আর আধো ছায়া জেগে ওঠে, তখনই আগের দিনের ক্লান্তি পুরো না কাটলেও আবার ছোটা সুরু করতে হয়।

প্রতিদিন বুঝতে পারছিলাম যে, তারা আরও নিকটে এগিয়ে

আসছে। তিল তিল করে আমাদের ব্যবধান কমছে, আর ভয়ঙ্কর মৃত্যু যেন তার করাল ছায়াটাকে আরো কাছে নিয়ে আসছে।

এমনি করে আরো ক'দিন কাটল। পনের দিনের দিন হঠাৎ আমার ঘোড়াটা মুখ থুবড়ে পড়ল। কিছুক্ষণ আমি পায়ে হেঁটেই চললাম, আর রহমা তার ঘোড়ার পিঠে। কিন্তু তার ঘোড়াও যখন একই পথের পথিক হ'ল, তখন এতদিন যার ছায়া দেখছিলাম, এবার তার স্পর্শও অনুভব করলাম। হিমশীতল সে স্পর্শে দু'জনেই চমকে উঠলাম।

রহমার দিকে তাকিয়ে একটু ম্লান হাসি হাসলাম। সমস্ত হিসাব ওলট পালট হয়ে গেল যেন। জীবন জুয়ায় হেরে গিয়ে প্রাণটা বাজেয়াপ্ত হয়ে গেলে দুঃখ নেই। কিন্তু কেমন ভাবে তা যাবে এইটাই ছিল দুর্ভাবনা। অবশ্য আমার নিজের জন্য নয়, রহমার জন্য।

সে বোধহয় আমার মনের কথা বুঝল। হেসে পোষাকের ভেতর থেকে বিষের পাত্রটা বার করে দেখাল। তার সম্বন্ধে ভাবনার হাত থেকে রেহাই পেয়ে মনে হ'ল, শরীরটা যেন হালকা হয়ে গেছে। নিজেকে অশেষ বলশালী বলে মনে হ'ল। হার মানবার আগে আর একবার শেষ দান ফেলতে চেষ্টা করলাম। সাধারণ পথ ছেড়ে রহমার হাত ধরে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে লাগলাম।

কিন্তু সেভাবেও বেশীক্ষণ যাওয়া গেল না। রহমার পক্ষে ওভাবে চলা প্রায় অসম্ভব মনে হ'ল। মনে হল, টলে পড়ে যাবে। প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও কাঁধে তুলে নিলাম তাকে। তারপর আবার এগোতে লাগলাম।

প্রথম প্রথম হালকা লাগলেও, ক্রমে তার দেহভার প্রচণ্ড চাপ দিতে লাগল। দেখলাম, নিজেকে সামলাতে পারছি না। শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে ভবিতব্যের হাতে আত্মসমর্পণ করে বসে পড়লাম। রহমার প্রায় অজ্ঞান দেহটা আমার বাহুবন্ধনেই ধরা রইল।

কতক্ষণ যে এভাবে দু'জনে পড়েছিলাম জানি না। যে মুহূর্ত অতিক্রান্ত হচ্ছিল, সেটাকেই নিজের জীবনের শেষ মুহূর্ত বলে মনে হচ্ছিল। অতীতের কত কথা স্মৃতির অতল থেকে ভেসে ভেসে উঠছিল। ছায়াবাজীর মত চোখের সামনে দিয়ে কত মানুষের মিছিল ছুটে গেল।

নিজের মা; তৈমুর আর আমার কৈশোরের জীবনযাত্রা; রহমার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ ও সেখানে সাম বাহাদুরের আবির্ভাব; তৈমুরের সঙ্গে তার দ্বন্দ্বযুদ্ধ; সামবাহাদুরের মৃত্যু; আহত তৈমুরের শুশ্রূষা; বাপের মৃত্যুর পর পলায়মান তৈমুরের সঙ্গ; নেকড়ের সাহার্যে রহমানকে হত্যা—আরো কত কি।

ভাবতে ভাবতে মনে হ'ল, মৃত্যুর অতি শীতল আলিঙ্গনপাশে বাঁধা পড়েছি। শীতলতা আমার পোষাক ভেদ করে ক্রমশঃই শরীরের ভেতরে প্রবেশ করছিল। চমকে উঠে দেখি, গুঁড়ো গুঁড়ো তুষার ঝরছে।

সময় হিসাবে তুষার পড়ার কথা অবশ্যই নয়। বোধহয় আমাদের বাঁচাতেই অসময়ে তার আগমন। পেছন ফিরে দেখি আমাদের সমস্ত পদচিহ্নই শুভ্র কোমল স্পর্শে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

আমাদের অনুসরণকারীরা এ অবস্থায় কিছুতেই পথে বেরোবে

না। তাদেরও ত জীবনের মায়া আছে। তুষারপাত শেষ হয়ে গেলে, তারা যখন আবার আমাদের অনুসরণ করতে সুরু করবে, তখন আমাদের যাত্রাপথের কোন হদিসই খুঁজে পাবে না।

বাঁচবার সুযোগ পেয়েছি সত্যি, কিন্তু খোলা আকাশের নীচে বসে থাকলে ত মারা যাব। মাথা গোঁজবার মত আশ্রয়ের জোগাড় করতে হবে যে।

তাড়াতাড়ি রহমাকে তুলে নিয়ে এগোতে থাকি। বেশ কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরে ক্লান্তিতে যখন শরীরটা ভেঙে পড়েছে, ঠিক তখনই ছোট্ট একটা গুহা দেখতে পেলাম।

সেটিতে একজন বেশ স্বচ্ছন্দেই থাকতে পারে। কিন্তু দু'জনের কষ্ট হয়। রহমাকে ভেতরে ঢুকিয়ে ভাল করে শুইয়ে দিই। তারপর গুহার মুখটা নিজে আটকে বসি। সে অন্ততঃ কিছুটা উত্তাপ পাবে।

প্রকৃতি যেন আমাদের জন্যই অপেক্ষা করছিল। আমরা গুছিয়ে বসতে না বসতেই আকাশ অন্ধকার করে পেঁজা তুলোর মত ঝরঝর করে তুষার ঝরতে থাকে।

দেখতে দেখতে পথ-ঘাট সব সাদা হয়ে যায়। সব চিহ্ন মুছে একাকার হয়ে যায়। গুহা থেকে আমার শরীরটা অর্ধেক বার করে প্রকৃতির রঙ্গ দেখি। গায়ে মাথায় তুষারকণা ছিটকে ছিটকে পড়ে। শরীরের উত্তাপে সেগুলো গলে জল হয়ে যায়। আবার বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় নতুন করে জমে ওঠে।

অনেক অনেকক্ষণ ধরে তুষার পড়তে থাকে। তারপর আস্তে

আস্তে থেমে যায়। কুয়াশার আবরণটাও একটু একটু করে হালকা হয়ে মিলিয়ে যায়। অন্ধকার কিন্তু কাটে না। বুঝতে কষ্ট হয় না যে সন্ধ্যা নেমেছে। অর্থাৎ গুহাতেই রাতটা কাটাতে হবে।

সরে বসে ঝোলার ভেতর থেকে ঝলসানো মাংসের একটা টুকরো আর কুমিসের পাত্র বার করে নিই। নিজে খাবার আগে রহমাকে খাওয়াতে গিয়ে দেখি, সারা শরীর তার থরথর করে কাঁপছে। খাওয়ানো মাথায় ওঠে। তাড়াতাড়ি চেপে ধরি তাকে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। বাড়তি সামান্য যা কিছু কাপড় ছিল, সব দিয়েও যখন কাঁপুনি থামানো গেল না, তখন নিতান্ত নিরুপায় হয়ে নিজের গায়ের পশমী আঙরাখাটা খুলে ওকে চাপা দিয়ে দিলাম।

এবার যেন অনেকটা শান্ত হয় সে। একটু পরে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে আসে। বুঝতে পারি, সে ঘুমিয়ে পড়েছে। গায়ের চাপাটা তুলে নিতে সাহস হ'ল না, পাছে ঘুম ভেঙে যায়। নিজে শীতে কাঁপতে কাঁপতে বসে থাকি। আর কুমিসের পাত্রে ঘন ঘন চুমুক দিয়ে শীত কাটাবার ব্যর্থ চেষ্টা করি।

এমনি করে বসে থাকতে থাকতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, জানি না। এক ঘুমেই রাত কাবার হয়ে যায়। ঘুম যখন ভাঙ্গল, প্রকৃতি তখন উচ্ছল হাসিতে চারদিক ভরে তুলেছে। ধবধবে সাদা তুষারের গায়ে আরো অজস্র সোনালী রেখার মায়ায় সে এক অপরূপ শোভা হয়েছে। ক্ষণিকের জন্য সব কিছু ভুলে একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে রইলাম।

চমক ভাঙ্গল রহমার ডাকে। ফিরে দেখি, উঠে বসেছে সে।

তাকে দেখে মনে হ'ল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই দেখি কেমন একটা বিস্ময় ফুটে উঠেছে তার চোখে মুখে।

হেসে বললাম, 'কি পিয়ারী, আমাকে এমনভাবে দেখবে তা বোধহয় ভাবতেও পারনি। ভেবেছিলে এতক্ষণ নেকড়েরা হয়ত ছিঁড়ে খেয়েছে তোমায়। আর আমার বোধহয় অন্ধকূপবাসের আদেশ হয়েছে। কিন্তু আবদুল্লাকে মারা কি অতই সহজ।'

আমার কথা শুনে হাসতে গেল সে। কিন্তু হাসির বদলে ফুটে উঠল আর্তনাদ, 'এ কি করেছ?'

অবাক হয়ে বললাম, 'কি করেছি আবার?'

'কালকের ঐ ঠাণ্ডায় পাতলা একটা কুর্তা পরে বসেছিলে? পশমী আঙরাখাটা গেল কোথা।'

বলতে বলতে নিজের দিকে তাকিয়ে শিউরে ওঠে সে। বলে, 'অ্যাঁ, আমার গায়ে তোমার আঙরাখাটাও চাপিয়েছ। আর সারা-রাত এই ঠাণ্ডায়—।' হঠাৎ ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলে সে। 'এমনি করে তিল তিল করে আমায় দগ্ধে না মেরে একেবারে গলা টিপে কাজ শেষ করে দিলেই ত পার। তুমিও বাঁচ, আরআমিও বাঁচি।'

রীতিমত বিব্রত বোধ করি। আদর করে বলি, 'আচ্ছা পাগল ত তুমি! আরে বাবা তোমার ঐ দেহলতাটির ওজন ত কম নয়। কাল যে অতটা পথ তোমায় বয়ে নিয়ে এলাম, তাতে কি রকম কষ্ট হয়েছিল একবার ভেবে দেখ দেখি। তারপর এমন গরম হতে লাগল যে আঙরাখাটা খুলে ফেলতে হ'ল। কিন্তু খুলে রাখব কোথায়? এখানে তুমি ছাড়া আমার আর কোন রাখবার জায়গাও নেই। তাই একান্ত বাধ্য হয়ে তোমার গায়েই চাপাতে হ'ল। এখন দাও ওটা পরেনি।'

আড়রাখাটা পড়তে গিয়ে সারা শরীরে একটা অসহ্য ব্যথা অনুভব করলাম। কথাটা রহমা যদি জানতে পারে রীতিমত হৈ-চৈ সুরু করবে। তাই তাকে কিছু না বলেই উঠতে গেলাম, কিন্তু মনে হ'ল শরীরে কোন জোরই নেই যেন। তবু জোর করে উঠে দাঁড়ালাম।

বাইরে তখন রোদের তেজ বেড়েছে। তুষারের শুভ্রতা যেন সাদা আগুনে রূপান্তরিত। সেদিকে তাকাতে তাকাতে হঠাৎ যেন মনে হ'ল, একটা আগুনের রেখা তীরের মত এসে আমার চোখের মধ্যে ঢুকে গেল।

আমার ধারনা ছিল, যে কোন শারীরিক যন্ত্রণা সহ্য করবার মত ক্ষমতা আমার আছে। কিন্তু এই তীব্র যাতনা আমার কাছেও অসহনীয় লাগল। তাড়াতাড়ি দু'হাত দিয়ে চোখ দু'টো কচলে নিলাম। কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। চোখের যন্ত্রণা ক্রমশঃ বাড়তেই লাগল।

চোখ বন্ধ করে চীৎকার করে উঠি। মনে হ'ল, বন্ধ দু'চোখের সামনে রামধনুর সাতরঙ খেলে বেড়াচ্ছে যেন।

বসে পড়তেই রহমা নিজের কোলে মাথাটা তুলে নিল। তারপর দু'হাত দিয়ে আমায় জড়িয়ে ধরে বারবার জিজ্ঞাসা করল, 'কি হ'ল আবদুল্লা, অমন করছ কেন?'

কি যে হচ্ছে, তা কি আমিও বুঝতে পারছিলাম। অসহ্য যন্ত্রণায় শুধু ছটফট করছিলাম। আর আহত প্রাণীর মত গোঙাচ্ছিলাম।

যন্ত্রণা ক্রমেই বাড়ছিল। মনে হচ্ছিল চোখ দুটো বুঝি খসে

পড়বে। প্রতি মুহূর্তেই মনে হচ্ছিল যে, জীবনের শেষ মুহূর্ত বুঝি এসে গেছে।

ভাগ্যবিধাতার বোধ হয় এ এক বিচিত্র রসিকতা! জীবনের মায়া যখন ত্যাগ করেছিলাম, মৃত্যুকে যখন দৃঢ় আলিঙ্গনে বাঁধবার জন্য তৈরী হচ্ছিলাম, তখনি প্রাকৃতিক দুর্যোগ নতুন আশার আলো দেখিয়েছিল। ভেবেছিলাম, নতুন করে বোধহয় বাঁচা যাবে। কিন্তু ঠিক সেই সময়েই অপ্রত্যাশিতভাবে এই আঘাত এল।

আমার শরীর সম্বন্ধে অনেকের কাছে বারবার একই মন্তব্য শুনেছি, আবদুল্লার শরীর নিখাদ লোহা দিয়ে তৈরী। পিটে পিটেও তার ওপর দাগ পড়ে না।

কথাটা অবশ্য কিছুটা অতিরঞ্জিত। কারণ দুনিয়ার কোন নিখাদ জিনিষই সর্বংসহ হয় না। খাঁটির নিয়মই হ'ল নমনীয়।

দুনিয়াতে যারা খাঁটি মানুষ বলে পরিচিত হয়েছেন, তাঁরা ত চিরকালই নমনীয়। বন্যার স্রোতের মত কত কি চিন্তা ভাবনা তাঁদের ওপর এসে আছড়ে পড়ে, আবার স্রোতের মত তা ভেসেও যায়। কিন্তু উদ্ধত বনস্পতি যেখানে পেছনের টানে ভূমিশয্যা গ্রহণ করে, সেখানে তাঁরা আগের মতই মাথা খাড়া করে দাঁড়িয়ে থাকেন।

খাঁটি লোহাও তেমনি নমনীয়। আর সেইজন্যই তা দিয়ে অস্ত্র তৈরী হয় না। অস্ত্র তৈরী করার জন্য খাদ মিশিয়ে ইস্পাত তৈরী করতে হয়। আর সেই ইস্পাতেই শ্রেষ্ঠ অস্ত্র তৈরী হয়ে থাকে।

আবদুল্লার শরীর আর মন দুই-ই ইস্পাতের। ঘা লাগলে

সেখান থেকে শুধু আগুনই বেরোয়। জল নামে না। এবার কিন্তু সে শরীরে সত্যিকার ভাঙন ধরেছিল। মনও দুর্বল হয়ে পড়েছিল নিশ্চয়ই। নইলে চোখ দিয়ে জল নামবে কেন?

বহুক্ষণ পর আস্তে আস্তে যেন চেতনাও লোপ পেল। আচ্ছন্নের মত পড়ে রইলাম। আর অবরুদ্ধ মনের মধ্যে থেকে ছাড়া পেয়ে নানা চিন্তা তাদের প্রভাব বিস্তার করতে লাগল।

মনে পড়ল কৈশোরের কথা। প্রথম যেদিন আমরা দু'জনে হাতকাটা আকিলের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে একটা লম্বা দৌড় দি', সেদিনই আমার পথ চেনার হাতে খড়ি। তৈমুর কিন্তু পথ চেনবার কোন চেষ্টাই করেনি। ডেকে শুধু বলেছিল আমায়, 'ভাল করে শিখে নে আবদুল্লা। পরে যেন আমায় অসুবিধায় ফেলিস না।'

আকিল ছিল একজন ভূতপূর্ব সৈন্য। কোন এক যুদ্ধক্ষেত্রে হাতটা বিসর্জন দিয়েছিল। সে অন্ততঃ এ কথাই বলত সবাইকে।

তৈমুর অবশ্য বলত, 'লড়াই করতে গিয়ে নয়। চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে হাতটা বরবাদ হয়ে গেছে ওর।'

হয়ত তৈমুরের কথাটাই সত্যি! হয়ত কেন, নিশ্চয়ই। বয়স কালে আকিল চোরের দলে মিশেছিল যে। তার কথায় চৌর ভ্রাতৃত্বের মধ্যে প্রচলিত শব্দসম্ভার প্রায়ই প্রকাশ পেত। এ ছাড়াও কখনো কখনো তার হাত সাফাইয়ের কৌশলও দেখেছি। সন্দেহ তখন সন্দেহমাত্র থাকেনি, সত্য বলেই মনে হয়েছে।

কিন্তু তবু একদিক দিয়ে সে ছিল আমাদের শিক্ষাদাতা। সেইজন্য তাকে কিছুটা সম্মান দিতে হ'ত আমাকে।

তৈমুর কিন্তু কোনদিন সে সম্মান তাকে দেয়নি। সে যেন

জের ন্যায্য প্রাপ্য নজর হিসাবে গ্রহণ করছে এমন একটা ব দেখাত। ফলে আকিলকে খুসী করার জন্য যে সব করণীয় জ ছিল, তার সবটাই আমার কাঁধে চাপত। আমি কিন্তু ছুই মনে করিনি। বরং এতে আমার লাভই হয়েছিল। কিলের অধিগত সমস্ত বিদ্যাই সে নিঃশেষে আমায় দান রেছিল।

তৈমুর কিন্তু আপন স্বার্থে চোরের দলে মিশতে ইতস্ততঃ রেনি। বরং তাদের সাহায্য লাভের জন্য যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ রেছিল। অবশ্য সেইটাই তৈমুরের জীবনের একটা বড় বৈশিষ্ট্য।

মনে পড়ল সামবাহাদুরের কথা। সেই প্রচণ্ড সংঘর্ষ। আর ই সঙ্গে সামবাহাদুরের মৃত্যুকালীন বিস্মিত হতভম্ব দৃষ্টি। আরও নে পড়ল তরুণী রহমাকে, যে তার ভীতিবিহ্বল চোখে আমায় াকরে ধরে দাঁড়িয়েছিল।

প্রথম দেখা সেই লজ্জানমিতা অথচ দৃঢ়প্রত্যয়সম্পন্না তরুণী মণী। জীবনের কঠিন বাস্তব যার দেহে বা মনে কোন রকম স্পর্শ রতে পারেনি। যাকে দেখলেই মনে হত, সে যেন আত্ম মাহিত। সঙ্গোপনে আপন প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে সে যেন জীবন দেবতার আরতিতে মগ্ন।

মনে পড়ল প্রথম হত্যার কথা। কে সে? কি তার নাম? কমন দেখতে ছিল তাকে? সে সমস্ত তথ্যই আজ বিস্মৃতির তলে তলিয়ে গিয়েছিল। সেই মুহূর্তের অজ্ঞান অবস্থায় যা মনে ড়ল, তা কোন ব্যক্তি বিশেষের ছবি নয়। দিনের পর দিন না মানুষের যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখচ্ছবি যেন। তাদের কাতর আর্তনাদ

আমার মানসপটে যে রেখার সৃষ্টি করেছিল, তারই মিলিত রূপ কায়া ধরে আমার বন্ধ চোখের ওপর এসে দাঁড়িয়েছিল।

মাঝে মাঝে সে ছবির মুখাবয়বের পরিবর্তন ঘটছিল। কখনো বা অতি পরিচিত, কখনো আবার সম্পূর্ণ অপরিচিত। কখনো সে পুরুষ, কখনো নারী। কখনো তার দেহ কশাঘাতে-জর্জরিত, কখনো আবার ধর্ষিত, লাঞ্ছিত।

ছায়াবাজীর মত একের পর এক সে ছবিগুলো চোখের ওপর ফুটে উঠছিল। আর কাঁটার মত বিঁধছিল তা মনের দর্পণে।

একটি একটি করে হাজার হাজার নরমুণ্ডের যে বেদী একদিন গড়ে তুলেছিলাম, সেই দেহহীন মুণ্ডগুলো হঠাৎ আজ জীবন্ত হয়ে উঠল। আর আপনার খেয়াল খুসীতে আমার চার পাশে ঘুরে বেড়াতে লাগল। আপন মুণ্ডের সন্ধানে সেই হাজার হাজার কবন্ধও যেন পাগলের মত এদিকে সেদিকে ছুটে বেড়াচ্ছিল। তাদের মধ্যে যেন লুকোচুরি খেলা চলছিল। এক একবার একটি দেহ কোন একটি মুণ্ডের নাগাল পায়। কিন্তু যখনই দেখে যে সেটা তার নয়, ছেড়ে দিয়ে আবার সে নতুনের সন্ধানে ছোটে।

এগুলো যে মনের গহনে কাঁটার মত বিঁধেছিল, এত কাল তা বুঝতেও পারিনি। সেদিন সেই আধো ঘুমে আধো জাগরণে তাদের প্রতিটির খোঁচা রক্তাক্ত করে তুলছিল আমার মনকে। বোধহয় এই-ই হল পাপের প্রায়শ্চিত্ত!

কিন্তু যে ছবি বারবার স্মৃতিপটে উদিত হয়ে শত বৃশ্চিকের দংশন জ্বালা অনুভব করাচ্ছিল, তা হ'ল কুরফার দুর্গাভ্যন্তরে

আবদুল রসিদ সওদাগরের ঘরের মেঝেতে পড়ে থাকা দু'টি দলিত-মথিত দেহ।

দীর্ঘদিন ধরে সজ্ঞান মনের ঠিক নীচেই অবস্থিত সে দু'টি মৃত্যুর স্মৃতি শয়নে-স্বপনে-ঘুমে-জাগরণে বারে বারে এসে হানা দিয়েছে। আর জল্লাদ আবদুল্লার পাষাণ মন থেকে বারে বারেই রক্ত ঝরিয়েছে। কিন্তু তবু তখনও তা ভুলে থাকবার পথ ছিল।

সেদিনকার সে অবস্থায় কিন্তু সে সুযোগ ছিল না। তাই একটা প্রচণ্ড আক্ষেপ আর আবেগ সারা দেহকে প্রচণ্ড কম্পনে কম্পিত করে তুলছিল। থর থর করে সে কাঁপন ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গসঙ্কুল নদীবক্ষে কম্পমান দিশাহারা নৌকার মত রহমার কোলের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে তাকেও কাঁপিয়ে তুলছিল।

শুনেছি জলে ডুবে মরার আগে মানুষের সমস্ত স্মৃতি এক লহমায় চোখের ওপর দিয়ে ভেসে যায়। না, না, শুধু ডুবে মরার সময় কেন, মৃত্যুর আগে বোধহয় মানুষের সব কথাই মনে পড়ে।

কিন্তু আমার মনে পড়ল কেন? আমি ত তখনও মরিনি।

পরে বিচার করে দেখেছি, সেই মুহূর্তে জল্লাদ আবদুল্লার ত মৃত্যু হয়েছিল। আর জন্ম হয়েছিল দৃষ্টিহীন দৌলতের। তাই মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে সমস্ত পূর্বস্মৃতি এমন ভাবে দিগন্ত উদ্ভাসীত প্রভায় চারিদিক আলোকিত করে জেগে উঠছিল।

জন্মলগ্নের সেই প্রচণ্ড যন্ত্রণা সজ্ঞানে অনুভব করা সম্ভব নয়

বলেই বোধহয় আমার চেতনা লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। কুতসিত কদর্য আবহুল্লার পাপের পাঁক থেকে শতদল পাপড়ি বিকাশ করে সৌরভ মন্থর নবজন্মে মহৎ কোনো প্রাণের প্রকাশ যে সম্ভব ছিল না, এটা সুনিশ্চিত। কিন্তু তবু অন্ধকারের জীব যে কিছুটা আলোর কাছাকাছি এসে পৌঁছতে পারবে, এ প্রত্যাশা সম্পূর্ণ অবাস্তব বা অসম্ভব ছিল না বললেই চলে।

পরবর্তী ঘটনার বিচারে প্রত্যাশা যে পূরণ হয়নি, তা হয়ত বলা চলে। কিন্তু মানুষের দূরদৃষ্টি নেই। থাকলে জীবনের অনেক বিপদ, অনেক আশঙ্কা, অনেক ভাবনার উদ্ভবই হ'ত না। মানুষের জীবনে তাহলে স্বর্গরাজ্য নেমে আসত।

এদিকে করাল মৃত্যু পায়ে পায়ে তার বিকট দ্রংষ্ট্রা বিকাশ করে এক অসহায়া রমণী আর এক লুপ্ত সংজ্ঞা পুরুষকে গ্রাস করতে এগিয়ে আসছিল। তার অতি ক্ষীণ পদশব্দ উত্তরোত্তর দ্রুত থেকে দ্রুততর হল। শোনা যাচ্ছিল তার হাসি। অনুভব করছিলাম তার শীতল শ্বাস।

চমকে উঠলাম একবার। সচল হয়েছি আমি যেন। তাহলে কি তৈমুরের সিপাইদের হাতে বন্দী হয়েছি, না পালাচ্ছি? কিন্তু পালাব কি করে? কার সাহার্যে? রহমা এই বিজন অঞ্চলে কার সাহার্য পাবে। তবে নিশ্চয় তৈমুরের সিপাইরা আমাদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

আমাদের ত বলছি। কিন্তু রহমা কি আছে আমার সঙ্গে? তৈমুরের শিক্ষিত···না না, তাইবা বলি কেন? আমারই শিক্ষায়

শিক্ষিত সৈনিকদের হাতে নিশ্চয় তার চরমতম নির্যাতন ঘটে গেছে। নির্যাতন-নিষ্পিষ্ট দেহটা অযত্নে একধারে হয়ত পড়ে আছে, পশু-পক্ষীর ভক্ষ্য হবে বলে। আর আমাকে তৈমুরের কাছে নিয়ে যাচ্ছে, তার দেওয়া চরম শাস্তি গ্রহণ করাতে।

কিন্তু এই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে যাচ্ছি কেন? তৈমুর কি আমার অদর্শনে এমনি ব্যস্ত হয়ে উঠেছে যে দিনরাত ছুটে চলতে হচ্ছে তাকে।

ভাল করে ব্যাপারটা বোঝবার জন্য উঠে বসতে গেলাম, কিন্তু কে একজন আমায় ধরে শুইয়ে দিল।

অতি পরিচিত কণ্ঠস্বর কানে এল, 'উঠো না আবহুল্লা, উঠো না। তোমার শরীর এখনও খুব দুর্বল।'

কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে পড়লাম। আর তখনি অনুভব করলাম, রহমার একটা হাত আমার বুকের ওপর পড়ে আছে।

আস্তে আস্তে আলতোভাবে ওর হাতটা একবার ছুঁলাম। তারপর শান্তভাবে বললাম, 'ভোর হতে বোধ হয় আর বেশী দেরী নেই?'

স্পষ্ট অনুভব করলাম রহমা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। তার চোখের উত্তপ্ত জল দু' এক ফোঁটা আমার গায়ে মাথায় পড়ল, কিন্তু তার মুখ থেকে একটা কথাও বেরোল না।

শুনতে পেলাম, একটু দূরে একজন আর একজনকে যেন বলছে, বেলা দুপুর হয়ে এল, 'এবার একটু বিশ্রাম করা যাক।'

বেলা দুপুর। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকে উঠলাম। আমার

চোখে সবকিছু এমন অন্ধকার লাগছে কেন? তবে কি আমার দৃষ্টিশক্তি লোপ পেয়েছে? দুনিয়ার রঙরূপ আর কখনও দেখতে পাব না আমি?

রহমার চোখের জলের কারণটা এবার স্পষ্ট হয়ে উঠল। সে ভাবছে, এত বড় ক্ষতিটা আমি সহ্য করব কি করে?

আগে হলে সত্যিই হয়ত সইতে পারতাম না। কিন্তু ঘা খেয়ে খেয়ে অনেক শক্ত হয়ে গেছি। বুঝেছি, যে বিশ্ববিধাতা সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন, তাঁর হাত থেকে মুক্তি পাবার কোন উপায় নেই। আমি হয়ত এই ভেবে নিশ্চিন্ত ছিলাম যে আমার অত্যাচার দুনিয়ার কারো চোখে পড়েনি, কিন্তু সেই সর্বশক্তিমানের চোখ ত এড়ানো গেল না। ঠিক সময় মত তার বিচারের ফল ত ফলল।

আমরা আপাতঃ দৃষ্টিতে দেখি দুনিয়াতে পাপই বলবান। অন্যায়ের পর অন্যায় গেঁথে ঐশ্বর্যের সাতনরী হার পরতে দেখলে সাধারণের এ ধারণা হওয়া আশ্চর্য নয় যে, পাপের পথই উন্নতির একমাত্র প্রকৃষ্ট পথ। কিন্তু তারা ত দেখে না যে কি অভিশাপ সেই ঐশ্বর্যের প্রতিটি কণার সঙ্গে মিশে থাকে।

অবশ্য এর একটা কারণও আছে। মানুষের মধ্যে সেই আদি পাপের বীজ সর্বদাই উত্তপ্ত থাকে। পাপের আপাতরম্য ফলটা ত অতি মনোরম আকর্ষণ। তা ছাড়া দৈনন্দিন জীবনে ছোটখাট অন্যায় আপন স্বার্থের প্রয়োজনে আমরা প্রায় সবাই করে থাকি।

বড় পাপ করতে গেলে মনের জোর থাকা চাই। তাই সাধারণ মানুষ সে রকম পাপ করে না। সুযোগ আর সুবিধা পেলে পাপের পথে এগোবে না, এমন মানুষ দুনিয়ায় ক'টা? বাছতে গেলে সবই তুঁষ, দানা আর মিলবে না!

মনে মনে আমরা সবাই ত আত্মসুখী। অন্যকে বঞ্চিত করে তার মুখের গ্রাস আপনার পেয়ারের কুত্তাকে খাওয়াতে চাই না, এমন কথা জোর করে কেউই বলতে পারি না। আর পারি না বলেই অন্যকে সে কাজ করতে দেখলে আমাদের এত খারাপ লাগে।

যেটা আমার মনোগত অভিপ্রায়, অথচ যা আমি করবার সুযোগ কোনমতেই করতে পারছি না, সেটা আর একজন করবে এটা আমরা সহ্য করতে পারি না। তাই হয়ত নাক সিঁটকে থাকি। যেন ভাবটা দেখাই, ওর মত আচরণ আমরা করতে রাজী নই। এবং সেইজন্যে বলি, 'ও পাপের ধন। ও আমার সইবে না।'

সুযোগ পেলেই কিন্তু পাপের ধনও সয়। তা যদি না সইত, তাহলে যাকে পাপী বলে মনে করি, তার দরজার সামান্য করুণা ভিক্ষার আশায় গিয়ে দাঁড়াতে পারতাম না।

আসলে আমরা ভণ্ড। মুখে আমরা সভ্যপথে থাকা নিয়ে অনেক বড় বড় কথা বলি, কিন্তু কাজের সময় সর্বদাই অসভ্য হবার চেষ্টা করি। হতে পারি না শুধু ক্ষমতার অভাবে। কাজেই সেটা ভিন্ন কথা। আসলে মনোগত অভিপ্রায়ের দিক থেকে তথাকথিত সাধু আর পাপীর মধ্যে ফারাক অতি সামান্যই।

এটা কিন্তু ঢালের একটা দিক। অন্য দিকটা হ'ল পাপীদের মনের দিক।

প্রথম অবস্থায় নিয়ম শৃঙ্খলা ভেঙে এগিয়ে যাবার অদ্ভুত একটা রোমাঞ্চ আছে। যখন নজরে পড়ে, সাধারণ মানুষ আমার

আতিশয্যকে বাঁকা চোখে দেখলেও তার মধ্যে একটা সপ্রশংস ভাব আছে, তখন আনন্দে গর্বে বুকটা ফুলে দশ হাত হবে, এতে আর বিস্ময়ের কি আছে ?

তাছাড়া পাখীর ছানার প্রথম ওড়ার মত প্রথম পাপের মধ্যে থেকে প্রভূত আনন্দের খোরাক মেলে। আমি যে আর পাঁচজনের থেকে স্বতন্ত্র, তা দেখে গগনবিহারী পাখীর মনে বাধা-বন্ধনহীন মুক্তির যে আনন্দের আভাস ফুটে ওঠে, পাপীর মনেও সেইরকম হয়ে থাকে। সে মনে করে, বিশ্বপ্রকৃতির নিয়মের উর্ধ্বে আমাদের স্থান। আমি সর্বনিয়মের ব্যতিক্রম। আমি স্বয়ং অনিয়মের নিয়ম।

এই ওঠার আনন্দ ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে ভিন্নতর। কেউ প্রথম অন্যায় করার পরেই অনুশোচনার আগুনে পুড়তে থাকে। কারো আবার দীর্ঘদিন ধরে অন্যায় করার পর এক সময় অনুতাপের সূচনা হয়।

পুড়তে কিন্তু সকলকেই হয়। দহন প্রথম অবস্থায় সুরু হলে, এক সময়ে তার সমাপ্তি ঘটে। তখন তার পোড়াঘর নতুন করে বাঁধবার সুযোগও মেলে। কিন্তু দহন যদি দেরীতে সুরু হয়, তাহলে আমৃত্যু এ দহন সহ্য করতে হয়।

প্রথম অবস্থায় পশ্চাদপসরণের সুযোগ থাকে। সুযোগ থাকে শোধরাবার, নতুন করে জীবনের পথে এগিয়ে চলবার। কিন্তু যত দেরী হবে, ততই পেছু ফেরার পথে কাঁটা পড়বে। তখন আর ফেরার সুযোগ থাকে না। নিত্য নতুন অন্যায় করে এগিয়ে চলতেই হবে। আর সঙ্গে সঙ্গে নতুন করে ইন্ধন যোগাতে হবে পুরাণো আগুনে। তবে এতে শান্তি পাওয়া যায় না কোন সময়েই।

উচ্চাকাঙ্খার সঙ্গে শান্তির সম্পর্ক সম্পূর্ণ বিরুদ্ধবাদীর। শান্তি যদি পূর্ব-গামী হয় ত উচ্চাকাঙ্খা হয় পশ্চিম-গামী।

সাধুসন্তরা তাই উচ্চাকাঙ্খাকে সর্বপ্রথম বিসর্জন দেন। সাধন মার্গে অগ্রগমনের পথে এটি একটি দুর্লঙ্ঘ্য বাধা বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। উচ্চাকাঙ্খা না থাকার জন্যই সাধুরা শান্তি পান। আর সেইজন্যই এর ভেতর থেকে ঈশ্বরসান্নিধ্য সম্ভব হয়।

লৌকিকজীবনে কিন্তু উচ্চাকাঙ্খা সম্পূর্ণ ত্যাগ করা অসম্ভব ব্যাপার। আর উচ্চাকাঙ্খাবিহীন মানুষ জীবনের সদর দরজায় প্রবেশাধিকার পায় না, তাকে বসে থাকতে হয় দেউড়ির বাইরে। অবশ্য মাঝে মাঝে উচ্চাকাঙ্খীও সোজা রাস্তায় চলতে পারে না। তাকে অন্ধকার গলিপথ সুঁড়িপথ বেয়ে আসতে হয়। আর সে পথ পেরোতে তাকে অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়, এবং তা এড়াবার জন্য নানা কূটচক্রান্ত, নানা অপকৌশলের সাহার্য নিতেও সে দ্বিধা করে না।

কিন্তু একবার সদর দরজায় পৌছলেই সে একেবারে নিজেকে নিশ্চিন্ত মনে করে। অথচ তখনই সুরু হয় দহন। প্রথমতঃ আরো এগোতে না পারার জ্বালা, দ্বিতীয়তঃ অতীত স্মৃতির বৃশ্চিক দংশন।

সবকিছু মিলিয়ে দহনের বৃদ্ধিই ঘটে, অথচ ফেরবারও আর পথ থাকে না। বাঘের পিঠে সোয়ার হলে নামাও যায় না, চড়াও যায় না। তাই একটু হিসেবের ভুলের জন্যেই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যে বিলীন হয়ে যেতে হয়।

তবু উচ্চাকাঙ্খারও শেষ নেই, আর তার দরুণ দহনেরও শেষ নেই। একই পথে আবহমান কালের যাত্রীরা চলেছে। সে

পথের দু'পাশে বহু আকাঙ্খার কংকাল ছড়িয়ে আছে, তাতেও চৈতন্যোদয় হয় না মানুষের।

যেতে যেতে এক সময় যাত্রা শেষ হয় ঠিকই। যেখানে মনে হয়েছিল পথের বোধহয় শেষ হ'ল, শেষমুহূর্তে বোঝা যায়, সেটা পথের একটা বাঁক মাত্র। অনাদি-অনন্ত পথ চলে গেছে দৃষ্টিসীমার বাইরে, কোন সুদূরে।

হতাশা নিয়ে উচ্চাকাঙ্খার সমাধি রচনা হয়। ক্ষমতার তারতম্য অনুসারে কালের সমুদ্রে ক্ষণবুদ্বুদ মাত্র থেকে যায়। বুদ্বদের জীবনকাল কারো ক্ষেত্রে মুহূর্ত, কারো বা মাস, কারো বছর, কারো আবার শতাব্দী। তারপর সবশেষে নামটি মাত্র অবশেষ।

একমাত্র মহাজনদের স্মৃতি সৌরভই চির অম্লান। কিন্তু ক'জন চায় মহাজন হতে? বেশীর ভাগ মানুষই ত তৈমুরের মত জীবনকে ছলে-বলে-কৌশলে প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় মনের শান্তিই খুইয়ে বসে থাকে। প্রতিষ্ঠা হয়ত সে পায়, কিন্তু শেষ অবস্থা ত একবারও ভেবে দেখে না?

কৈশোরে সে যখন ছিল পিতৃ-পরিত্যক্ত, একমাত্র আবদুল্লা ছাড়া তার কোন সহচর ছিল না, যখন একটি কপর্দকও তার সম্বল ছিল না, তখনও ত সে সুখীই ছিল? তারপর নানা ধরণের চক্রান্তের জাল বুনে ধাপে ধাপে সে ওপরে উঠতে থাকে। ন্যায় নীতি সব কিছু বিসর্জন দিয়ে শুধু স্বাচ্ছন্দ্য আর ক্ষমতা লাভের প্রয়াসে মত্ত হয়ে উঠে।

জীবনে সে পেয়েছে সবকিছুই। অন্ততঃ হিংসা করার মত সব ত বটেই। কিন্তু লক্ষ মানুষের মনের দুঃখ বোঝবার মত বোধশক্তি তার কোথায়?

ও বলে, ক্যাথের রাজকুমারী ওর দুঃখ দূর করতে পারে। পারে বর্তমানের বেগম সেই খৃষ্টান বাঁদী। হয়ত সাময়িকভাবে তারা পারতে পারে। কিন্তু আইজলের জায়গা কি তারা পূরণ করতে পেরেছে? একা আইজল তার বাহুপাশে বিশ্ববিজয়ী তৈমুরকে ভুলিয়ে রেখেছিল, অন্যেরা কি তা পেরেছে?

পারে না যে তা তৈমুর নিজেও জানে। তাই সে এত অশান্ত, এত ক্ষুব্ধ, এত ক্রুর। আমি জানি অতীতের সেই সুখ-স্মৃতিকে সত্য করে তুলতে আজো সে তার সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে পারে।

তবে একথা তার মুখ দিয়ে আজ স্বীকার করানো যাবে না। বাঘের সোয়ার কখনো বাঘের হাত থেকে মুক্তি পেতে পারে না। উচ্চাকাঙ্খাও তেমনি। সে পথে এগিয়ে যাওয়াই চলে, পেছানো যায় না! পেছলেই একেবারে অন্ধকারের অতলে তলিয়ে যাবে।

অবশ্য হিন্দুস্থানের এক বাদশার কথা শুনেছি। সে নাকি ক্ষমতার মধ্যাহ্নে সব কিছু ছেড়ে দিয়েছিল। বলেছিল, মানুষকে জয় করার সবচেয়ে বড় অস্ত্র প্রেম। প্রেমের ভেতর দিয়ে বিশ্বজয় করে, সে নাকি আজো মানুষের সামনে দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়ে আছে।

কিন্তু সেত একজন। এ ছাড়া হিন্দুস্থানের বুকে সবকিছুই হওয়া সম্ভব। সেখানকার মানুষরা প্রকৃতির অনুকূল দাক্ষিণ্যে তাড়াতাড়ি নরম হয়ে যায়। প্রাণ বাঁচানোর জন্য ত সেখানে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয় না। আপন বসনের জন্য যেখানে লড়াই করতে হয় না, সেখানে প্রেমমাহাত্ম্য প্রচার করা সাজবেই।

হিন্দুস্থানের ভাগ্যে এই সহজ জীবন কি মারাত্মক হয়ে উঠেছে,

সভ্য সভ্য তৈমুর তার প্রমাণ নিয়ে গেছে। কিন্তু ওরাত বিশ্বাস করে না এসব। ভাবতেও পারে না বিরূপ ভাগ্যের কথা। তাইত তৈমুরের বাহিনীর স্মৃতিচিহ্ন বিলুপ্ত হওয়ার আগেই দেহলী আবার পুরানো সাজে সেজে মন ভুলোতে আরম্ভ করেছে।

যুগ যুগ ধরে তাই ওদের ভাগ্যে একই দুর্ভাগ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটে। কিন্তু তা থেকে তারা বিন্দুমাত্র শিক্ষা পায় না। প্রতিবারই বঞ্চিত হয়, আর ভাবে, এটা সাময়িক ঘটনা মাত্র।

পরের বারে ঐ একই পথে চলতে চলতে আবার একই বিপদের সম্মুখীন হয়। কিন্তু একবারও এদের মনে হয় না যে, চলার হিসেবে বোধহয় কোন ত্রুটি আছে, আছে কোন ভুল। এই আক্রমণের পরেও ভুল-ত্রুটি তারা কখনও স্বীকার করে না।

প্রেম তত্ত্ব হিসেবে খুব বড় জিনিষ। কিন্তু তত্ত্বইত জীবনের দৈনন্দিন সর্বপ্রধান স্থান পেতে পারে না। ব্যক্তির জীবনে এ তত্ত্ব কখনো কখনো সর্বব্যাপী হতে পারে। তবে সে মানুষকে অনেক সময়েই মজনু মনে করা হয়ে থাকে। তার দৃষ্টান্ত তাই সর্বজন গ্রাহ্য হতে পারে না।

জাতির জীবনে কিন্তু কখনোই এ তত্ত্বের প্রাধান্য ঘটা উচিত নয়। বরং মনে করা ভাল যে, এটা নিতান্তই একটা অস্বাভাবিক ঘটনা মাত্র। স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র যদি অক্ষুণ্ণ রাখতে হয় তবে জাতিকে বলবান হতে হবে। আর বলবান হলেই যে পরস্বাপ-হরণকারী হতে হবে এমন কোন কথা নেই।

আপন শক্তিতে যদি অন্যদের লোলুপ রসনাকে সংহত করা যায় ত আপনার ইচ্ছামত আপন দেশকে গড়ে তোলাও যায়।

নইলে যাদের নেই তারাও, যাদের আছে তাদের জিনিষের দিকে লোভের হাত বাড়াবেই। আর সে হাতকে নিরোধ করতে না পারলে সর্বস্ব তুমি হারাবে, আর তারই সঙ্গে সর্ববিধ অথবহ তত্ত্বাবলীও নষ্ট হয়ে যাবে।

দেখেছি হিন্দুস্থানের মানুষ সে তথ্যে বিশ্বাস করে না। তারা মনে করে সর্বজনকে প্রেম বিলোলেই বিনিময়ে প্রেম পাওয়া সম্ভব। প্রসারিত বজ্রকঠিন হাতকে প্রেমভরে তখনই আলিঙ্গন করা যায়, যখন না করার মারাত্মক ফল সেই প্রসারিত হাতেই স্বপ্রকাশ।

তা নাহলে হাতটি ছুঁলেই যদি বোঝা যায়, এ হাত শুধু ফুলই ছুঁয়েছে, দণ্ড ধরেনি, ধরার ক্ষমতাও রাখে না, তখন কোষমুক্ত উদ্যত দণ্ডের কোষবদ্ধ হয় না। বরং ভীমবিক্রমে তা প্রেমভিক্ষু হাতটিকে দ্বিখণ্ডিত করে আপন ইচ্ছাপূরণে বাধ্য করে হস্তাধি-কারীকে।

ভিখারীকে কে কবে তার প্রার্থনা পূরণে সহায়তা করেছে? মুষ্টিভিক্ষার অশ্রদ্ধার দানেই ত তার ঝুলি ভরে। তাও যত পায়, না পায় তার চেয়ে বেশী।

পৃথিবী বীরভোগ্যা। প্রকৃতির সম্পদ অকৃপণ হলেও তাকে রাখবার ক্ষমতা থাকা দরকার। সে ক্ষমতা হিন্দুস্থানের নেই বললে ভুল বলা হয় না।

বারবার তাই হিন্দুস্থানের বুকে লুটেরাদের নির্মম নখচিহ্ন আঁকা হয়, আবার বারেবারেই তারা ভুল করে।

ইতিহাসের বক্রগতি একই কক্ষপথে আবর্তিত হয়। কিন্তু ক্রমেই সে পথ গুটিয়ে আসতে চায়। শেষ পর্যন্ত এমন একদিন আসে,

যেদিন বেড়াজালের মধ্যে পড়ে সমস্ত কিছুই শেষ হয়ে যায়। পড়ে থাকে শুধু স্মৃতিমাত্র।

এমনি করে মিশর গেছে, আসিরিয়া গেছে, ব্যাবিলন গেছে। সেকেন্দার শার বিশাল সাম্রাজ্য রেণু রেণু হয়ে ধুলোয় মিশেছে। ইতিহাস-ভাগ্য-বিধাতার লেখন তারা পড়েও বোঝেনি। তুলা-দণ্ডে যে তাদের ভার কমে গেছে, এ কথাটা জানতেও পারেনি, কিংবা জেনেও বোঝেনি।

একমাত্র হিন্দুস্থান-ই ইতিহাসের এ উত্থান-পতনের মাঝখানে টিঁকে গিয়েছে। কি করে যে গেছে তা কেউ বলতে পারে না। হয়ত এই মৃত্যুঞ্জয়ী ক্ষমতাই ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাদের এতটা উদাসীন করতে পেরেছে।

এরজন্য অবশ্য অন্য মূল্যও দিতে হয়েছে তাদের। বারবার লাঞ্ছনা, পরাজয়, আর দাসত্ব শৃঙ্খল তাদের অঙ্গের ভূষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু তবু সেই একই ক্লান্তিকর ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি? মনে হয়, সৃষ্টির শেষদিন পর্যন্ত হিন্দুস্থানের মানুষ একটি বাস্তব জ্ঞান-বর্জিত স্বপ্নবিলাসীই থেকে যাবে। তাদের কাছে জীবনের সাতরঙা দিকটাই সত্য মনে হবে, আর সবকিছু একটা অর্থহীন দুঃস্বপ্ন মাত্র।

প্রকৃতির প্রাচুর্যের দাক্ষিণ্যই হয়ত জীবনের রূঢ় বাস্তবকে অস্বীকার করবার প্রেরণা জোগায়। আর সেই সঙ্গে একটা আলস্যও দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে যায়। তাই সে দাক্ষিণ্য চিরন্তন করে রাখার প্রচেষ্টাও কদাচিত করা হয়ে থাকে।

এই দুনিয়ায় আলস্যকে প্রশ্রয় দেওয়া সম্ভব নয়। এবং সম্ভব নয় বলেই ইতিহাসের পাতায় পতন-অভ্যুদয়ের এমন প্রাচুর্য। তবু বারবার প্রতিষ্ঠার পরই সুখভোগের প্রত্যাশা আর ভোগ্য-বস্তুর বিপুল সম্ভার অতি কর্মঠ মানুষকেও অলস করে তোলে।

হয়ত প্রথম পুরুষেই তা এমন দৃষ্টিকটু হয় না। কিন্তু ক্রমবর্ধমান ভাবে পুরুষকে যে পুরুষান্তরে এ আলস্য সম্ভাব্যতার সীমা এড়িয়ে প্রায় অসম্ভবের স্তরে গিয়ে পৌঁছায়। আর তখনই সুরু হয় বিপরীত যাত্রার পালা।

একদিন যে ভাগ্যান্বেষী পারিপার্শ্বিকের সমস্ত বাধাকে জয় করে সাফল্যের স্বর্ণশিখরে পৌঁছতে পেরেছিল, হয়ত তিন কি চার পুরুষ পরে তারই বংশধরেরা আবার নেমে আসে সেই পুরানো জায়গায়। তখন কিন্তু তাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে। ক'পুরুষের জীবনযাত্রার ছাঁচে পড়ে সমস্ত জীবনটাই তাদের নতুন রূপ নিয়েছে। পুরানো পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো তখন কঠিন হয়ে পড়ে। অথচ যে বেহেস্ত থেকে নির্বাসিত হয়েছে, সেখানে ফিরে যাবারও কোন উপায় নেই আর।

হিন্দুস্থানের মানুষদের জীবনে এ দুর্যোগের ঘনঘটা অনেক দিন থেকেই জমে উঠেছে। কিন্তু কোন এক যাদুমন্ত্রবলে তার অন্ধকার দিকটা প্রকট হয়ে ওঠেনি এখনো। এ অবস্থা চিরস্থায়ী হয়ে থাকতে পারে না। একদিন বজ্র নামবেই। আর সেদিন আত্মরক্ষার বিন্দুমাত্র ক্ষমতাও টিঁকে থাকবে না তাদের।

নিজেদের বিবেচনাহীন ব্যবহারে তারা সে সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিতই

করেছে। এক পুরুষ বা দু'পুরুষে না হোক, সাত পুরুষের মধ্যেই এর ফল তাদের ভোগ করতেই হবে।

সেদিন অবশ্য ওসব কথা মনে হয়নি। তবে চক্ষুরত্ন হারিয়ে খুব মুশড়েও পড়িনি।

হেসেই বলেছিলাম, 'কাঁদছ কেন পিয়ারী? তোমার ত খুসী হবার কথা? ভাব দিকি, আমার চোখে তুমি চিরযৌবনা-ই রয়ে গেলে। মাথায় তোমার সাদার ছোঁয়াচ লেগেছে। শরীরের বাঁধন হয়ে এসেছে আলগা। আর ক'দিন বাদে একেবারেই ত বুড়িয়ে যাবে। সেদিন হয়ত তোমায় আর মনে ধরত না। আমার কাছে তোমাকে আর সে অসুবিধায় পড়তে হবে না। তোমার সেই পুরোনো রূপটাই মনে থাকবে। তাছাড়া আর একটা ভয়ও ছিল তোমার। হঠাৎ যদি পালিয়ে যাই। আজ আর সে ভয়ও রইল না। জহলাদ আবদুল্লা এখন তোমার হাতের পুতুল। যেমন তাকে চালাবে তেমনি চলবে। এবার থেকে তার ভয়ের পালা শুরু।'

ডুকরে কেঁদে উঠল রহমা, 'তোমার এমন অবস্থা দেখার আগে আমার মরণ হ'ল না কেন?'

'আমায় তাহলে কে দেখত? বনের পশুরও অধম অবস্থা হ'ত যে আমার।'

কথাটা এমনি সত্য যে, স্বররুদ্ধ হয়ে গেল তার। অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমার বুকের ওপর মুখ রেখে ফুলে ফুলে কাঁদল সে। আমার শত আদর যত্ন, মিষ্টি কথা তাকে থামাতে পারল না।

অনেকক্ষণ কাঁদবার পর শান্ত হ'ল সে। তারপর আমার

অজ্ঞান হয়ে যাবার পর থেকে সেই সময় পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা শুনলাম।

প্রথম দিকটায় যখন যন্ত্রণায় ছটফট করেছি, তখন আমার মাথাটা কোলের মধ্যে রেখে চুপচাপ বসে থেকেছে সে। মনে মনে ভেবেছে, শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য কমে গেলেই সুস্থ হয়ে উঠব আমি। তারপর আবার এগোনো যাবে।

কিন্তু ছটফটানি যখন কমল, তখন সে বুঝলে, দেহের তাপ খুব বেড়েছে আমার। উপরন্তু সম্পূর্ণ অচৈতন্য আমি। কাঠের পুতুলের মত চুপচাপ বসে থাকে সে। পৃথিবী পরিক্রমা সেরে সূর্য একসময় পশ্চিম দিগন্তে বিলীন হয়ে যায়। অন্ধকার রাতে সহায়সম্বলহীন নারী মৃতপ্রায় আমাকে নিয়ে কি করবে ভেবে পায় না।

তার সৌভাগ্য যে প্রথম তুষারপাত অধিকাংশ প্রাণীকেই কোটরাগত আপন বাসস্থানের মধ্যে আটকে দিয়েছিল। নইলে তার পক্ষে ওখানে থাকা রীতিমত বিপজ্জনক হয়ে পড়ত।

আর একটি রাত ভোর হয় আধো ঘুমে, আধো জাগরণে। প্রভাত সূর্যের সঙ্গে মানুষের গলার আওয়াজে চমকে ওঠে সে। প্রথমে ভেবেছিল, হয়ত তৈমুরের সিপাইরাই বুঝি এসেছে। তখন আত্মরক্ষার তাগিদে লুকিয়ে থাকবার কথাই মনে এসেছিল। কিন্তু তারপরই আমার এই অবস্থায় সাহায্যের প্রয়োজন এটাই তার কাছে বড় হয়ে উঠে। তাই কোল থেকে আমার মাথাটা সন্তর্পণে নামিয়ে গুহার বাইরে এসে দাঁড়ায়।

কিন্তু কাউকেই দেখা যায়নি। আর সেইজন্য অবাকও হয়ে

গিয়েছিল সে। কথা কিন্তু তখনো শোনা যাচ্ছিল। শব্দ অনুসরণ করে গুহার ওপরের পাথরগুলো ডিঙিয়ে সে দেখেছিল যে, কিছু সংখ্যক মেষপালক জাতের লোক শীতের আভাস পেয়েই ঘরমুখো হচ্ছে।

তাদের কথাবার্তা শুনে বুকে বল পেয়েছিল রহমা। কারণ সেটি তারও মাতৃভাষা। নিষ্ঠুর দস্যু মার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে পণ্যবাজারে বিক্রী করার আগে ঐ ভাষাতেই মনের সুখ-দুঃখ, সাধ-আহ্লাদ সবই ব্যক্ত করত সে।

দীর্ঘদিন পরে সেই অতি পরিচিত ভাষা শুনে আনন্দে উদ্বেল হয় তার মন। সঙ্গে সঙ্গে তাই আত্মরক্ষার প্রত্যাশাও উজ্জ্বলতর হয়ে উঠে।

সেই বিজন প্রদেশে নারীকণ্ঠে নিজের দেশীয় ভাষা শুনে সেই লোক গুলোর মনের অবস্থা কি হয়েছিল তা অবর্ণনীয়। রহমাকে নানা প্রশ্নও করেছিল তারা। সেইসব প্রশ্নোত্তরের ফাঁকে, রহমার আত্মীয়ের সন্ধানও পাওয়া গিয়েছিল।

আত্মীয়ের কাছে নাকি নিজের অবস্থা জানিয়েছিল রহমা। অবশ্য কিছুটা রেখে ঢেকে। সে জানিয়েছিল, বাঁদীবাজার থেকে এক ওমরাহ তাকে কিনে নেয়। তারপর দু'জনার মধ্যে আশনাই হয় এবং তার পরিণতি শাদীতে। এখন তৈমুরলঙ্গ সেই ওমরাহের ওপর খেপে গিয়েছেন বলে, তারা সবকিছু ফেলে পালিয়ে এসেছে।

পরশু সকালে এখানে এসে তাদের ঘোড়া দুটো মরে গেছে। আর তার স্বামী অসুস্থ হয়ে পড়েছে। এই বিপদে আত্মীয়স্বজনের দেখা যখন পেয়েছে তখন অনেকটা নিশ্চিন্ত। এবার যা করবার তারাই করুক।

ঐ সব অঞ্চলের লোকেরা পরিবার আত্মীয়স্বজন ছাড়া শাহানসা অথবা সুলতান কাউকেই বিশেষ মান্য করে না। সেকেন্দার শাহ থেকে সুরু করে সব বাদশাই জোর করে তাদের দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করে বিফল মনোরথ হয়েছে। শেষঅবধি নামকা ওয়াস্তে বশ্যতা স্বীকার করিয়ে তাদের কার্যত স্বাধীন থাকতে দিয়েছে। তৈমুর সম্বন্ধেও তাদের মনোভাবের বিশেষ হেরফের যে হয়নি, এ কথা বলাই বাহুল্য।

তার ওপর রক্তের সম্পর্ক নিয়ে নারী আশ্রয় চাইছে। আশ্রয় না দিয়ে কি তারা পারে? আমাদের বাঁচবার পক্ষে ওর চেয়ে সুবিধাজনক আশ্রয় পাওয়া সম্ভবও ছিল না।

সেই গুহা থেকে আমার অজ্ঞান অচৈতন্য দেহটাকে সবাই মিলে বয়ে নিয়ে গেল তাদের সাময়িক আস্তানায়। সেখানে তাদের পক্ষে যতটা করা সম্ভব ততটা চিকিৎসা করল। কিন্তু বিজ্ঞজনেরা তখনি বলে দিয়েছিল যে চোখের দৃষ্টিশক্তি আর কোন দিনই ফিরে পাব না। অত্যধিক শারীরিক তথা মানসিক পরিশ্রম ছাড়াও 'তুষার জ্যোতি'র স্পর্শে চোখের জ্যোতি নিভে গিয়েছে, চিরতরে মুছে গিয়েছে তার আলো।

পরে 'তুষার জ্যোতি'র কাহিনী বিশদভাবে শুনেছিলাম—ঐ তুষার অঞ্চলে মহামানব তথা মহাসাধকরা নিয়মিত বসবাস করেন। তাঁদের নাকি দেখা যায় না। শুভ্র এক জ্যোতির আবরণে নিজেদের মণ্ডিত করে চলাফেরা করেন তাঁরা। শিশু আর নিষ্পাপ লোক ছাড়া অন্যের সে জ্যোতির দিকে তাকানো নিষেধ। তুষারপাতের পরই তাঁদের বেশী দেখা যায়। তাই তুষারপাতের পর স্থানীয়

লোকেরা কখনো দূরের দিকে তাকায় না। কাছাকাছি অঞ্চলের মধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে ঘুরে বেড়ায়। নইলে 'তুষার জ্যোতি'র প্রভায় অন্ধত্ব অবধারিত। গোঁয়াররা জোর করে নিষেধ ভাঙতে গিয়ে অন্ধ হয়ে গেছে, এমন অসংখ্য দৃষ্টান্ত তারা দেখতে পারে।

কাহিনীর মধ্যে সাধারণত অনেক অবান্তর বস্তুর অনুপ্রবেশ ঘটে সেটার ভার বাড়ানোর জন্য। হয়ত ধার তাতে অনেকটা কমে যায়, কিন্তু ভারেওত তার অভাব কিছুটা মোচন করা যায়!

মরুজ্যোতির প্রসঙ্গে মহাপুরুষ বা মহাসাধকদের নামটাও এই ভার বাড়ানোর কাজেই লাগানো হয়েছে বলে মন হ'ল আমার।

মহাপুরুষদের জীবনের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য জনকল্যাণ। তাঁদের জীবনের প্রস্তুতির পূর্বে হয়তবা তাঁরা কিছুটা আত্মসমাহিত থাকতে পারেন। কারণ শিশু যেমন জন্মলগ্নেই চলতে পারে না, চলার ক্ষমতা তাকে অর্জন করতে হয়, তেমনি তারাও মানব কল্যাণের কোন পথ বেছে নেবেন, তা নিয়ে কিছুটা চিন্তা ভাবনা করে থাকেন।

কিন্তু একবার পথ নির্দেশ হয়ে গেলে তাঁদের পেছনে ফিরে তাকাবার দরকার হয় না। তখন নিজ নির্দিষ্ট পথে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অতি একাগ্রচিত্তে অগ্রসর হন। নিন্দা, স্তুতি কিছুতেই বিচলিত হ'ন না তাঁরা। ষড় রিপুর আতিশয্য তাঁদের স্পর্শ করতে পারে না।

যুগে যুগে মহামানবরা অবতীর্ণ হয়েছেন মানবকল্যাণের মহান ব্রত নিয়ে। ঈশ্বরের দয়ার সর্বপ্রধান লক্ষণই ত মানব কল্যাণব্রতী এইসব মহাপুরুষ।

তৈমুর নিজেকে জগদীশ্বর বলতে চায়, কিন্তু তার মধ্যেত কল্যাণের কোন চিহ্ন নেই। সেত শুধু ধ্বংস যজ্ঞের হোতা। কিন্তু তাও যদি জানতাম যে, সে কেবলমাত্র অন্যায়কে, পাপকে দূর করবার জন্যই তার অস্ত্রকে উদ্যত রেখেছে, তাহলে বুঝতাম, সে একটা অবশ্য করণীয় কর্তব্য পালন করছে। কিন্তু সেত কোনদিনই তা করেনি। ব্যক্তিগত সুখ, আর স্বাচ্ছন্দ্য, এ ছাড়া অন্য কোন কিছুর দিকে সেত কোনদিনই ফিরে তাকায়নি।

যা কিছু সে করেছে সবই তার ব্যক্তিগত স্বার্থ সাধনের জন্য। আপন শক্তি বৃদ্ধির প্রচেষ্টায়। আর তার সে শক্তিমদমত্ততার যূপকাষ্ঠে হাজার হাজার নিরীহ নর-নারী-বৃদ্ধ-যুবা-তরুণ-কিশোর-শিশু নির্বিশেষে বলি হয়েছে।

মহামানবরা যে মানুষের ক্ষতি করে না, এ তথ্যটার সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টান্ত তৈমুরের জীবন। হয়ত তৈমুর বা তৈমুরের মত স্বার্থান্বেষীদের দেখেই এইসব সরল লোকদের মনে মরুজ্যোতির কুফল মহামানবদের দ্বারা সংঘটিত হয়ে থাকে বলা হয়।

মহাসাধকদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। ব্যক্তিগত সাধনায় আত্মাহুতির প্রচেষ্টায় তাঁরা সর্বদাই আত্মসমাহিত। দুনিয়ার দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাট ভাল-মন্দ কিছুই তাঁদের বিফল করে না। সিঁড়িভাঙা অঙ্কের মত ধাপে ধাপে তাঁরা এগিয়ে চলেন লক্ষ্যের দিকে। আর যতক্ষণ সিদ্ধিলাভ না ঘটে, ততক্ষণ কোন কিছুর দিকে তাঁরা নজর দিতে চান না।

কিন্তু একদিন এই সাধনার পরিসমাপ্তি হয়। সেদিন তাঁরা হন

নির্বিকল্প সমাধির মধ্যে তলিয়ে যান, না হয় তাঁদের সাধনার ফলকে লোকের কল্যাণেই ব্যবহার করে থাকেন। তবে কদাচিৎ কেউ যে আত্মসুখের প্রয়োজনে, নিজের নবার্জিত শক্তিকে ব্যবহার করেন না, এমন কথা জোর করে বলা যায় না। কিন্তু সেদিন তাঁরা হয়ে পড়েন স্বৈরাচারী মানব মাত্র। দেখতে দেখতে তাঁদের সাধনার ধন হাওয়ায় মিলিয়েও যায়।

তাই অধিকাংশ মহাসাধকই এমন সর্বনাশা পথে পা বাড়ান না।

তবে সরল মানুষগুলোর এমন একটা ধারণা হলো কি করে? সম্ভবতঃ প্রত্যেকটি মানুষই নিজেদের সেই আদিম পাপের অংশীদার বলে মনে করে থাকে। তাই সাধু মহাত্মাদের তারা কিছুটা ভয়ে ভয়ে দেখে। তাদের ধারণা, পুণ্যবান এইসব মানুষরা তাদের পাপটাকে স্পষ্ট দেখতে পায়। আর তাদের পুণ্যের স্পর্শে পাপ পরাস্ত হয়ে পলায়ন করে।

এই পলায়মান পাপের বহির্গমন পথে পড়ে মানুষের দৃষ্টি-শক্তিবাহী চক্ষু দু'টি। আর সেই পাপের স্পর্শেই চোখের জ্যোতি নিভে যায়।

ওদের সঙ্গে আলোচনায় এই ধারণার আভাসই পেয়েছিলাম। সরল মানুষদের মনে পাপ সম্বন্ধে এ হেন তথ্য বোধহয় তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের নিদর্শন। তাদের কাছে সাদাটা সাদা, কালোটা কালো। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই যে সাদা-কালোর মাঝে ধূসরতার নানা বর্ণচ্ছটা দেখা যায়, এ কথা তারা জানে না, মানেও না।

নাগর সভ্যতার ক্ষেত্রে কিন্তু সাদা-কালোর পরিস্কার বিভাগ

দেখা যায় না। সেখানে ধূসরতারই জয় জয়কার। স্থান কাল ও পাত্র ভেদে ধূসরতার আধিক্য বা স্বল্পতা দেখা যায়। নাগরিকরা তাই কালোকেও কাল না ভেবে ঘোর ধূসর মনে করে। আর সাদাকে অতি অল্প ধূসর বলে থাকে।

জীবনের প্রতি স্তরে যে ধূলি-ধূসরিত অবস্থা নাগর সভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য, সেটাই বোধহয় রঙের ক্ষেত্রে এমন মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।

মিলটা হয়ত অসম্ভব নয়, কিন্তু তার ফল হয়ে পড়ে অতি স্বাভাবিক। জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান অন্ধকারের একাধিপত্যের সূচনাও হয় সেখানেই। তারপর ক্রমান্বয়ে কালোর মাত্রা বাড়তে থাকে। এবং একটু একটু করে সমস্ত মূল্যবোধ বিলুপ্তির সম্মুখীন হয়।

আর তখনই বোধহয় তৈমুরের উদ্যত চাবুক মানুষের মনে নাড়া দিয়ে যায়। নতুন করে সেদিন আবার সাময়িক মূল্যবোধ গড়ে ওঠে, আর মানুষ তারই আড়ালে পরবর্তী আঘাতের জন্য অপেক্ষা করে।

এদিকে কাল তার কাজ করে যায়। আস্তে আস্তে সে-মূল্য-বোধের বনেদ আলগা হয়ে আসে। ফলে সামান্য আঘাতেই তা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে। এমনি করেই বোধহয় পাপের মূল্য পরিশোধ হয়।

তত্ত্বকথা থাক। মরুজ্যোতি প্রসঙ্গ থেকে অনেক দূর সরে এসেছি। সরে এসেছি আমার কাহিনীর মূলস্রোত থেকে। তাই আবার পুরাণো আলোচনায় ফিরে যাই।

তুষারজ্যোতি সম্বন্ধে আমার ধারণা হয়েছিল, শুভ্র তুষারের ওপর সূর্যকিরণ পড়ে এক অত্যুজ্জ্বল দীপ্তির সৃষ্টি হয়। সে দীপ্তি চোখে পড়লে চোখ নষ্ট হওয়া বিচিত্র নয়। মনে পড়ল, মৌলানা সাহেবের কাছে গল্প শুনেছিলাম, সুলেমান বাদশা না কে নাকি একবার এক যুদ্ধের সময় চকচকে ঢালের ওপর সূর্যকিরণ পড়তে দিয়ে তার ছটায় শত্রুপক্ষের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিলেন এবং প্রায় বিনা যুদ্ধে জয়লাভও করেছিলেন।

মেষপালকদের সঙ্গে তাদের পাকা আস্তানায় ফিরে গিয়েছিলাম। সেখানেই তারা আমাদের রেখে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু রহমা তাতে রাজী হয়নি।

তার বাপ-মা কেউ তখন বেঁচে ছিলেন না। উপরন্তু অতি নিকট সম্পর্কেরও কেউ না থাকায় দূর আত্মীয়দের ওপর তৈমুরের ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত করতে তার মন চায়নি। সে তাদের অনুরোধ করেছিল যে, তারা যেন হিন্দুস্থানের পথে আমাদের এগিয়ে দেয়। কিছুটা ক্ষুন্ন হলেও তাকে বাধা দেয়নি কেউ। বরং যাতে স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে যেতে পারি, তার জন্য দু'তিন জন সঙ্গী হয়ে এগিয়ে দিতে এসেছিল।

এর ক'দিন পরে আমার জ্ঞান ফিরে এসেছিল।

সব কথা শুনে রহমার ওপর আমার শ্রদ্ধা হ'ল। নিজের অতি পরিচিত পরিবেশের বন্ধনও সে কেমন অবলীলাক্রমে ত্যাগ করে আমার জন্য সম্পূর্ণ অপরিচিত পথে রওনা হ'ল। সেও জানত আর আমিও জানতাম যে সেই দুর্গম অঞ্চলে তৈমুর সহজে আক্রমণ

চালাতে পারবে না। তবে গুপ্তহত্যার অবশ্য ভয় ছিল। কিন্তু সেত সর্বত্রই হতে পারত।

আমি সুস্থ থাকলে হয়ত তার আত্মীয়দের আমন্ত্রণ স্বীকার করে নিতাম। আমার অসুস্থতার দরুন আমার কথা অনুযায়ীই সে হিন্দুস্থানে চলেছে। একবারও ভাবেনি, পথে যদি আমার কিছু হয়, তবে তার কি অবস্থা হবে? ভাবেনি অর্থাভাবে প্রপীড়িত হয়ে আমি তাকে বাঁদীবাজারে বেচেও ত দিতে পারি।

এমন বিশ্বস্ততা পাওয়া এতই কঠিন যে, আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাকে ছোট করলাম না। মনের ভাবটা অবশ্য সে বুঝতে পেরেছিল। কারণ আমার হাতেধরা তার হাতটা হঠাৎ যেন বেশী গরম লেগেছিল।

সঙ্গীরা কিছুদূর এগিয়ে নিকটবর্তী প্রতিবেশী বন্ধু-বান্ধব স্বজনদের কাছে আমাদের জিম্মা দিয়ে ঘরে ফিরে গেল। নতুন যারা সঙ্গী হ'ল, তারা আমাদের অতি দুর্লভ বস্তুর মত সযত্নে এগিয়ে নিয়ে চলল। কিছুদূর এগিয়ে তারা আর এক নতুন দলের ওপর তাদের ন্যস্ত দায়িত্ব অর্পণ করে আবার ফিরে গেল।

এমনি ভাবে এ হাত থেকে ও হাত বদলি হতে হতে স্রোতের বুকে ভাসমান তৃণখণ্ডের মত ক্রমান্বয়ে হিন্দুস্থানের দিকে এগিয়ে চললাম।

পাহাড় থেকে সমতল ভূমিতে নামিয়ে দিয়ে আমাদের পথপ্রদর্শকরা অদৃশ্য হয়ে গেল। হিন্দুস্থানের যাবার এই ত সোজা পথ। কিন্তু খরচ এ পথেই সবচেয়ে বেশী। এতদিন অতিথি হিসাবে কিছুমাত্র খরচ হয়নি আমাদের। এবার প্রতি পদক্ষেপে খরচ।

প্রথমে ভেবেছিলাম সমরখন্দের ওমরাহ সেজে হিন্দুস্থানের রাজধানী দেহলীতে হাজির হব। কিন্তু অবস্থা দেখে ব্যবস্থা পালটাতে হ'ল।

দেখলাম হিন্দুস্থানের অতি সাধারণ ওমরাহের বিলাসিতা তৈমুরকে হার মানায়। তাদের সামান্যতম কাজের জন্য পৃথক পৃথক বান্দা নয় বাঁদী সব সময়ই হাজির থাকে। যে বান্দা সকালে পোষাক পরায়, দুপুর কিংবা বিকেল, অথবা রাত্রে তাকে আর ঐ কাজ করতে হয় না। সে কাজের দায়িত্ব পড়ে তখন অন্যজনের উপর।

যে বাঁদি এক রাত্রে প্রভুর মনোরঞ্জন করে, হয়ত তিন মাসের মধ্যে আর তার ডাক পড়ে না।

দেখলাম হিন্দুস্থানের অতুলনীয় ঐশ্বর্য কিভাবে সেখানকার মানুষদের অক্ষম, বিলাসী এবং অপদার্থে রূপান্তরিত করছে। বুঝতে কষ্ট হ'ল না যে, তৈমুরের দুর্ধর্ষ বাহিনীর কাছে খড়কুটোর মতই তাদের প্রতিরোধ ব্যবস্থা উড়ে যাবে। অর্থাৎ শক্তিমান ভেবে যাদের কাছে আশ্রয় নিতে এসেছিলাম, তারা দুর্বলের চেয়েও দুর্বল।

দূর থেকে যা দেখা যায় বা শোনা যায়, তা যে সব সময় সত্য নয়, তার একটা চাক্ষুষ প্রমাণ পেলাম। হিন্দুস্থানে বাইরের চাকচিক্য দেখে মোহিত হলেই বিপদ। তার ফুটো নৌকায় ভরাডুবি অবশ্যম্ভাবী।

• কিন্তু তখন ফেরার আর পথ নেই। ভবিতব্যকে স্বীকার করা ছাড়া যেখানে গত্যন্তর নেই, সেখানে ছায়ার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণায় কৃতিত্বও নেই, বুদ্ধিমত্তাও নেই। তাই যা ঘটবে তার জন্য অপেক্ষা করাই শ্রেয় মনে করলাম।

দেহলীতে এসে যখন পৌছলাম, তখন রহমার স্বর্ণমুদ্রার থলিটি প্রায় শূন্য হয়ে এসেছে। বিচার করে দেখলাম, এ সময় যখন কোন রইস মহল্লায় থাকা আমার সাধ্যাতীত, তখন আন্তর্জাতিক চৌর-ভ্রাতৃত্বের আঞ্চলিক কর্তৃত্বের অধীনে আশ্রয় নেওয়া দরকার। কিন্তু তাদের খোঁজ পাওয়া যায় কি করে?

আমার দৃষ্টিশক্তি বজায় থাকলে ভাবনার কিছু ছিল না। অতি সহজেই আমি উদ্দীষ্ট লোকেদের খুঁজে নিতে পারতাম। রহমার পক্ষে তাদের চিনে বার করা মোটেই সহজসাধ্য নয়।

শেষ অবধি তাই তাকে বলতে হ'ল, 'দেহলীর কোন এক 'চক' অঞ্চলে বসিয়ে দাও আমাকে।'

চকে তখন বিপুল জনস্রোত। চারদিকে ছুটে চলেছে তারা। তারি মাঝখানে বোকার মত দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। এক সময় অনুভব করলাম, যেন কেউ আমার জেব খালি করতে হাত বাড়িয়েছে। তার মৃদু স্পর্শের প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই চৌর-সঙ্ঘের পরস্পরকে চেনবার সহজতম মন্ত্রটি উচ্চারণ করলাম। উদ্যত ফণা নত হয়ে গেল।

একটু পরেই একজন এসে বললে, 'জনাব, আপনার কি উপকারে লাগতে পারি?'

একটু গম্ভীর হয়ে বললাম, 'আমরা রাহী! এখানে আমাদের পরিচিত কেউ নেই। তবে যদি আশ্রয় পাই ত খুবই উপকার হয়।'

একই চালে জবাব দিলে সে, 'হুজুরের নামটা জানতে পারলে অত্যন্ত বাধিত হতাম। হুজুরের সঙ্গে এর আগে ত আমাদের কোনদিন দেখা হয়নি।'

বাধা দিয়ে বললাম, 'যাক, আর বোঝাতে হবে না। আমার সঙ্গে এখানকার কারো দেখা হবার সম্ভাবনা খুবই কম। আমি অনেক দূর দেশ থেকে আসছি। তবে আমার নামটা জানা থাকতে পারে তোমাদের। আমি সমরখন্দের শকুন।'

আমি দৃষ্টিহীন হলেও বুঝতে পারলাম, লোকটা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। রহমা পরে আমায় বলেছিল যে, নামটা শোনামাত্র লোকটার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায়।

কিন্তু তখনি সে নিজেকে সামলে নিয়ে তাড়াতাড়ি আমার একটা হাত ধরে বলেছিল, 'গোস্তাকি মাফ করবেন জনাব। আপনাকে চিনতে পারিনি। দয়া করে একবার আমার গরীব-খানায় পদার্পণ করলে চির বাধিত থাকব।'

থাকার চিন্তা শেষ হল! এবার অশন-বসনের চিন্তা। কিন্তু তারও ফয়সলা হয়ে গেল সহজেই।

লোকটি নিজের ডেরায় নিয়ে গিয়ে খুবই আদর যত্ন করল আমাদের। আমার সম্মানে সেদিন রাত্রেই একটি ভোজ দিয়ে পরিচিতদের সবাইকে ডেকে পাঠাল। সবাই এলে পর সগর্বে সে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে। অনুভব করলাম, আমার নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিকে বেশ একটা শিহরণ খেলে গেল।

খাওয়া দাওয়ার পর গৃহস্বামী যখন বিশিষ্ট অতিথিদের সঙ্গে একত্রে ধূমপানের জন্য আমায় নিয়ে গেল, তখন বুঝলাম, বেশ একজন মাতব্বরের আশ্রয় পেয়েছি।

আর এও বুঝলাম যে, উপস্থিত সবাই আমার দেহলী আগমনের

কারণ জানতে উৎসুক। সঙ্গে সঙ্গে একটা কাহিনী তৈরী করে বলি, 'সমরখন্দে শকুন পরিচয় ছাড়া অন্য পরিচয়ে আমি একজন রইস আদমী ছিলাম। সেই সুবাদে শাহানসা তৈমুরের রাজসভায় যাওয়া আসাও ছিল। সেখানে যাওয়া আসা করতে করতে হারেমের এক জেনানার সঙ্গে আমার মোহব্বৎ হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত বাদশার রঙমহল থেকে তাকে চুরি করে আনি।

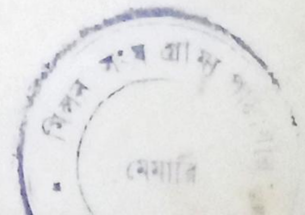
এরপর ত তৈমুরের রাজ্যে থাকা আর সম্ভব নয়। তাই নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাকে সমরখন্দ ছাড়তে হয়েছে। আমার মত লোক ত আর হেজিপেজি জায়গায় যেতে পারে না। তাই হিন্দু-স্থানের রাজধানী দেহলীতে এসেছি, উপযুক্ত কাজের প্রত্যাশায়।'

সকলে প্রায় একসঙ্গে প্রশ্ন করে উঠল, 'আমার মত অন্ধ কি করে কাজ চালাত সেখানে।'

অন্ধত্ব যে আমার অল্পদিনের, সে তথ্য আর প্রকাশ করলাম না। হেসে বললাম, 'অভ্যাসে কি না হয়!'

শ্রোতারা কথাটা ঠিক আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতে পারল না। মুখে প্রকাশ না করলেও তাদের অবিশ্বাসের আভাস বুঝতে কষ্ট হ'ল না। তাদের বিশ্বাস জন্মাবার জন্য পরীক্ষা দেবার প্রস্তাব করলাম। স্পষ্টই বুঝলাম যে তারা হাসছে।

চোখের দৃষ্টি লুপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে আমার অন্যান্য প্রত্যঙ্গগুলি আরো বেশী যেন সজাগ হয়ে উঠেছিল। তাছাড়া ভবিষ্যতের কথা কামনা করে পুরাণো বিদ্যাটা কিছুটা ঝালিয়েও নিয়েছিলাম। ফলে অন্ধ নাচারের ভূমিকা নিয়ে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে এগিয়ে গিয়ে উপস্থিত দু'তিন জনের জেব সাফ করে দিতে বিশেষ অসুবিধা হ'ল না।



এক নিমেষেই সমস্ত অবিশ্বাস প্রশংসায় রূপান্তরিত হ'ল। সকলেই বারবার আমার অবিশ্বাস্য দক্ষতার প্রশংসা করতে লাগল। মনে মনে তারা এও ধরে নিল যে, সমরখন্দে বড় রকমের বিদ্যা প্রকাশ করায় সন্দেহভাজন ব্যক্তির তালিকায় নাম উঠেছে আমার। আর বোধহয় সেইজন্যই আমি পালিয়ে এসেছি। হয়ত সত্যি সত্যিই তৈমুরের হারেমের কোন বিবির গলার হার খুলে নিয়েছি, কিংবা হয়ত স্বয়ং তৈমুরেরই।

আর একটা সম্ভাবনাও যে তাদের মাথায় উঁকি দেয়নি, তা নয়। তারা ধরে নিয়েছিল, হয়ত কোন ওমরাহ আমার পৃষ্ঠপোষক ছিল। শেষ অবধি সে হয়ত তৈমুরের বিষদৃষ্টিতে পড়ায় আত্মরক্ষার্থ আমাকেও দেশ ছাড়তে হয়েছিল।

এই রকম ধারণা করাবার জন্যই আমার এ কাহিনীর অবতারণা। কাজেই সফলতা অর্জন করেছি বুঝে নিশ্চিন্ত হ'লাম।

এবার চোরের দলে কি কাজ করতে পারি, সে বিষয়ে একটি প্রস্তাব পেশ করলাম। বক্তব্যটা অবশ্য ছিল অত্যন্ত সহজ। সে সময়ে চুরি ধরা পড়লে কঠোর শাস্তি পেতে হ'ত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের অঙ্গচ্ছেদের আদেশ হ'ত। অবশ্য শুধু বামাল সহ ধরা পড়লেই এ শাস্তি ভোগ করতে হত। সন্দেহবশে ধরা পড়লে কিংবা মাল পাওয়া না গেলে ছেড়ে দেওয়া হ'ত তাদের।

আমার প্রস্তাবের প্রধান কথা ছিল, ভবিষ্যতে ধরা পড়লেও কারো কাছেই মাল পাওয়া যাবে না! প্রধান প্রধান রাস্তার মোড়ে, চকে, চোরদের সহযোগীরা ভিক্ষুকবেশে বসে থাকবে। সাধারণতঃ অন্ধ খঞ্জ এবং বিকলাঙ্গদের দিয়েই এ কাজ করানো

হবে। আর দণ্ডপ্রাপ্ত প্রাক্তন চোরেরা সহজেই এ কাজ করতে পারবে।

চোরেরা হাত সাফাইয়ে যা পাবে, সুযোগ মত তা ভিক্ষুকের থলিতে চালান করে দেবে। তাহলে ধরা পড়লেও ক্ষতি হবে না কিছু।

ভিক্ষুকরা যথারীতি সন্ধ্যাবেলা সর্দারের কাছে এসে তাদের মাল জমা দেবে। বাঁটোয়ারার সময় তাদের কাজের জন্য যথোপযুক্ত ভাগও দেওয়া হবে।

প্রস্তাবটা নিয়ে তুমুল তর্ক-বিতর্ক সুরু হল।

একপক্ষ মত দিলে, সহযোগী ভিক্ষুকরা হবে অনাবশ্যক জঞ্জাল। কোন কাজেই লাগবে না তারা। অথচ অকারণ তাদের আয়ের ভাগ দিতে হবে।

অন্যপক্ষ বললে, ভাগ দেওয়াটাই বড় কথা নয়, নিরাপত্তা কতটা বাড়বে সেটাই প্রধান কথা। নতুন সাকরেদরাই ত ধরা পড়ে বেশী। কারণ আত্মরক্ষার নিয়মকানুন সম্বন্ধে তারা ততটা অভিজ্ঞ নয়। এখন থেকে তারা অনেক বেশী নিরাপদে কাজ করতে পারবে।

বিরুদ্ধপক্ষ মত দিলে, ধরা পড়বার ভয়ে এখন যতটা সাবধানতা অবলম্বন করা হয়, তখন সেটুকুও করবে না। ফলে ধরা পড়বার সম্ভাবনা আরো বাড়বে।

বিতর্ক যখন বেশ ঘোরালো হয়ে উঠেছে, সর্দার তখন এক ধমকে সবাইকে থামিয়ে দিলে। তার মত হ'ল, আমার প্রস্তাব কিছুদিনের জন্য পরীক্ষা করে দেখা হবে। তবে একটা সর্তে। প্রথমে আমাকেই সহযোগীদের ও চোরেদের মধ্যে আদান-প্রদান

শিক্ষা দিতে হবে এবং নিজেকে সহরের সবচেয়ে জনবহুল চক—চাঁদনীচকে বসতে হবে।

বুঝতে কষ্ট হ'ল না যে, সর্দার আমার প্রস্তাবে কোন ত্রুটি আছে কি না অথবা এটা চোরদের ধরবার সরকারী অপকৌশল কি না যাচাই করে নিতে চায়। আমার শিক্ষাদান পদ্ধতি তারা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণ করবে এবং তার মধ্যে সন্দেহজনক কিছু আছে মনে হলেই, যথাবিহিত ব্যবস্থা নিতে পারবে। তাছাড়া চাঁদনীচকে যদি আমি নিজে বসি, তবে ওদের দলের সামিল হয়ে যাব, অর্থাৎ রাজরোষের অংশীদার হয়ে পড়ব।

সর্দারের সাবধানতা সর্দারোচিত হয়েছে, এ কথা বলতে আপত্তি ছিল না। আবার এটি ধরতে গিয়ে সে যে নিজেদের লাভের দিকটাও ভোলেনি, সেই ভেবে হাসি পেল। আমার হাসিটা যে সর্দারের চোখ এড়ায়নি পড়ে বুঝলাম। কারণ সবাইকে চলে যেতে বলে সে আমায় নিরালায় প্রশ্ন করলে, 'তুমি হাসলে কেন?'

বললাম, 'সর্দার, তুমি যে আমায় পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছ না, এটা বুঝতে পারছি? অথচ আমার প্রস্তাবের মধ্যে লাভজনক সম্ভাবনা আছে বলে, তুমি তার ব্যবহারিক পরীক্ষা নিচ্ছ। সুযোগ ও সুবিধা পেলে তুমি যে একজন মহাজন ব্যক্তি হতে পারবে, এই কথা ভেবেই হাসলাম।'

আমার কথাগুলো বোধহয় বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়েছিল সর্দারের। কেন না আর কিছু না বলে চুপ করে রইল সে।

পরীক্ষা চালু হয়ে গেল। কয়েকদিনের মধ্যেই শিখিয়ে পড়িয়ে সহযোগীদের নির্দিষ্ট স্থানে বসিয়ে দিয়ে, ব্যবস্থাটা পুরোপুরি

চালু করা গেল। ব্যবস্থা চালু হতে না হতেই তার সুফলও হাতে হাতে পাওয়া গেল। এমন কি আমার প্রস্তাবিত তীব্রতম সমালোচককেও স্বীকার করতে হ'ল যে, এতে লাভ ছাড়া লোকসান নেই।

সেদিন যথারীতি বিষয়কর্মে ব্যাপৃত ছিল সে। এক ওমরাহের গলার মোতির মালাটা হাত সাফাইয়ে তুলে নিয়ে এসে সবেমাত্র আমার ঝোলাতে ফেলে দিয়ে আবার নিজের কাজে চলে যাচ্ছিল সে। এমন সময় কোতোয়ালীর লোকেরা সন্দেহবশে তাকে ধরে ফেলল। নানা জিজ্ঞাসাবাদ, যথোপযুক্ত দাওয়াই প্রয়োগ করেও প্রমাণাভাবে তাকে ছেড়ে দিতে হল। তারপরই সোজা আমার কাছে এসে নিজের বোঝবার ভুল স্বীকার করল সে!

তারপর থেকে সকলে একমত হয়ে নতুন ব্যবস্থাকে সফল করার কাজে মত দিলে। আমার প্রস্তাব অনুসারে কোতয়ালীর কিছু কিছু লোক মায় কোতোয়ালকে পর্যন্ত দলে টানার চেষ্টা করা হতে লাগল। এবং ক্রমে অনেকাংশে সফলও হওয়া গেল।

দেখতে দেখতে বিষয়কর্মে অভাবিত সাফল্য লাভ করা গেল। খুসী হয়ে সর্দার আমাকে তার প্রধান সহকারী করে নিলে।

স্বাভাবিক নিয়মে পুরানোদের টোপকে নতুন একজনকে এমন গুরুত্বপূর্ণ পদ দিলে ফল খুবই মারাত্মক হয়। অনেক সময় দলে ভাঙনও দেখা দেয়। আমার প্রচেষ্টায় সামগ্রিকভাবে সবাই লাভবান হয়েছিল বলে, এ পদোন্নতিতে কেউই আপত্তি জানাল

না। এমন কি মনে মনে ঈর্ষা বা অসূয়া অনুভব করলেও তা প্রকাশ করল না।

নতুন পরিবেশে নতুন উদ্দীপনায় জীবন আমাদের ভালই কাটছিল। তবে রহমা মাঝে মাঝে দুঃখ করে বলত, 'আবদুল্লা! কি ছিলে, আর কি হলে?'

হেসে বলতাম, 'পিয়ারী! ছিলাম চৌর সম্রাটের প্রধান সহকারী। হয়েছি চৌর তালুকদারের প্রধান সহকারী। বৃত্তিও পালটায় নি, সহকারীত্বও ঘোচেনি। তবে আর দুঃখ কিসের?'

তবু তার দুঃখ ঘুচত না কিছুতেই। দুঃখটা ব্যক্তিগত কোন অভাববোধ থেকে হলে না হয় বুঝতে পারতাম। কিন্তু কোন জিনিষ দিতে গেলেও সে নিতে চাইত না। বরং বিরক্ত হত, রাগ করত।

এ ক্ষেত্রে দুঃখটা নিশ্চয় আমার জন্য। কিন্তু কেন? আমি ত নিজের জন্য কোন দুঃখ অনুভব করিনি।

দৃষ্টিহীনতার অভিশাপও আমি সহ্য করে নিয়েছিলাম। সমরখন্দের প্রচণ্ড ক্ষমতার স্মৃতি ক্রমেই মনের প্রান্তে ফিকে হয়ে আসছিল। নতুন পরিবেশে নিজেকে মানিয়েও নিয়েছিলাম। তাই রহমার দুঃখটাকে বুঝতে পারতাম না।

দেখতে দেখতে হেমন্ত আর শীত শেষ হয়ে গেল। বসন্ত তার রূপ-রসনান্ধের সম্ভার সারা হিন্দুস্থানে লেপে দিল। কিন্তু সঙ্গে নিয়ে এল এক প্রচণ্ড দুঃসংবাদ।

দেহলীর বাজারে গুজব ছড়াল, হাজারে হাজারে সৈন্য নিয়ে তৈমুরলঙ্গ হিন্দুস্থান অভিমুখে এগিয়ে আসছে।

প্রথমে দেহলীর জীবনযাত্রায় বিশেষ কোন পার্থক্য দেখা গেল না। কেবল এখানে ওখানে কিছু কিছু সৈন্য দেখা যেত। বোঝা গেল আশু যুদ্ধের জন্য তৈরী হচ্ছে তারা। অবশ্য তাদের চালচলনে মনে হচ্ছিল, তৈমুর বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করা সাধারণ কুচকাওয়াজের চেয়ে কঠিন কিছু নয়।

কিন্তু তখনই বুঝেছিলাম, তৈমুরের সঙ্গে মোকাবিলা করা ওদের ক্ষমতার বাইরে। অর্থাৎ আর একবার বোধহয় তৈমুরের মুখোমুখি হতে হবে আমায়?

কথাটা অবশ্য রহমাকে বলিনি। কারণ এমনিতেই সে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল। আমার ধারণা প্রকাশ করলে হয়ত পাগল হয়ে যেত।

পরবর্তী গুজবে প্রকাশ পেল—তৈমুরের এক ওমরাহ তার এক বিবিকে নিয়ে পালিয়ে এসেছে। তাকে শাস্তি দিতেই এখানে আসছে তৈমুর।

আবার প্রথম কাহিনীর সঙ্গে গুজবের মিল থাকায় দলের লোকেরা আমাকে এসে বারবার প্রশ্ন করতে লাগল, 'কে সেই ওমরাহ? কাকে নিয়ে পালিয়ে এসেছে?'

নৈর্ব্যক্তিক প্রথম পুরুষে নিজেদের কাহিনী বর্ণনা করলাম, 'ওমরাহটি তৈমুরের বিশ্বস্ত সহকারী জল্লাদ আবদুল্লা নামেই খ্যাত। আর যাকে নিয়ে এসেছে, সে তৈমুরের হারেমের মেয়ে হলেও ঠিক বিবি নয়। আবদুল্লার সঙ্গে তার অনেক দিনের আশনাই। তৈমুরের বিরুদ্ধাচরণ করায় আবদুল্লার জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে। তখন সে দেশ ছেড়ে চলে আসে। আসার সময় বিবিকেও সঙ্গে করে নিয়ে আসে।'

আবহুল্লার চেহারার বর্ণনায় নিজের থেকে যতদূর সম্ভব পার্থক্য করে বললাম, 'দশাসই জোয়ান আবহুল্লা। তার চোখ দুটোর মত ক্রুর চোখ দেখা যায় না বলেই শুনেছি।'

নিজের বড় বড় দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে এ তথ্যও জানিয়ে দিলাম যে আবহুল্লার মুখে শ্মশ্রুগুম্ফের চিহ্নমাত্রও নেই।

আত্ম-পরিচয় গোপনের সুবিধার জন্য স্বেচ্ছায় গোঁফ দাড়ি রেখেছিলাম। চোখ দু'টি যাওয়ায় মুখের ভাবের অনেক পরিবর্তন হয়েছিল। রহমাই মাঝে মাঝে বলত, আমায় নাকি চেনা যায় না।

চেনা যাক আর না যাক, আমার কথাটাই মেনে নিত সহযোগীরা। রহমা কিন্তু ওসব কথায় ভুলতে চাইত না।

আমায় জড়িয়ে ধরে ভয়ে ভয়ে বলত সে, 'চল, এখান থেকে পালিয়ে যাই।'

পালাব বললেই ত পালানো যায়। কিন্তু দেহলীতে যে সুযোগ পেয়েছিলাম, তাতে তৈমুরের হাত এড়ানো আমার পক্ষে খুব কঠিন হ'ত না।

চৌরভ্রাতৃত্বের সহায়তায় আত্মগোপন করে বিপদ এড়াতে পারতাম। কিন্তু দেহলী থেকে পালালে শুধু তৈমুরের ক্রোধই আমাদের অনুসরণ করত না, চৌর-সংঘও আমাদের ওপর সন্দেহ করবে। তখন তামাম হিন্দুস্থানে কোথাও মাথা গোঁজবার জায়গা পাব না। ভয়াবহ মৃত্যু সর্বত্র আমাদের পিছু পিছু ঘুরবে।

কথাগুলো প্রকাশ করলে রহমা আরো ভয় পাবে, তাই তাকে সাহস দিয়ে বললাম, 'ব্যবস্থা করছি।'

দেখতে দেখতে গুজব আর গুজব রইল না, সত্য হয়ে দাঁড়াল। খবর এল, তৈমুর সসৈন্যে হিন্দুস্থানে প্রবেশ করেছে।

তারপর ক্রমান্বয়ে তার অগ্রগতির সংবাদ আসতে লাগল। আজ বালুচিস্তান, কাল লাহোর।

লাহোর পৌঁছানোর পর সুলতানী সৈন্যদল প্রতিরক্ষার্থ আহ্বান হ'ল। দেহলীর পথঘাট কাঁপিয়ে সদর্পে দলে দলে ঝাণ্ডা উঁচু করে এগিয়ে চলল তারা।

দেহলীবাসীরা বলাবলি করলে, 'এবার তৈমুরলঙ্গ আমাদের সৈন্যদের হাতে উপযুক্ত শিক্ষা পাবে। জান নিয়ে কোনরকমে বাঁচাধন দেশে ফিরতে পারে ত, সেটাই সাতপুরুষের ভাগ্য বলে বিবেচনা করবে।'

তৈমুরের হিন্দুস্থানে প্রবেশের সংবাদে দেহলী কিছুটা সচকিত হল। ভীত সন্ত্রস্ত কিছু কিছু অধিবাসী নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গেল। কিন্তু সুলতানী সৈন্যদল যাত্রা করার পর আস্থার ভাব আবার ফিরে এল।

যারা চলে গিয়েছিল, তাদের বড় একটা অংশ দেহলীতে ফিরে এলে দেহলীর জীবনযাত্রা প্রায় স্বাভাবিক হয়ে এল।

তবে অনুচ্চারিত একটা প্রশ্ন সকলের মনেই গুঞ্জন করে বেড়াচ্ছিল—তৈমুর কি সত্যিই আসবে?

তৈমুর শেষঅবধি এল। আসার আগেই অবশ্য পলাতক সৈন্যদের কাছ থেকে যুদ্ধের খবর পাওয়া গিয়েছিল।

তৈমুরের রণনীতির স্বাভাবিক চালেই সুলতান পর্যুদস্ত হল।

প্রথমেই সে হিন্দুস্থানের মোক্ষম অস্ত্র হাতীগুলোকে অকেজো করার ব্যবস্থা করলে, হাতীর দলের প্রধানকে কৌশলে স্বপক্ষে এনে।

সুলতানী সৈন্যদের প্রথম আক্রমণই এইভাবে ব্যর্থ হয়ে যায়। উপরন্তু হাতীগুলো স্বদলের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়ে সৈন্য-বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে দিল।

বড়ের চালে মাৎ হয়ে গেল সুলতান। রণক্ষেত্রেই তৈমুরের হাতে ধরা পড়ে গেল সে।

বন্দী সুলতানকে সঙ্গে নিয়ে সসৈন্যে এসে দেহলী পৌঁছল তৈমুর। কিন্তু স্বাভাবিক রীতিতে প্রথমেই লুট সুরু হ'ল না। বরং তৈমুরের সৈন্যরা যে দেহলীতে এসেছে তা বোঝাই গেল না।

ক্রমে নগরীর জীবনযাত্রা আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠল। সব কিছু যখন পুরানো ছন্দে চলতে লাগল, তখন আর ঘরে বন্দী হয়ে বসে থাকবার কোন অর্থই হয় না। তাই নিজের কাজে আবার বেরুতে লাগলাম।

রহমা অবশ্য রোজই বাধা দিত, 'বেরিয়ো না আবদুল্লা! তোমায় ধরতে পারলে তৈমুর মোটেই ক্ষমা করবে না।'

তৈমুরের ক্ষমা করবার কথা নয়। আবদুল্লাকে সে চিরকাল নিজের একান্ত বশম্বদ, একেবারে হাতের পুতুল ভেবেছিল। পুতুলের মতই সে যান্ত্রিক। নিজস্ব সত্তা বলে তার কিছু নেই। যেমনভাবে চালানো হবে, তেমনিভাবে চলবে সে।

ক্রমে ক্রমে এই ধারণা যখন বদ্ধমূল হয়ে দাঁড়িয়েছে, ঠিক তখনই সেই হাতের পুতুল যদি স্বাধীনভাবে মাথা নাড়া দিয়ে

ওঠে, তবে সে বিদ্রোহী। বিদ্রোহীকে এমন শাস্তি দেওয়া দরকার, যাতে সমশ্রেণীয় কেউ কোনদিন তার পথ অনুসরণে সাহসী না হয়।

তবু রহমাকে সাহস দিয়ে বলি, 'জানি! আমি ত আর আবদুল্লা নই, আমি যে দৌলত।'

দৌলত বলেও কিন্তু রেহাই মিলল না। খবর পেয়েছিলাম, রাজপুরুষদের কাছে কোন খোঁজ খবর না পেয়ে তৈমুর অন্য চেষ্টা করছে।

অন্য চেষ্টা কি হতে পারে, তা বোঝা হয়ত উচিত ছিল আমার। কিন্তু সম্ভবতঃ নিজের এই পরিবর্তিত রূপ তৈমুর বা তার কোন অনুগামীর পক্ষে চিনে নেওয়া সম্ভব হবে না, এই আত্ম-বিশ্বাসই আমাকে অসতর্ক করেছিল।

তাই দেহলীর সাধারণ মানুষদের প্রথম যে দল ধৃত হয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তৈমুরের কাছে নীত হ'ল, তাদের মধ্যে ধরা পড়ে গেলাম।

দরবারে নিয়ে যাওয়া হ'ল আমাদের। এবং একে একে তৈমুরের সামনে হাজির করা হ'ল।

সিংহাসনারূঢ় তৈমুরের মুখোমুখি নিয়ে এসে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হ'ল আমাকে। আদেশ হ'ল, 'কুর্নিশ কর।'

কুর্নিশ করে দাঁড়াতেই অতি সুপরিচিত কণ্ঠে নির্লিপ্ত প্রশ্ন এল, কি 'নাম তোমার?'

'দৌলত।'

প্রচণ্ডভাবে হেসে উঠল তৈমুর। তারপর হাসতে হাসতেই বললে, 'আরে বুদ্ধু, দৌলত কখনো অন্ধ হয়?'

বিচার বিবেচনা না করেই জবাব দিলাম, 'হয় হয়। তৈমুর যখন লেংড়া হয়, দৌলতের অন্ধ হতে দোষ কি।'

এক মুহূর্তে সমস্ত দরবার নিস্তব্ধ হয়ে গেল। একটা প্রলয়ঙ্কর ঘটনা কিছু ঘটবে বলে সকলে যেন নিঃশ্বাস রোধ করে বসে আছে। তৈমুর কিন্তু হেসেই চলেছে। তার গমকে সারা দরবার গম গম করে উঠছে।

বুঝতে বাকী রইল না যে, নিজের বোকামিতেই তৈমুরের ফাঁদে পা দিয়েছি। প্রথমে যে সে আমাকে চিনতে পারেনি, এটা বুঝেও কেন আমাদের পুরানো রসিকতার ফাঁদে ধরা পড়লাম, নিজের মনেই তার জবাব মিলল না। ভবিষ্যৎকে যে কোনমতেই এড়ানো যায় না, এ তারই একটা প্রমান।

এক সময়ে হাসি থামল তৈমুরের। বুঝতে পারলাম সিংহাসন থেকে নেবে আমার কাছে এগিয়ে আসছে সে।

কাণের কাছে ফিসফিস করে বলল সে, 'এবার হয়ত বিশ্বাস করবি যে তোর জীবন-মৃত্যু আমারই হাতে। আর মৃত্যু যে আমার হাতে তাত বুঝতেই পারছিস। স্রেফ্ একটি কথার ওয়াস্তা। সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় থেকে মাথাটা নেবে যাবে। সেটা অবশ্য কঠিন কাজ নয়, কিন্তু জীবনও যে আমি দিতে পারি তার প্রমান হিসেবে তোকে ছেড়েই দিলাম।'

হাতে একটা থলি গুঁজে দিয়ে সিংহাসনে আবার ফিরে গেল সে। তারপর হুকুম দিল, 'একে ওর ডেরায় পৌঁছে দিয়ে এস।'

শাস্ত্রীরা আমাকে নিয়ে যেতে যেতে সমস্ত দরবার আবার স্বাভাবিক হয়ে এল। এদিকে ওদিকে ফিসফিসানি আর কলগুঞ্জনে দরবার আবার মুখরিত হয়ে উঠল।

আমাকে বাইরের রাস্তায় নামিয়ে দিয়ে শাস্ত্রীরা চলে গেল। সেখান থেকে দলের একজন আমায় একখানা ঘোড়ার গাড়ীতে চাপিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে ডেরায় নিয়ে এল।

তৈমুরের এই বদান্যতা আর মহত্বের অর্থ তখন বুঝতে পারিনি, আজ কিন্তু পারছি। শুধু আমাকেত সে চায়নি। চেয়েছিল রহমাকেও। আর সেইজন্য শাস্ত্রীদের ওপর হুকুম দিয়েছিল, আমায় ডেরায় পৌঁছে দিতে।

হতভাগ্য শাস্ত্রীরা। তার আদেশ ঠিকমত পালন করেনি বলে তাদের ভাগ্যে কি যে ঘটেছে তা ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠেছি আমি।

হিসাব যখন মিলল না, তখন খেপে গেল তৈমুর। দেহলীর বুকে শত শত নিরীহ মানুষের খুন ঢেলে সারা রাস্তা রাঙা করে দেওয়া হয়েছিল। অবশ্য তৈমুরের পক্ষে সেটাই ছিল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ব্যবহার।

প্রথম কদিনের ব্যবহারে কিছুটা নতুনত্ব ছিল। অবশ্য সেটা আবদুল্লাকে ধরে তার সাহায্যে রহমার সন্ধান নিয়ে বৈরী নির্যাতন চরিতার্থ করার জন্যই অপেক্ষা করেছিল সে।

আবদুল্লাকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও ছেড়ে দেওয়ার পেছনে

সেই একই উদ্দেশ্য নিহিত ছিল। কিন্তু শাসনযন্ত্রের কনিষ্ঠতম অংশটির পক্ষে শাহানসার মনোগত ইচ্ছা বোঝা সম্ভব ছিল না বলেই তার সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। আর তারপর তার পক্ষে ক্ষোভে ফেটে পড়া আশ্চর্য কিছু নয়।

তাছাড়া সুলতানকে মিষ্টি কথায় বশীভূত করতে পারলে হিন্দুস্থানের অতুলনীয় ধনসম্পদ সহজে হস্তগত করা যাবে মনে করেই সে তার সেনাবাহিনীকে সংযত করে রেখেছিল। সৈন্যরাও বিনা প্রচেষ্টায় এত রকম আনন্দদায়ক সম্ভার হাতে পেয়েছিল যে, লুট করার প্রয়োজনীয়তাই অনুভব করেনি।

শেষঅবধি তৈমুরের প্রত্যাশা কোনদিক থেকেই পূরণ না হওয়ায় তার সেনাবাহিনীকে দেহলীর জনসাধারণের ওপর লেলিয়ে দিল সে। রক্তস্নান সুরু হ'ল দেহলীর।

তবে তৈমুরের ইচ্ছা আংশিক পূরণ হ'ল। অত্যাচার থামাতে সুলতান তার গোপন ধনভাণ্ডার তৈমুরের হাতে তুলে দিল।

আবদুল্লা আর রহমার খোঁজ কিন্তু পাওয়া গেল না। দেহলীর চোরবাজারে গোপন অন্ধি-সন্ধি থেকে তাদের খোঁজখবর বার করা তৈমুরের সেনাবাহিনীর অসাধ্য ছিল।

ক্লান্ত অবসন্ন তৈমুর আর তার বাহিনী তাই এক সময়ে থেমে পড়ল। তারপর তারা ফিরতি পথ ধরল। দেহলীর বুকের ক্ষত একটু একটু করে শুকিয়ে এল। আবার আগের মত হাট বাজার বসতে লাগল। আবার চৌরচক্রের কাজকর্ম পুরোদমে চালু হ'ল।

এরপরেই দৌলতের সম্মান বেড়ে গিয়েছিল। তৈমুরের মুখের

ওপর বলা স্পষ্ট কথাটা মুখে মুখে বিপুলাকায় ধারণ করে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

শাহানসা তৈমুরের মুখের ওপর যে এমন চড়া জবাব দিতে পারে, সে একজন সাধারণ মানুষ নয়। তাছাড়া তৈমুর যখন সে জবাব হজম করে নিল, তখন সমরখন্দে তার প্রভাব নিশ্চয়ই কিছু কম ছিল না।

এইপরই দৌলতকে সর্দারের প্রধান উপদেষ্টা করে দেওয়া হয়। নিত্য-নিয়মিত ভিক্ষার্থী হিসাবে আর রাস্তায় বসতে হয় না তাকে। রহমা এ পরিবর্তনে খুসীই হয়েছে। তার আবদুল্লা আজ আর ভিখারী নয়।

অবসরটা অনেক বড় হয়ে গেছে। বসে বসে বারবার নিজের জীবনকে পর্য্যালোচনা করি, আর বুঝতে চেষ্টা করি তৈমুরকে—মানুষ তৈমুর, বন্ধু তৈমুর, প্রেমিক তৈমুর, শাহানসা তৈমুর হিসাবে। কিন্তু মেলাতে পারি না।

একদা যেমন দু'কূল প্লাবিনী হুণ আক্রমণের নেতাকে ঈশ্বরের অভিশাপ বলে গণ্য করা হ'ত, তৈমুরকেও কি তাই বলা যাবে? কিংবা তৈমুরের কথাই হয়ত ঠিক। পৃথিবীর দোষ-ত্রুটি বিচার করতে চাবুক হাতে স্বয়ং জগদীশ্বর কি তৈমুর রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন?

কিন্তু জগদীশ্বর ত শুধু রুদ্র নন। তাঁর প্রশান্ত রূপও ত আছে। তৈমুরত শুধুই রুদ্র। তাকে জগদীশ্বর বলে স্বীকার করা যায় না। ঈশ্বর স্বার্থসর্বস্ব নন!

